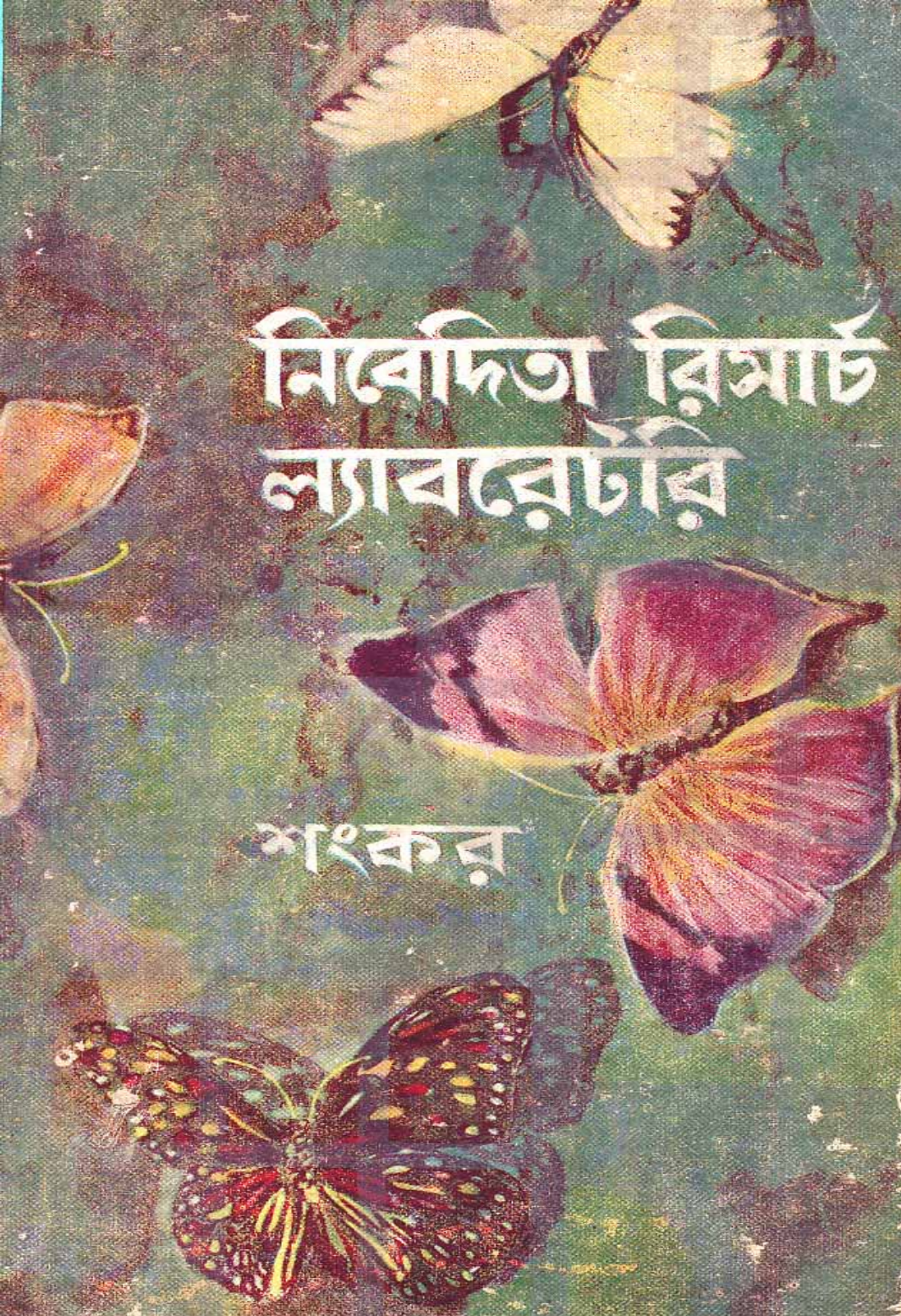
নিবেদিতা রিসার্চ
ল্যাবরেটরি
শংকর

নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরি

শঙ্কর

আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড
কলকাতা ৯

গোড়ার কথা

সে প্রায় দুশো বছরের আগেকার কথা। সুইডেনের এক বিজ্ঞানী ভদ্রলোকের খেয়াল হলো পৃথিবীর জীবজন্তু এবং কীটপতঙ্গদের কোনো নির্ভরযোগ্য তালিকা নেই। মাথায় তাঁর ভূত চাপলো তিনি নিজেই এই অভাব পূরণ করবেন। সুতরাং সর্বত্র তাঁর অনুসন্ধান শুরু হলো এবং তারপর কাগজকলম নিয়ে লিখতে বসলেন পৃথিবীর প্রথম জীবজগৎ তালিকা। ভদ্রলোকটির নাম কার্ল ফন লিনিয়াস।

লিনিয়াস তাঁর কর্মবহুল জীবনকালে মাত্র ৪৩৭৯টা নাম সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। তারপর এই দুশো বছর ধরে পৃথিবীর আরও কত মানুষ পর্বত, সাগর, মরুভূমি, জলাজঙ্গল ও জনপদে নতুন কীটপতঙ্গ আবিষ্কারের নেশায় নিজেদের যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব, বার্ধক্য এমন কি জীবন ব্যয় করলেন। ব্রুস, বাটলার, ক্রিস্ট্যাল, টেলর, কীবিল—এবং আমাদের জীমূতবাহন সেন, যাঁকে নিয়ে এই নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরির কাহিনী।

জীমূতবাহন বলতেন, "আমার কাছেই ৬ লক্ষ ৭৫ হাজার পোকা-মাকড়ের নাম আছে। অর্থাৎ তোমাদের আট পৃষ্ঠার দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকার সবগুলো পাতায় কোনোরকম হেডিং না দিয়ে যদি শুধু পোকাদের নাম ছাপিয়ে যাওয়া যায় তাহলেও পুরো আট সপ্তাহ লাগবে।"

এখনও নাকি প্রতি বছর চার হাজার নতুন পোকার নাম সংগ্রহ হচ্ছে এবং কারও কারও ধারণা, পৃথিবীতে অন্তত দেড় কোটি রকমের কীটপতঙ্গ আছে।

জীমূতবাহন সেনের নাম পাঠক-পাঠিকাদের কাছে অপরিচিত না-ও হতে পারে। কিন্তু ঈশিতা সেন, ইন্দুমতী দেশাই, মদালসা আর অমিতাভ মিত্রের খবরাখবরও যে তাঁরা রাখবেন এটা আশা করা যায় না। প্রেস ট্রাস্ট অফ ইণ্ডিয়া জীমূতবাহন সম্পর্কে কয়েক লাইনের যে সংবাদ প্রচার করে-

ছিলেন, সংবাদপত্র পাঠকরা তার থেকে জীমূতবাহনের সংবাদ হয়তো জানতে পেরেছেন।

পি-টি-আই পরিবেশিত সেই সংবাদ স্বাভাবিক কিংবা অস্বাভাবিক সে সম্পর্কে অবশ্যই তর্কের অবকাশ আছে। কিন্তু সবটুকু কি জানা গিয়েছে? টেলিপ্রিণ্টারে পাঠানো সামান্য ক'লাইন খবরের পিছনে অনেক সময় যে বৃহৎ ঘটনা লুকিয়ে থাকতে পারে জীমূতবাহনের জীবন তাই প্রমাণ করে।

নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরির কাহিনী শুরু করবার আগে শ্রীমতী ঈশিতা সেনের কাছে আমার একটি ব্যক্তিগত আবেদন আছে। জীমূত-বাহনের এই ইতিবৃত্ত তাঁর হাতেও পৌঁছতে পারে। এই কাহিনী যে তাঁর মতঃপূত হবে এমন আশাও রাখি না। কিন্তু এইটুকু প্রথমেই বলে রাখতে চাই, কাউকে আঘাত দেবার জন্যে বা লোকচক্ষে ছোট করবার জন্যে এই কাহিনীর সৃষ্টি নয়। শ্রীমতী সেনের কাছে আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ, তিনি যেন ভুল না বোঝেন কাউকে।

বাংলা দেশ থেকে অনেক দূরে এই কাহিনীর পটভূমি। ট্রেনে করে অমিতাভ মিত্র চলছিল জীমূতবাহনের সেই কর্মকেন্দ্রে।

ট্রেনের কামরায় বসে ইঞ্জিনের দোল খেতে খেতেই আবার সূর্য অস্ত গিয়েছিল। কতগুলো টানেলের মধ্য দিয়ে ইতিমধ্যে যে গাড়িখানা ঢুকলো আর বেরিয়ে এল তার হিসেব নেই। টানেলের মধ্যে যখন ট্রেনটা ঢুকে পড়ে তখন হঠাৎ নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে—ট্রেনটা যেন একটা সুতো, কোন বিশাল দৈত্য তাকে ছুঁচের ফুটোর মধ্যে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এলেই আবার ভাল লাগে—প্রাণভরে নিশ্বাস নিয়ে আনন্দ পাওয়া যায়।

অমিতাভ দেখল, দূরের পর্বত-শিখরগুলো সেকেলে মেয়েদের মতো স্বামীর মঙ্গলকামনায় সীমন্তে প্রচুর সিঁদুর লাগিয়েছে। ক্ষয়ীভূত এই শিলা নাকি হিমালয়ের থেকেও বয়োজ্যেষ্ঠা। ট্রেন থেকে পাহাড়ের গাছগুলো হঠাৎ দেখলে মনে হয় চলমান অশ্বারোহীর সারি—অন্ধকার নামার আগেই তারা ব্যস্তভাবে নিকটতম সরাইখানার দিকে ছুটে চলেছে।

অমিতাভ মিত্র সামনের জানলার পর্দাটা ভাল করে সরিয়ে দিল—এই ট্রেনটা ভারতবর্ষের অন্যসব ট্রেনের মতো নয়। চলমান ট্রেন থেকে অপরূপা প্রকৃতিকে দু'চোখ ভরে দেখবার জন্যে যাত্রীরা যে ব্যাকুল হতে পারেন তা স্থানীয় রেল কোম্পানীর দূরদর্শী কর্মকর্তারা এই লাইনের পত্তনের সময়ই বুঝতে পেরেছিলেন। তাই ট্রেনের কামরায় বড় বড় কাচের জানলা বসাতে কার্পণ্য করেননি তাঁরা। বসার জায়গাগুলোও সুন্দর।

একটা ছোট্ট স্টেশনকে অবজ্ঞা করে ট্রেনটা ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল। প্ল্যাটফর্মের ওপর দাঁড়িয়ে একটা বাচ্চা ছেলে ফ্যাল ফ্যাল করে চলমান যাত্রীদের দিকে তাকিয়ে রইল।

ভারতবর্ষ দেশটা যে কত বড় তা ট্রেনে না চড়লে বোঝা যায় না। রবিবার সন্ধেবেলায় অমিতাভ গাড়িতে চেপে বসেছিল। তারপর রবিবার গেল, সোমবার গেল—গাড়ি চলার বিরাম নেই। ভারতবর্ষটা যেন একটা রীলে জড়ানো ছিল—কে বোধ হয় মেশিন ঘুরিয়ে অমিতাভর চোখের সামনে সেটাকে আর একটা কাঠিমে জড়িয়ে নিচ্ছে। কত মাঠ, কত নদী, কত অরণ্য, কত পর্বত, কত স্টেশন, কত মানুষ চোখের সামনে এসে আবার বন বন করে কাঠিমে জড়িয়ে গেল। এর যেন শেষ নেই।

মঙ্গলবারে গাড়ি পালটিয়েছে অমিতাভ। স্টেশনের ওয়েটিং রুমে ঘণ্টাকয়েক কাটিয়ে আবার এই নতুন ট্রেনটায় উঠে বসেছে। বিদ্যুতে টানছে গাড়িটাকে। গাড়িটা ভেস্টিবিউল্ড।

আগেকার গাড়িটাতে কুপে পেয়েছিল অমিতাভ। ঠিক যেন সেলের বন্দী হয়ে ছিল সে। একটা স্টেশন ছেড়ে আর একটা স্টেশনের পথে মনে হয় পৃথিবীর সঙ্গে সব যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে—একটা ক্যাপসুলের ভিতর অবরুদ্ধ অমিতাভ পৃথিবী থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

পৃথিবী থেকে না হোক চেনা-জানা সবাইকার কাছ থেকে এবার সত্যিই দূরে সরে যাচ্ছে অমিতাভ। বাবা বলেছিলেন, "এতো দূরে যাওয়ার কোনো মানে হয় না।"

মা বলেছিলেন অমিতাভকে, "তাহলে তোকে পেটে ধরে কী লাভ হলো? ইস্কুল থেকেই হোস্টেলে রইলি। কলেজেও হোস্টেল ছাড়লি না। তারপর বেশী বিদ্যের লোভে বিদেশে একা একা পালালি। ফিরে এসেও যদি তোর পড়াশোনার শেষ না হয় তাহলে কবে হবে?"

মায়ের দিকে তাকিয়ে অপরাধী অথচ আদুরে ছেলের মতো অমিতাভ হেসেছিল। মা বলে চললেন "তারপর একদিন বিয়ে করে বসবি—একেবারে পর হয়ে যাবি। মরে গেলে নিশ্চয় কষ্ট করে কাছা পরবি, হবিষ্যি করবি, পিণ্ডি দিবি, কিন্তু বেঁচে থাকতে মায়ের কাছে থাকলি না।"

তখন কিছুই বলেনি অমিতাভ। এখন ট্রেনের কামরায় বসে টাইম-টেবলের ম্যাপটার দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে জায়গাটা সত্যি অনেক দূরে। এই এতোদূর থেকে দুর্ধর্ষ বিরাট সৈন্যবাহিনী একদিন বাংলা দেশ আক্রমণ করতে যেতো! তখন তো ট্রেনও ছিল না।

এই গাড়িতে অমিতাভ একলা নয়—আরও তিনজন আছে। তিনজন নয়—আড়াই জন। তাই বা কেন, রেলের হিসেবে দু'জন বলা উচিত। কারণ তৃতীয় প্রাণীটির অস্তিত্ব তিন মাস আগেও ছিল না। মিলিটারি ভদ্রলোক—আর্মি ভেটারিনারি কোরের ক্যাপ্টেন দেশপাণ্ডে আর মিসেস দেশপাণ্ডে।

সারা রাস্তা দেশপাণ্ডে শুধু ঘোড়ার গল্প বললেন। তাঁর দুঃখ স্ত্রী ঘোড়ায় চড়তে চায় না। ছেলেটা কী হবে কে জানে—মায়ের দোষটা না সংক্রামিত হয়! ঘোড়ায় চড়তে চাক না-চাক ছেলেটা সর্বদা মায়ের কোলে চড়তে চায় এবং সম্প্রতি আর একটি বস্তুর প্রতি তার দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছে। লাজুক মা তাকে ফিডিং বোতলের দুধ দিয়ে শান্ত করবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু পুত্রটি বেয়াড়া, সে মায়ের দুধ চায়।

মাকে অস্বস্তির হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে অমিতাভ বললে, "আমি একটু বেড়িয়ে আসি।"

করিডর দিয়ে সামনের দিকে যাবার চেষ্টা করলে অমিতাভ। কিন্তু গাড়িটা বেজায় দুলছে, এগোবার উপায় নেই। পা বাড়াবার চেষ্টা করলেই হুমড়ি খেয়ে পড়বার ভয়। অমিতাভ মিত্রের মনে হলো আরও অনেক শক্তি অদৃশ্য রজ্জু দিয়ে তাকে পিছনে টানবার চেষ্টা করছে।

এখান থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই অমিতাভ দূর দিগন্তের পর্বতশ্রেণী দেখতে পাচ্ছে। আর একটা স্টেশনের ওপর দিয়ে গাড়িটা বেরিয়ে গেল। পাশের ছোট ছোট পাথুরে ঢিবির ওপর কয়েক জোড়া সলজ্জ যুবক-যুবতী নিশ্চল বসে রয়েছে। এদেশের গভীরেও কি আজকাল রোমান্স ঢুকে গেল? এটা যদি সত্যি হয় মন্দ কী?

এবার বেশ অন্ধকার হয়ে উঠেছে। রেস্তোরাঁ-কারে বসে কফির অর্ডার দিলে অমিতাভ।

বাইরে তেমন কিছু দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু জায়গাটায় বোধ হয় অনেক নতুন কলকারখানা হচ্ছে! কারখানার শান্ত আলোগুলো আপন মনেই প্রবীণ ও বিশ্বস্ত কর্মচারীদের মতো স্থিরভাবে ডিউটি করে যাচ্ছে। মাঝে একটা জায়গায় ট্রেনের যাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে একটা ছটফটে নিওন সাইন জ্বলছে আর নিভছে। জানিয়ে দিচ্ছে এখানে এক্স-রে মেশিন তৈরি হয়। পাশেই একটা নামকরা রঙের কারখানা। তারই পাশে নাইলন মিল। 'মানুষের তৈরি ফাইবার ব্যবহার করুন'—আর একটা নিওন আলো নীরব আবেদন জানাচ্ছে।

আর কিছুটা এগিয়ে গিয়েই বিরাট এক কারখানা—মানুষ বাঁচাবার সবচেয়ে নামকরা কয়েকটা অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ এখানেই শিশিতে ভর্তি হয়। তার পরেই মানুষ নিধনের কল—অর্ডনান্স কারখানা।

অমিতাভর এখন আর ভাবতে ইচ্ছে করছে না। এই ক'দিন একলা অনেক ভেবেছে—কোথায় চলেছে, কিসের সন্ধানে চলেছে, কী লাভ হবে? এ-সব চিন্তার সময় যে লোকটি মনের মধ্যে নিত্য আনাগোনা করেছেন তাঁর নাম অবশ্যই জীমূতবাহন সেন।

সুদূর বিদেশে জীমূতবাহন সেনের সঙ্গে অমিতাভর পরিচয়টা প্রায় গল্পের মতো।

ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচার দিতে এসেছিলেন ডক্টর জে বি সেন। সেই উপলক্ষে প্রফেসর ব্ল্যাকার ডিনার পার্টি দিয়েছিলেন। অধ্যাপকদের ভোজসভায় কোনো ছাত্রের থাকবার কথা নয়। কিন্তু দলে একজন ইণ্ডিয়ান বাড়াবার কথা ভেবেই প্রফেসর ব্ল্যাকার অমিতাভকে আসতে বলেছিলেন।

আলাপ করিয়ে দেবার সময় অধ্যাপক ব্ল্যাকার বললেন, "হিয়ার ইজ এ বয় ফ্রম ঢাকা।"

"না না, ঢাকা নয়—সেটা ওয়ান্স আপন এ টাইম। বাবা ওখানে চাকরি করতেন। আসলে ক্যালকাটা," অমিতাভকে বলতে হলো।

ডক্টর জে বি সেন গলাবন্ধ কোটের একটা বোতাম সামলাতে সামলাতে শুদ্ধ বাংলায় বললেন, "কলকাতার ছেলে? কোথাকার?"

"নর্থ ক্যালকাটা।"

"মানে শ্যামবাজার?"

"না, দর্জিপাড়া।"

"দর্জিপাড়ার মিত্তির নাকি তোমরা? তোমরা তো ভেরি ফেমাস। এক সময়—সে অবশ্য অনেকদিন আগেকার কথা—ওখানে আমি টিউশানি করতাম।"

জিনিসটা ভাল দেখাচ্ছে না বলে, বাংলায় কথাবার্তা বন্ধ রেখে অমিতাভ একটু দূরে সরে গিয়েছিল।

প্রফেসর ব্ল্যাকার হাসতে হাসতে জীমূতবাহনকে বললেন, "মিট্‌রাকে আমরা ডি-ইণ্ডিয়ানাইজ করবার চেষ্টা করছি! আমি জোর করে বলতে পারি এই ইউনিভার্সিটির প্রতিভাময়ী এবং আকর্ষণীয়া বালিকাদের মনের খাতার প্রথম পাতায় ওর নাম লেখা আছে। মিট্‌রার মতো প্রতিশ্রুতি-সম্পন্ন ছোকরাকে আমরা ডারহামেই রাখতে চাই—মিট্‌রাকে এখানে শিকড় গেঁড়ে বসতে হবে।"

প্রফেসরের রসিকতায় উপস্থিত সবাই সেখানে গলা কাঁপিয়ে হেসে উঠেছিলেন—জীমূতবাহন সেনের হেঁড়ে গলা সবাইকে ছাপিয়ে গিয়েছিল।

এক সুযোগে জীমূতবাহন আবার অমিতাভর কাছে সরে এসে বলেছিলেন, "চলে যাবেন না, ডিনারের পর দু'জনে একটু গল্প করা যাবে।"

ডিনারের শেষে দু'জনকেই একসঙ্গে রাস্তায় হাঁটতে দেখা গিয়েছিল। জীমূতবাহন সেন ধুতি পরেই পার্টিতে এসেছিলেন। অমিতাভ বলেছিল, "আপনার ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে।"

জীমূতবাহন হাসতে হাসতে বললেন, "দেশের মধ্যে তবু প্যাণ্ট পরি—কিন্তু দেশ ছাড়লেই ধুতি ছাড়া কিছুই পরতে ইচ্ছে হয় না।"

"কেন? হারিয়ে যাবার ভয়?"

"ঠিক তা নয়—কেমন একটা গোঁ বলতে পারেন", জীমূতবাহন উত্তর দিয়েছিলেন।

নিজের ঘরেই অমিতাভকে নিয়ে এসেছিলেন জীমূতবাহন। কাঠিতে দাঁত খুঁটতে খুঁটতে জীমূতবাহন বললেন, "খাওয়াদাওয়া মন্দ হলো না—

কিন্তু ঠিক পরিতৃপ্তি হচ্ছে না।"

"কেন বলুন তো?" অমিতাভ প্রশ্ন করেছিল।

"সে আপনারা বুঝবেন না। আমরা সেকেলে প্রেসিডেন্সির গ্রুপ। ইডেন হিন্দু হোস্টেলের রুমমেট বদ নেশা ধরিয়ে দিয়েছিল। খাবার পর পান আর তার সঙ্গে জর্দা না খেলে মনটা কেমন খুঁত খুঁত করে। কিন্তু সে আর কোথায় পাওয়া যাবে বলুন?"

"এই জন্যেই কি আপনি আজকাল ইণ্ডিয়ার বাইরে বিশেষ আসতে চান না ডক্টর সেন?" অমিতাভ হাসতে হাসতে বলেছিল।

"সে কি? এ কথা কে বললে আপনাদের? দেশে কাজ পড়ে আছে অনেক। কিন্তু ঘর মজিয়ে কেমন মনের সুখে পর ভুলিয়ে বেড়াচ্ছি। বিশ্ব কৃষি-সংস্থার ডিরেক্টর জেনারেল বি আর সেন মশাই ছাড়লেন না। দেশ-বিদেশে অনেকগুলো সেমিনার করে গেলাম এবার।"

অমিতাভর দিকে একটা চুরুট এগিয়ে দিয়ে জীমূতবাহন বললেন, "চুরুট খান তো? এটাও আমরা হোস্টেলে অভ্যেস করেছিলাম। আমাদের সঙ্গে পড়তো হরিহর মহান্তি—ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট ছিল, কিন্তু বদমায়েসির গাছ। সে বলতো সিগারেটটা মেয়েলি নেশা—যদি বেটাছেলে হোস্ তো চুরুট টানবি।"

নিজের চুরুটটা ধরিয়ে নিয়ে জীমূতবাহন এবার বেশ জাঁকিয়ে বসলেন। অনেকদিন পরে যেন সমবয়সী এক বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা মারার সুযোগ পেয়েছেন। চুরুটটা হাতে নিয়ে ঠোঁটটা মুছে ফেলে বললেন, "মেয়েমানুষ বলা থেকে খারাপ গালাগালি তখন ছিল না—আমরা ভয়ে ভয়ে তাই চুরুট চর্চা আরম্ভ করেছিলুম। নিতান্ত পয়সা না থাকলে বিড়ি খেতাম।"

অমিতাভ হাসলো। বললে, "চুরুট খেতে পারি না। বড় কাশি আসে।"

জীমূতবাহন ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনার দেরি হয়ে যাচ্ছে না তো? ঠিক সময়ের মধ্যে হোস্টেলে ফেরবার আইন আছে নিশ্চয়।"

"আমার কোনো অসুবিধে নেই। আমি অ্যাপার্টমেন্টে থাকি, কারুর

সঙ্গে কারুর সম্পর্ক নেই।"

জীমূতবাহন ওয়ারড্রোব থেকে একটা আলোয়ান বার করে নিজের পা দুটো জড়িয়ে নিলেন।

অমিতাভ একটু অবাক হয়েই বললে, "এখানেও আলোয়ান এনেছেন?"

জীমূতবাহন পা দুটো মুড়ে বসতে বসতে বললেন, "আর বলেন কেন, কত রকমের বদ অভ্যেস যে করেছি। আলোয়ান না গায়ে জড়ালে আমার শীত ভাঙে না। ওভারকোট থাকলেও তার ওপর একটা আলোয়ান চড়াতে ইচ্ছে হয়। শাড়ি আর আলোয়ান—এরকম ভার্সেটাইল ড্রেস পৃথিবীতে আর আছে বলে আমার জানা নেই।"

অমিতাভ মৃদু হাসলো। জীমূতবাহনকে তার বেশ লাগছে। দেখতে টিপিক্যাল মফঃস্বল ইস্কুলের হেডমাস্টার, কিন্তু আজ দুপুরেই বৈজ্ঞানিক মহলে ভদ্রলোক কীভাবে সমাদৃত হয়েছেন, তাঁর আধুনিকতম চিন্তা কীভাবে আলোড়ন তুলেছে তা অমিতাভ নিজের চোখেই দেখেছে।

ধুতির সঙ্গে বুট-জুতোপরা পা-টা নাড়তে নাড়তে জীমূতবাহন বললেন, "বিনয় সেন মশাই অনেক ভাল কাজ করবার চেষ্টা করছেন। কে জানে, হয়তো 'ফ্রিডম ফ্রম হাঙ্গার' সত্যিই সম্ভব হবে—ক্ষুধা থেকে মুক্তি পাবে মানুষ। কিন্তু সমস্যাটা তো শুধু পৃথিবীর তিনশ কোটি মানুষের নয়—এদের সঙ্গে কীটপতঙ্গদের যোগ দিন। তারাও খেতে চায়, খেতে ভালবাসে—আর তাদের কোনো ফ্যামিলি প্ল্যানিং নেই।"

চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে, ঠোঁটটা আর একবার মুছে নিয়ে জীমূতবাহন জানালেন, "গ্লেন হেরিকের সঙ্গে আমার আলাপ ছিল। ছ'মাসের জন্যে সেবার স্টেটসে গিয়েছিলাম। হেরিক বললেন, সেন, ৩১শে মার্চ থেকে ২রা অক্টোবর এই যে ক'মাস তুমি এখানে থাকবে তার মধ্যে একটা স্ত্রী ক্যাবেজ অ্যাফিড থেকে ১,৫৬০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ অ্যাফিডের জন্ম হতে পারে। মানুষের খাবারে ভাগ বসিয়েই তো এইসব পোকাদের বেঁচে থাকতে হবে।"

অমিতাভ বললে, "গতকাল আপনি যে পেপারটা পড়লেন—সেটার

এখানকার অনেকেই খুব প্রশংসা করছিলেন।"

এবার পকেট থেকে সুপুরি বার করলেন জীমূতবাহন, এক টুকরো অমিতাভকে দিয়ে আর এক টুকরো নিজের মুখে পুরলেন। গম্ভীরভাবে বললেন, "প্রশংসায় কী হবে? এখনও প্রচুর গবেষণা প্রয়োজন।"

অমিতাভ সেই সামান্য কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ডক্টর সেনের কত আপনজন হয়ে উঠেছিল। বিদেশেই বোধ হয় এটা হওয়া সম্ভব। জীমূতবাহন যেমন অমিতাভর ব্যক্তিগত খবরাখবর জানতে চাইলেন, তেমনি নিজের কোনো কথাও গোপন করলেন না।

বললেন, "কেন আমি বিদেশে এসেছি আপনাকে বলতে বাধা নেই। ফরেন এক্সচেঞ্জের অবস্থা জানেন তো? পঁয়তাল্লিশ কোটি লোকের খাবার আমদানি করতে গিয়ে ভারতবর্ষ দেউলিয়া হতে বসেছে। অথচ আমার এখন অনেক যন্ত্রপাতি চাই। একবার লেকচার ট্যুরে বেরোলেই কিছু পয়সা পাওয়া যায়, অনেকে টাকার বদলে কিছু যন্ত্রপাতিও দেয়।"

একটু থেমে জীমূতবাহন বললেন, "মোটামুটি গুছিয়ে নিয়েছি এবার। ইউ এস এ-তে খুব ভাল সাড়া পেয়েছি—ইংলণ্ডে তো বটেই। এবার পথে একবার রোমে ঢুঁ মেরে যাবো।"

"আপনি এখন কী করছেন ডক্টর সেন?" অমিতাভ জানতে চায়।

জীমূতবাহন একটু হাসলেন। আপনিকে তুমিতে নামিয়ে এনে বললেন, "তুমি কী করছো বলো? বিদেশেই থেকে যাবে নাকি? এরা অবশ্য মাইনে দেয় ভাল, জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্যও অনেক পাওয়া যায়, স্বাধীনতাও আছে, সম্মানও আছে এবং আছে গবেষণার অবাধ সুযোগ।"

অমিতাভর স্বভাব উত্তর না দিয়ে শুধু শুনে যাওয়া। উত্তরের অপেক্ষা না করেই জীমূতবাহন বললেন, "এমন একদিন ছিল যখন আমিও ভাবতাম বৈজ্ঞানিকের কোনো দেশ নেই। সমস্ত পৃথিবীই তার কর্মভূমি। তার কোনো ধর্মও নেই—একমাত্র সত্য। এই সত্যের সন্ধানে নিজের দেশের মাটি কামড়ে পড়ে থাকবার কোনো প্রয়োজন নেই।"

চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে জীমূতবাহন বললেন, "কতকগুলো ব্যাপারে আমি এখনও সেই এক মত পোষণ করি। কিন্তু অমিতাভ, যদি আমরা

দেশকে না দেখি, দেশের সমস্যার বৈজ্ঞানিক সমাধানের চেষ্টা না করি, তাহলেই বা চলবে কী করে?"

সেই অল্পক্ষণের মধ্যেই ডক্টর সেনকে কেমন যেন ভালবেসে ফেলেছিল অমিতাভ। ডক্টর সেন বললেন, "তোমার ডক্টরেটের থিসিস তো সাবমিট করবার সময় হলো। তারপর?"

"এখনও ভেবে দেখিনি। কানাডাতে একটা গবেষণার সুযোগ আছে —এখানকার রয়েল কলেজ অফ এগ্রিকালচারেও কাজ করতে পারি। প্রফেসর ব্ল্যাকার বলছেন, কোনো বড় কেমিক্যাল কোম্পানীতেও বলে দিতে পারেন—শেল, আই-সি-আই বা ডুফার।"

সেই রাত্রে জীমূতবাহন আর কিছু বলেননি। গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন অমিতাভকে।

পরের দিনও জীমূতবাহনের লেকচার ছিল, অমিতাভ শুনতে গিয়েছিল। ডায়াসে উঠবার সময় একবার চোখাচোখি হয়েছিল, ডঃ সেন হেসেছিলেন। বক্তৃতার পর আলোচনার সময় দু-একটা প্রশ্ন করেছিল অমিতাভ।

তারপর ডক্টর সেন লণ্ডন চলে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে কি খেয়াল হলো, ট্রাঙ্ককল করেছিলেন অমিতাভকে।

রাত্রি তখন অনেক, শুয়ে পড়েছিল অমিতাভ। ঘরের টেলিফোনটা তুলে নিয়ে বলেছিল, "হ্যালো।"

ট্রাঙ্ককল শুনে আরও চিন্তিত হয়ে পড়েছিল অমিতাভ। ওদিক থেকে চীৎকার করে জীমূতবাহন বললেন, "স্যরি টু ডিসটার্ব ইউ। হোটেলে বসে বসে ভাবছিলাম। বেশ বুঝছি আপনার দেশে ফেরা দরকার। চলে আসুন ইণ্ডিয়ায়।"

অবাক হয়ে গিয়েছিল অমিতাভ। লোকটা পাগল নাকি? ওদিক থেকে জীমূতবাহন চীৎকার করে বললেন, "তাহলে কবে আসছেন বলুন?"

অমিতাভ বিব্রতভাবে বললে, "ভেবে দেখি।"

"আমার কথা শুনুন—বেশী ভাববেন না। ভাবতে ভাবতেই দেখবেন সময় চলে গিয়েছে। শুনুন, দেশে একটা ছোটখাট ল্যাবরেটরি করেছি। অনেক ফাণ্ডামেণ্টাল কাজ করা যাবে। টাকা দিতে পারবো না বেশী—কিন্তু

অনেক 'লাইভলি' প্রবলেম পাবেন। দরিদ্র দেশমাতা আপনাদের মতো ছেলেদের সাহায্য চায়।"

এ রকম আহ্বানের জন্যে অমিতাভ সত্যি প্রস্তুত ছিল না। মন্দ কী? উৎসাহিত হয়ে অমিতাভ বললে, "আপনাকে চিঠি লিখবো।"

জীমূতবাহন বললেন, "আজ ভোরে রোম যাচ্ছি। সেখান থেকে লিবিয়া। ত্রিপোলিতে কিছু কাজ আছে। দেশে ফিরে গিয়েই যেন চিঠি পাই।"

এর আগে বাড়ির লোকরা কতবার দেশে আসবার জন্যে করুণ আবেদন করেছেন, অমিতাভ বিশেষ পাত্তা দেয়নি। এই রাত্রে অমিতাভর হঠাৎ ভারতবর্ষে ফেরবার লোভ হচ্ছে। জীমূতবাহন তাকে টেলিফোনেই সম্মোহিত করে ফেলেছেন।

প্রফেসর ব্ল্যাকার হেসে ফেলেছিলেন। অমিতাভকে বলেছিলেন, "মনে হচ্ছে ডঃ সেন তোমাকে স্পেল-বাউণ্ড করেছেন।"

অমিতাভ বলেছিল, "কিছুই বুঝতে পারছি না স্যর।"

প্রফেসর ব্ল্যাকার অমিতাভর দিকে কফির কাপ এগিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, "আমি তোমাকে কোনোদিন বাধা দেবো না। ডঃ সেন বহু চেষ্টায় একটা কিছু গড়ে তোলবার চেষ্টা করছেন। দু-একজন কমপিটেন্ট সহকারী প্রত্যাশা করবার অধিকার নিশ্চয়ই তাঁর আছে। আর তা ছাড়া যদিও সায়ানটিস্টের কোনো সংকীর্ণ ন্যাশন্যাল সেন্টিমেণ্ট না থাকা ভাল, তবু তার দেশ যদি কিছু প্রত্যাশা করে তা হলে তা পূরণ করার চেষ্টা অবশ্যই করা উচিত।"

একটু থেমে অধ্যাপক ব্ল্যাকার অমিতাভকে বলেছিলেন, "তুমি তো জানো প্রতি বছর ইংলণ্ডের কত সেরা বৈজ্ঞানিক বেটার মাইনে এবং বেটার সুযোগের লোভে ইউ এস এ এবং কানাডায় পালাচ্ছে। আমিও যেতে পারতাম, সুযোগ এসেছিল বার বার—কিন্তু ওল্ড সেন্টিমেণ্ট আঁকড়ে পড়ে আছি। এখন ইণ্ডিয়া, তোমার মাদারল্যাণ্ড, যদি তোমায় ডাকে কেমন করে আমি না বলতে পারি?"

চুপ করেই বসেছিল অমিতাভ। প্রফেসর ব্ল্যাকার বলেছিলেন, "যারা

পিছনের ব্রীজ পুড়িয়ে ফেলে এগিয়ে যেতে বলে, আমি তাদের দলে নই ; ইউ ক্যান অলওয়েজ কাম ব্যাক। আমি যতদিন বেঁচে আছি ততদিন অন্ততঃ ডারহামের দরজা তোমার জন্যে খোলা থাকবে।"

সোজা কলকাতায় ফিরে এসেছিল অমিতাভ।

ছেলেকে হঠাৎ চলে আসতে দেখে বাড়ির সবাই যে একটু অবাক হয়ে যাননি এমন নয়। তাঁরা তো আশাই ছেড়ে দিয়েছিলেন। বাবা দুঃখ করে বলতেন, "সে বোধ হয় আর ফিরবে না। ওই জন্যে অনেকে খুব বেশী দিন বিদেশে থাকতে বারণ করে। ডি-ন্যাশনালাইজড হয়ে যাবার বিপদটা বেশ প্রকট হয়ে ওঠে।"

"চাকরি নিয়েই এসেছো নাকি ? বিলেতে জোগাড় করা চাকরি আর এখানকার চাকরির অনেক তফাত। অন্তত গভর্নমেণ্টের সায়েনটিস্ট পুল-এ নাম রেজিস্ট্রি করে এসেছো নিশ্চয় বিলেত থেকে।" আত্মীয়রা প্রশ্ন করেছিলেন।

অমিতাভ কোনো উত্তর দেয়নি।

অমিতাভ একটা জিনিস শিখে ফেলেছে—কথার উত্তর দিলেই কথা বাড়ে। অনেক দিন আগেই পণ্ডিতরা এই সার সত্যটি আবিষ্কার করে উপদেশ দিয়ে গিয়েছেন—সবায়ের দিকে তোমার কান এগিয়ে দেবে, কিন্তু খুব অল্পজনের কাছেই মুখ খুলবে !

নীরবেই অমিতাভ একটা চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছিল জীমূতবাহন সেনের কাছে। "হঠাৎ ভারতবর্ষে এসেছি—পাকাপাকি ভাবে নয়। কিছুদিনের জন্যে বেড়াতে এসেছি বলতে পারেন।"

কিন্তু উত্তরটা যে টেলিগ্রামে আসবে তা অমিতাভ ভাবেনি। প্রিপেড টেলিগ্রাম। সঙ্গে টেলিগ্রাফিক মনি-অর্ডারে ট্রেনভাড়া। এখনই চলে এসো।

অন্তত গিয়ে নিজের চোখে সব কিছু দেখতে দোষ কী ? ডঃ সেনের কত লেখাই তো বৈজ্ঞানিক জার্নালে পড়েছে অমিতাভ। লোকটা বোধ হয় পাগল—না হলে কেউ বলে 'আমার এক ট্রাঙ্ক ভর্তি অপ্রকাশিত সায়েন্টিফিক লেখা আছে। কিন্তু জানো, আমার তেমন সাহস হয় না। তোমার মতো কাউকে যদি দেখাতে পারতাম।' শোনো কথা ! বিশ্বজোড়া

খ্যাতিসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক জীমূতবাহন সেন একজন কাল-কা-ছোকরাকে আপনার লেখা শোনাতে চান!

কিছুই ঠিক করা ছিল না। কিন্তু টি-এম-ও ও টেলিগ্রামটাই যেন অমিতাভকে টানতে টানতে এসপ্ল্যানেড বুকিং অফিসে নিয়ে গিয়েছিল, টিকিট কাটাতে বাধ্য করেছিল এবং নির্দিষ্ট দিনে ট্রেনেও তুলে দিয়েছিল।

রবিবারের সন্ধেবেলায় যে রেলযাত্রা শুরু হয়েছিল, মঙ্গলের এই রাত্রেও তার শেষ হলো না!

না, এবার বোধ হয় শেষ হবে। গাড়িটা ইয়ার্ডের মধ্য দিয়ে যেতে শুরু করেছে। কেবিনটা দেখা যাচ্ছে, স্টেশনটা দূরে নয়। কিন্তু স্টেশন থেকে জায়গাটা কতদূরে কে জানে!

ট্রেন থেকে নেমে কোনো অসুবিধাই হলো না। স্টেশনের পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেমে তখন ঘোষণা হচ্ছে: কলকাতার প্যাসেঞ্জার মিস্টার অমিতাভ মিত্র, গেটের কাছে আপনার জন্যে গাড়ি অপেক্ষা করছে।

গাড়ি মানে স্টেশন ওয়াগন। সচরাচর এখানে যেমন দেখা যায় তার থেকে অনেক হাল্কা। গাড়ির ড্রাইভারটি কিন্তু জনৈক মহিলা। অমিতাভ হাত তুলে নমস্কার করলে।

"আপনিই অমিতাভ মিত্র? নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরি থেকে আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি।" মেয়েটি চমৎকার বাংলায় বললে।

ফোর-হুইলারটা কোন্ মেকের দেখবার জন্যে অমিতাভ ঝুঁকে পড়েছিল। মেয়েটি বললে, "এ-দেশী নয়—জাপানী। খুব হাল্কা। জাপান এগ্রিকালচার অ্যাসোসিয়েশনের প্রফেসর মিচিকানা মাস্টারমশাইকে উপহার পাঠিয়েছেন। উনি কিছুদিন আগে এখানে এসেছিলেন।—মাস্টার-মশাইয়ের গেস্ট হয়েছিলেন।"

এ-দেশী মেয়েকে জীপ চালাতে দেখে অমিতাভ যে একটু অবাক হয়নি এমন নয়। গাড়িতে উঠে মেয়েটির দিকে অমিতাভ এমনভাবে তাকিয়েছিল, যার অর্থ—প্রয়োজন হলে আমি ড্রাইভ করতে পারি। কিন্তু পথ-প্রদর্শিকা ধন্যবাদ দিয়ে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলো।

অতিথিকে অভ্যর্থনা জানিয়ে মহিলাটি বললে, "মাস্টারমশাই নিজে এলে আমাকে ড্রাইভ করতে হতো না। কিন্তু উনি ল্যাবরেটরিতে আটকে পড়লেন। ল্যাবরেটরির কোলোরাডা বীটলগুলো হঠাৎ কেমন ঝিমিয়ে পড়েছে। কতকগুলো ইতিমধ্যেই মারা গেল। মাস্টারমশাই ওদের অবজার্ভ করছেন। দু-একটা ওষুধ দিয়ে দেখছেন। হয়তো খাওয়ার দোষ হয়েছে।"

"ফুড পয়জন!" অমিতাভ হেসে উঠলো।

সামনের হেড লাইটটা জেলে দিয়ে মেয়েটি বললে, "মাস্টারমশাইয়ের

ছোট প্রতিষ্ঠান—ড্রাইভার রাখবার মতো সামর্থ্য নেই। সেই পয়সায় একটা ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যাণ্ট রাখতে পারলে খুশী হন তিনি।"

অমিতাভ ভাবছিল, মহিলা সারথির নাম জিগ্যেস করবে—পরিচয়ের পর্বটা যেন অর্ধসমাপ্ত রয়ে গিয়েছে। কিন্তু সেটা নিজে থেকে উত্থাপন করাটা বোধ হয় শোভন হবে না।

কম কথা বলে মেয়েটি। কপালে নেমে আসা গুঁড়ো চুলগুলো বাঁ হাতে ঠিক করে নিয়ে সে বেশ অভ্যস্তভাবেই ডানদিকে গাড়িটা ঘুরিয়ে নিল। তারপর আধা-আলোকিত পথে আবার যাত্রা শুরু হলো। হেড লাইটটা গায়ের জোরে খানিকটা জমি ছিনিয়ে নিয়ে অন্ধকারের বুকের ওপর নিজের ছোট্ট জমিদারি ফেঁদে বসেছে। সেই আলোর অংশটুকুতে কয়েকটা পতঙ্গ ব্যস্ত হয়ে ছোটাছুটি করছে। তারা যেন নতুন আগন্তুককে নিবেদিতা ল্যাবরেটরির পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে এসেছে।

মেয়েটি এবার গাড়ির গতি একটু কমিয়ে দিল, সামনে একটা ঘোড়ায় টানা গাড়ি চলেছে। দক্ষ হাতে তাকে পাশ কাটিয়ে পিছনে ফেলে রেখে আবার এগিয়ে চললো সে। যেতে যেতে বললে, "মাস্টারমশাই হলে গাড়ি থামিয়ে ঘোড়াটার পিছনে কিছুটা সময় কাটাতেন—পরীক্ষা করে দেখতেন কোথাও ঘা আছে কিনা।"

"কেন?" অবাক হয়ে প্রশ্ন করে অমিতাভ।

"এইসব ঘায়ে একরকম সর্বনাশা মাছি ডিম পাড়ে—স্ক্রু ফ্লাই। মাস্টারমশাই কিছু ম্যাগট জোগাড় করবার চেষ্টা করছেন।"

মাস্টারমশাই সম্বন্ধে সারথিনীর যে অগাধ শ্রদ্ধা রয়েছে, তা তার কথার ভঙ্গিতেই ধরা যায়।

সে এবার বললে, "আপনাকে একটু কষ্ট দেবো। গাড়িটা একবার থামিয়ে সামনের ওই দোকান থেকে কিছু খাবার নিয়ে নেবো।"

অমিতাভ সারথিনীর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখবার চেষ্টা করছিল। রঙটা প্রচণ্ড ফর্সা বলা চলে না নিশ্চয়। কিন্তু কোথাও বেশ খানিকটা স্নিগ্ধ লালিত্য রয়েছে। একটা নরম লাজুক ভঙ্গি সাড়ে পাঁচ ফুট দেহটার চারিদিকে লতার মতো জড়িয়ে রয়েছে। অথচ লজ্জায় জড়সড় নয়। মাথায় চুল

অনেক—পিছনে বিরাট খোঁপা, দেহের তুলনায় যেন একটু বড়ই, অন্তত বাংলা দেশের মাপে। সাদা ফুলের মালা জড়ানো রয়েছে খোঁপায়।

তাড়াতাড়িই ফিরে এসেছিল সারথিনী। হাতে খাবারের বদলে বিরাট ঝুড়ি। অমিতাভ সাহায্য করতে এগিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই অবলীলাক্রমে মোটটা পিছনে রেখে দিল সে।

অভিযোগের সুরেই অমিতাভ বললে, "একি কথা। আমরা থাকতে মেয়েরা মোট বইবে!"

হাসির মুক্তো ঝরিয়ে গাড়িতে আবার স্টার্ট দিতে দিতে মেয়েটি বললে, "মাস্টারমশাইয়ের কিন্তু ওসব খেয়াল থাকে না। তিনি বলেন, আদিম যুগে মোট বহন করবার প্রিভিলেজটা মেয়েদের একচেটিয়া ছিল।"

অমিতাভ বললে, "এ-যুগে সেটা বাতিল। হেভি ওয়েট লিফটিং চ্যাম্পিয়নশিপে মেয়েদের প্রতিযোগিতা করতেই দেওয়া হয় না।"

সারথিনী লজ্জাও পেল না, আবার প্রগল্‌ভা হয়েও উঠল না। সহজ-ভাবেই বললে, "প্যাকেটটা এমন কিছু ভারি নয়। অর্ডার দেওয়া ছিল। আজকে না নিয়ে গেলে ক্যাবেজ অ্যাফিডগুলো উপোস করে থাকতো। মাস্টারমশাই খুব একসাইটেড—ল্যাবরেটরিতে ওরা বাচ্চা পাড়তে শুরু করেছে। তবে ছ' মাসে ষোলোটা জেনারেশন হবে কিনা সন্দেহ! মাস্টার-মশাই বলছেন চোদ্দটা হলেও মন্দ কী!"

"চতুর্দশ পুরুষ উদ্ধার হয় তা হলে!" অমিতাভ রসিকতা করলে।

মেয়েটি মৃদু হেসে গাড়ি চালনায় মন দিল। অন্ধকারের বুক ভেদ করে কোন এক অজানা গ্রহের উদ্দেশে যেন জীপটা রকেটের মতো ছুটে চলেছে। অমিতাভ আড়চোখে মহিলার নিপুণ হাত-দুটোর দিকে তাকিয়ে থাকলেও কোনো কথা বললে না।

এবার বোধ হয় লক্ষ্যস্থলের কাছাকাছি আসা গিয়েছে। ডায়াল ল্যাম্পের আলোয় হাতের ঘড়িটা দেখে নিল সারথিনী। তারপর গাড়িটা থামিয়ে লাফিয়ে নেমে পড়ে সামনের গেটের পাল্লাটা খুলে দিয়ে আবার গাড়িতে চেপে বসলো। গাড়িটা ভিতরে ঢুকিয়ে আবার গেটটা বন্ধ করে এল। অমিতাভ নিজেই গেট বন্ধ করতে চেয়েছিল, কিন্তু মেয়েটি বাধা

দিয়েছিল : "আপনি অতিথি। যদি এখানে থাকেন, তখন আপনি নিজেই করবেন, আমরা কেউ বাধা দেবো না।"

"মানে আপনিও বাধা দেবেন না?"

"মোটেই না!"

আরও কথা হতো, কিন্তু রাত্রের নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করে পথ-প্রদর্শিকা বেশ জোরেই হর্ন টিপলো। গাড়িটা কাঁচা রাস্তার মধ্যে দিয়ে চলেছে। দু'পাশে ক্ষেত।

পথ-প্রদর্শিকা বললে, "নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরির মধ্যেই চলে এসেছি আমরা।"

সামনের ছোট্ট একটা কটেজে এবার আলো জ্বলে উঠলো। জীমূতবাহন সেন যে সেখান থেকে বেরিয়ে আসছেন, তা বুঝতে অমিতাভর দেরি হলো না।

একটা ফতুয়া আর পাজামা পরেছেন ডঃ সেন। তিনি যে জীপের আওয়াজ শোনবার জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন তা তাঁর কথাতেই বোঝা গেল। জীমূতবাহন বললেন, "ইন্দুমতী, তোমরা তা হলে এলে? আমার খুব চিন্তা হচ্ছিল।"

"গাড়ি দেড় ঘন্টা লেট ছিল স্যর।" ইন্দুমতী বললে।

"তাই বুঝি? তা হলে তো তোমার খুব কষ্ট হয়েছে ইন্দু।" জীমূতবাহন বেশ বিব্রতভাবেই বললেন।

"না মাস্টারমশাই, কষ্ট কী?" ইন্দুমতীর মিষ্টি উত্তর অমিতাভর দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারল না।

"এসো এসো অমিতাভ। তোমারও নিশ্চয় খুব কষ্ট হয়েছে।" জীমূত-বাহন অমিতাভকে স্বাগত জানালেন। তারপর ইন্দুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "একটা দুঃসংবাদ আছে।"

চমকে উঠেছিল অমিতাভ, "কী দুঃসংবাদ!"

"কোলোরাডা বীটলগুলোকে বাঁচানো গেল না। মড়ক লেগেছে, ইন্দু। তুমি যাবার পরে আরও দু' হাজার আমার চোখের সামনে শেষ হয়ে গেল।"

মাস্টারমশাই যে গভীর দুঃখ পেয়েছেন তা তাঁর কথাবলার ভঙ্গি থেকেই বোঝা যাচ্ছে। হতাশ হয়েই যেন প্রশ্ন করলেন, "এখন কী হবে

বলো তো, ইন্দু ?"

"কী হবে, মাস্টারমশাই। আপনি চিন্তা করবেন না, বাবা তো এখনও ইউ এস এ-তে রয়েছেন। আমি কালই চিঠি লিখে দিচ্ছি—আর এক লট পাঠিয়ে দিতে।"

"তা হলে খুবই ভাল হয়। ডাকের চিঠি কবে গিয়ে পৌঁছবে কিছুই ঠিক নেই। তার থেকে একটা কেব্‌ল পাঠিয়ে দাও। বীট্‌লগুলোর তো এভাবে মরবার কথা নয়। নিশ্চয় ফিডিং-এর দোষ হয়েছিল।"

ঘড়ির দিকে তাকালেন জীমূতবাহন। যেন ঘড়িটার কাছে বকুনি খেয়েই তাঁর সংবিৎ ফিরে এলো। ব্যস্ত হয়ে বললেন, "আই অ্যাম ভেরি স্যরি ইন্দু, রাত অনেক হয়েছে, তুমি তোমার ঘরে চলে যাও।"

শুভরাত্রি জানিয়ে ইন্দুমতী বিদায় নিচ্ছিল। কিন্তু জীমূতবাহন ডাকলেন, "ইন্দু, তোমার টর্চ কোথায় ?"

"আনিনি স্যর—কিছু অসুবিধে হবে না।"

"না, না, এটা খুব অন্যায়—কত রকমের পোকামাকড় ঘুরে বেড়ায় এখানে—কয়েকটা কাঁকড়াবিছে সেদিন খাঁচা থেকে পালিয়েছে। কোথায় ঘর-সংসার পেতে তারা বংশ বৃদ্ধি করছে ঠিক নেই।"

ইন্দুমতী হাসতে হাসতে বলল, "আমার বৃশ্চিক রাশি মাস্টারমশাই।"

মাস্টারমশাই এবার ইন্দুমতীর পায়ের দিকে তাকিয়ে আরও রেগে উঠলেন। "আমার নিজের কাজের অন্ত নেই—এতোগুলো পোকামাকড়ের তদারক করতে করতেই পাগল হয়ে যাচ্ছি, এরপর যদি আমাকে তোমাদের জুতোর খবরও রাখতে হয়!"

"কী হলো মাস্টারমশাই ?" ইন্দুমতী সলজ্জ হেসে জানতে চাইল।

"তুমি আবার চটি পরেছো! বলেছি না, এটা স্লিপারের জায়গা নয় —এখানে তোমাকে মোজার সঙ্গে চামড়ার ঢাকা-জুতো পরতে হবে। কেন যে তোমরা আমার কথার অবাধ্য হও, বুঝি না।"

ইন্দুমতী হাসিমুখে বকুনিটা হজম করলে, তারপর মাস্টারমশাইকে শুভরাত্রি জানিয়ে বিদায় নিল।

জীমূতবাহন স্নেহভরা কণ্ঠে অমিতাভকে বললেন, "বড় ভালো মেয়ে

আমাদের ইন্দুমতী।"

এবার অমিতাভর দিকে মনোযোগ করলেন জীমূতবাহন। "কাল সকালেই তোমাকে একটা বড় টর্চ দিতে হবে। পোকামাকড়দের কোনো নীতিজ্ঞান নেই!"

অমিতাভ একটু হাসলো। জীমূতবাহন বললেন, "আর সময় নষ্ট না করে চলো তোমার বাংলোয়। আমিও যাবো তোমার সঙ্গে।"

"আপনি শুধু শুধু কষ্ট করবেন কেন?"

"আরে চলো চলো। কষ্ট কিসের? তোমার জন্যে আলাদা একটা কটেজ ব্যবস্থা করেছি।"

ছোট্ট কটেজ। জীমূতবাহন নিজেই দরজার চাবি খুললেন। দুটো ঘর। একটায় শোবার ব্যবস্থা, আর একটায় বসবার এবং লেখাপড়া করবার। বেশ ছিমছাম। বিছানা ইতিমধ্যেই পরিপাটি করে সাজানো। একটা কাঠের ওয়ারড্রোবও রয়েছে। লাগোয়া বাথরুম।

জীমূতবাহন বললেন, "ভাল করে দেখে নাও। জল সব সময় পাবে। কিন্তু স্যরি—কোনো বাথটাব নেই। দোষটা আমারই। ইন্দু বলেছিল, তুমি বিলেত থেকে আসছো—বাথটাব ছাড়া তোমার খুব অসুবিধে হবে। কিন্তু আমার সেই ছোটবেলা থেকে ঘটি ঢেলে স্নান করার এমন অভ্যেস হয়ে গিয়েছে যে, বড় হোটেলে গিয়েও বাথটাব ব্যবহার করতে পারি না। তবে তোমার বাথটাবের ব্যবস্থা করে দেবো।"

"না না, আমার মোটেই অসুবিধে হবে না। ক'দিন আর বিলেতে ছিলাম?" অমিতাভ উত্তর দেয়।

"স্নান সেরে জামাকাপড় পাল্টে নাও, আমি তোমার জন্যে বসছি।" জীমূতবাহন একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লেন।

"না না, আপনি কেন অপেক্ষা করবেন?" অমিতাভ আপত্তি জানায়।

জীমূতবাহন পকেট থেকে এক টুকরো এলাচ বার করে মুখে পুরতে পুরতে বললেন, "আজ প্রথম দিন, আমার ওখানেই তোমার খাবার ব্যবস্থা করেছি। কাল থেকে তুমি স্বাধীন।"

জীমূতবাহনের বাংলোটা ষাট-সত্তর গজ দূরে। মধ্যে লাল সুরকি দিয়ে রাস্তা—এমন কিছু চওড়া নয়, একটা ছোট গাড়ি কোনোরকমে চলে যেত পারে। বাংলোটা আকারে একটু যা বড়ো, কয়েকটা বেশি ঘর আছে।

বাড়িতে আর কেউ আছে বলে মনে হলো না, কারণ জীমূতবাহন সেন নিজেই দরজার তালা খুললেন। ড্রইং রুমটা নিতান্ত ছোট নয়—দেওয়ালে অসংখ্য বই-এর সারি।

জীমূতবাহন বললেন, "আমি চাই আমার সাধের এই নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরির সঙ্গে তোমার পরিচয় হোক। কত দূর থেকে আমার কথার ওপর ভরসা করে তুমি এসেছো।"

অমিতাভ প্রতিবাদ করল, "আপনার কথা ছাড়াও প্রফেসর ব্ল্যাকারের মুখে নিবেদিতা ল্যাবরেটরির অনেক খবর শুনেছি আর সায়েন্টিফিক জার্নাল-গুলোও কিছু কিছু উল্টে দেখার অভ্যাস আছে আমার। ফ্রেঞ্চ ইনস্টিটিউট অফ এগ্রিকালচারের জার্নালে আপনার একটা লেখার অনুবাদ ছেপেছে দেখলাম।"

"তুমি ফরাসী জানো?"

"কাজ চালানো গোছের।"

বেজায় খুশী হয়ে জীমূতবাহন বললেন, "খুব ভালো হলো—ফরাসী না জানার জন্যে মাঝে মাঝে বড্ড অসুবিধে হয়। ফরাসী এনটমোলজিস্ট জাঁ হেনরি ফেবারের লেখাগুলো আমার খুব ভাল লাগে। ইংরিজী অনুবাদ পড়েছি কিছু কিছু—কিন্তু অবসর সময়ে তোমার সাহায্যে অরিজিন্যালগুলো পড়া যাবে।"

"নিশ্চয়। ফেবারের কিছু কিছু লেখা আমিও মূল ফরাসীতে পড়েছি—সত্যি খুব ভাল লাগে!" অমিতাভ উৎসাহের সঙ্গে বললে।

জীমূতবাহনের এই পরিবেশ অমিতাভর বেশ ভাল লাগছে। জীমূতবাহনের মধ্যে বোধ হয় সেই গুণ কিছু আছে, যা গান্ধীজীর মধ্যে ছিল—মানুষ দেখলেই, খপ করে মোহিত করে টপ করে নিজের কাজে লাগিয়ে দিতে পারেন। বিলাসী ব্যবসায়ী, বিখ্যাত ব্যারিস্টার, ডাকসাইটে ডাক্তার, উদীয়মান উকিল, কত প্রতিভাধর কেমন সুখে স্বচ্ছন্দে সচ্ছল দিন কাটাচ্ছিলেন। গান্ধীজীর সঙ্গে একবার সাক্ষাতেই মাথায় ভূত চেপে গেল। পসার প্র্যাকটিশ পিছনে ফেলে রেখে জেলখানায় ঢুকতে হলো।

অমিতাভর চিন্তাস্রোতে বাধা দিয়ে জীমূতবাহন বললেন, "তোমার খাওয়া-দাওয়ার অসুবিধে হবে। আমার হরিমোহন যা রাঁধে, তা বোধ হয় তোমার ভাল লাগবে না।"

"মোটেই খারাপ লাগবে না," অমিতাভ জানায়।

জীমূতবাহন বললেন, "হরিমোহনের পূর্বপুরুষ শিবাজীর সৈন্যবাহিনীতে ছিলেন। যুদ্ধ করার চেয়েও রান্না করাটা যে অনেক শক্ত, তা হরিমোহনের কাজকর্ম দেখলে বুঝতে পারবে।"

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে জীমূতবাহন ডাক দিলেন, "হরিমোহন, হরিমোহন।"

অমিতাভকে বললেন, "মেক ইওরসেলফ ইজি—জুতোটুতো খুলে ফেলে নিজের বাড়ির মতো করে বোসো।"

ডাইনিং টেবিলে হরিমোহন একবার আবির্ভূত হয়ে খাবার জিনিসপত্র গুছিয়ে দিলেও, জীমূতবাহনই অমিতাভর দিকে সব এগিয়ে দিতে লাগলেন। হাসতে হাসতে বললেন, "এটা আমার অনেক দিনের অভ্যাস। ছাত্রাবস্থায় হোস্টেল থেকে এই মেয়েলী স্বভাবটা আয়ত্ত করি। সবাই টেবিলে বসতো। আমিই ভাত-ডালগুলো এগিয়ে দিতাম।"

অমিতাভ এবারও হাসলো। জীমূতবাহন বললেন, "এফ এ ও-র ডাইরেক্টর জেনারেল বি আর সেন মশাই একবার রোমে খেতে নেমন্তন্ন করেছিলেন। সেখানেও ভুলে আর একটু হলে আমি নিজেই সার্ভ করতে যাচ্ছিলাম। শেষ মুহূর্তে সামলে নিয়েছিলাম, বিনয়রঞ্জনবাবু জানতে পারেননি। জানলে হয়তো সব জিনিসটাই লঘু করে দিতেন। বলতেন,

পৃথিবীর কোটি কোটি লোকের খাবারের থালায় অন্ন তুলে দেওয়ার সুযোগটা একটা মস্ত প্রিভিলেজ।"

অমিতাভ উত্তর দিলে, "তা সত্যি। পৃথিবীর খাদ্যসমস্যা ক্রমশ যেরকম গুরুতর আকার ধারণ করছে তা খুবই চিন্তার বিষয়। এবং এটা খুবই গর্বের কথা, এই সমস্যা সমাধানের নেতৃত্বটি যাঁকে দেওয়া হয়েছে তিনি একজন ভারতীয়।"

জীমূতবাহন বললেন, "এবার খাওয়া শুরু করো। কোটি কোটি মানুষ যে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে অনাহারে অর্ধাহারে রাত্রি যাপন করছে এসব কথা খাবার সময় মনে না আনাই ভাল।" -

খাওয়ার টেবিলেই কত আলোচনা হচ্ছিল। জীমূতবাহনকে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করছিল অমিতাভ। চোখদুটো দেখলেই মনে হয় বড় স্নেহপ্রবণ। ভারি সরল মানুষটি।

জীমূতবাহনের চশমাটা যা পুরু, কত পাওয়ার কে জানে! তাকানোর কায়দাতেই বোঝা যায় মাইওপিক। অথচ জীমূতবাহন নিজের সাধনায় পৃথিবীর কত দূরের জিনিস দেখতে পাচ্ছেন। শুধু ভূগোলের দূরত্ব নয়—কালের দূরত্ব। লক্ষ কোটি বছর আগে এই প্রাণহীন পৃথিবীতে যেদিন প্রথম প্রাণের স্পন্দন অনুভূত হয়েছিল, কিংবা সাড়ে সাঁইত্রিশ কোটি বছর আগের সেই প্যালিওজিক যুগেও জীমূতবাহন যে অনায়াসে বিচরণ করেন, তা তাঁর কথা শুনেই বুঝতে পারছে অমিতাভ। মাছেদের বয়স তখন অতি সামান্য (এই কয়েক লক্ষ বছর মাত্র!) সিলুরিয়ান পিরিয়ডে প্রথম পতঙ্গের সন্ধান পাওয়া গেল। হেমিপটেরাদের এই নিকট আত্মীয়কে শিলীভূত অবস্থায় জীমূতবাহন সুইডেনে দেখে এসেছেন। কিংবা পঁচিশ কোটি বছর আগে কার্বনিফেরাস যুগে ড্রাগনাকৃতি পতঙ্গরা যখন আড়াই ফুট লম্বা পাখা মেলে উড়ে বেড়াতো, জীমূতবাহন সে সম্বন্ধেও খবর রাখেন!

কথাপ্রসঙ্গে জীমূতবাহন বললেন, "মানুষের বড়াই করবার মতো কিছুই নেই। যদি কারও তা থাকে, সে এই আরশোলার—যা দেখে আমার মেয়ে মদালসা প্রচণ্ড ভয় পেয়ে যায়, ঘেন্নায় বমি করে ফেলে। কিন্তু জীবিত প্রাণীদের মধ্যে একমাত্র আরশোলাই ২৫ কোটি বছরের ঐতিহ্য দাবি

করতে পারে।"

অমিতাভ জীমূতবাহনের মোটা কাচের চশমার দিকে অবাক হয়েই তাকিয়ে ছিল। কিন্তু জীমূতবাহন তা লক্ষ্য করলেন না, আরশোলাদের সম্বন্ধে তাঁর তখন বেশী চিন্তা।

জীমূতবাহন বললেন, "ভেরি প্রিমিটিভ টাইপ অফ ইনসেক্ট! ওদের কাছে আমাদের অনেক কিছু শেখবার আছে। নিজেদের গায়ের রঙ, খাবার জিনিস, সামাজিক ব্যবহার কোনো বিষয়েই আরশোলারা খুঁতখুঁতে হয়নি, তাই আজও তারা টিকে রয়েছে। এবং বহু যুগ পরে অস্তগামী সূর্যের কিরণ বরফে আবৃত এই পৃথিবীর শেষ যে প্রাণীটির ওপর এসে পড়বে, সেও নিশ্চয় একটা আরশোলা।"

জীমূতবাহন সেন কিংবা অমিতাভ মিত্র শেষের সেই ভয়ঙ্কর দিনে নিশ্চয় উপস্থিত থাকবেন না। কিন্তু অ্যাডভেঞ্চার কাহিনীর নায়কের মতো জীমূত-বাহন কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না, অনাগত কালে মানুষের আধিপত্যের একদিন শেষ হবে। প্রকৃতির সংগ্রামে পরাজিত মানুষকে একদিন রণদর্পী পতঙ্গের হাতে পৃথিবীর আধিপত্য সমর্পণ করে চিরবিদায় নিতে হবে।

অমিতাভর চোখদুটো জীমূতবাহনের খুব ভাল লাগছে। চোখ থেকে মানুষের গভীরতা মাপবার একটা সহজাত শক্তি আছে জীমূতবাহনের। ওকে পাঁচ জনের থেকে আলাদা মনে হয়েছে জীমূতবাহনের। সেই আশাতেই তো অমিতাভকে তিনি ডেকে পাঠিয়েছেন। একজন, অন্তত একজন বিশ্বস্ত তরুণ বন্ধুর প্রয়োজন তাঁর, বিজ্ঞানের পদযাত্রায় যে হবে তাঁর সহযাত্রী।

উত্তেজিত হয়ে উঠলেন জীমূতবাহন। অমিতাভকে প্রশ্ন করলেন, "তুমি কি বলো, পতঙ্গের হাতে আমাদের এই পরাজয় আমরা বিনাযুদ্ধে মেনে নেবো? এখন থেকেই আমাদের কি কিছু স্টেপ নেওয়া উচিত নয়?"

মুখ খুলে এ-প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়নি অমিতাভকে। জীমূতবাহন ওর মুখের দিকে তাকিয়েই যেন সব বুঝে ফেলেছেন। অমিতাভ এখনও তাঁর পরিকল্পনার কিছু জানে না। কানে না শুনে, নিজের চোখে সব

কিছু দেখুক অমিতাভ।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে অমিতাভ ও জীমূতবাহন বাইরের বারান্দায় এসে বসলেন। চাঁদ ওঠেনি। কিন্তু তারায় তারায় ছেয়ে রয়েছে আকাশের উঠোন।

তারাগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে অমিতাভ। ওর মনটা যে একটু কাব্যিক তা জীমূতবাহন সহজে বুঝতে পারেন। তারাদের দিকে তাকিয়ে অমিতাভর কী মনে হয় কে জানে। হয়তো মনে হয় কোনো শাড়ির আঁচলের সোনালী চুমকি, কিংবা স্বর্গ দেওয়ালীতে লক্ষ প্রদীপের সমারোহ। কিন্তু জীমূতবাহনের মনে হয়, পৃথিবীর মতো স্বর্গেও নিশ্চয় পতঙ্গের পরাক্রম আছে। তারাগুলো যেন সুদূরের পতঙ্গ।

আজ না হয় বয়স হয়েছে জীমূতবাহনের; সংসারের আগুনে জ্বলেপুড়ে তাঁর সমবয়সী অনেকেই হয়তো কুসুমে কেবল কীট দেখেন। কিন্তু যখন তাঁর বয়স কম ছিল, যখন সবে তিনি বিবাহ করেছেন, সবুজ সম্ভাবনার দিনগুলো যখন সামনে নরম কার্পেটের মতো পেতে দেওয়া হয়েছে, তখনও তারকাতে পতঙ্গ দেখেছেন জীমূতবাহন।

ঈশিতা, তাঁর স্ত্রী, নববিবাহিতার সলজ্জ আভায় তখনও রঙীন হয়ে ছিল। কলকাতার প্রিটোরিয়া স্ট্রীটে ওদের বাড়ির পিছনে সবুজ ঘাসভরা যে বিরাট লন ছিল সেখানে জীমূতবাহনকে নিয়ে গিয়েছিল ঈশিতা। খোঁপায় ফুল পরেছিল ঈশিতা—আর দুটো বেতের চেয়ারে মুখোমুখি বসে গুনগুন করে গান গেয়েছিল, "আজ তারায় তারায় দীপ্ত শিখার অগ্নি জ্বলে নিদ্রাবিহীন গগনতলে।"

বোধ হয় ঈশিতা বুঝেছিল, স্বামীর মরমে সে গান ঢুকছে না। তাই বোধহয় বলেছিল, "কী হাঁদা-গঙ্গারামের মতো আকাশের দিকে তাকিয়ে আছো?"

মনে যে একটু আঘাত লাগেনি এমন নয়। কিন্তু জীমূতবাহন এসব সহ্য করবার মতো মানসিক প্রস্তুতি নিয়েই জগদানন্দ বসুর মেয়েকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছিলেন। ঈশিতা বলেছিল, "জান, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তোমার

খবরাখবর চেয়েছেন।"

"আমার খবর! পৃথিবীতে এতো লোক থাকতে গ্রাম্য স্কুলের পাশ করা জীমূতবাহনের খবর নিতে চেয়েছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর!"

ঈশিতা একটু বিরক্ত হয়ে বলেছিল, "তার কারণ তুমি ঈশিতার স্বামী—আমাকে কবিগুরু খুব স্নেহ করেন। জন্মদিনে কবিতা লিখে দিয়েছেন। অসুস্থ হয়ে না পড়লে বিয়েতে ঠিক আসতেন, হয়তো একটা বড় কবিতাই লিখে ফেলতেন। এখন সুস্থ হয়েই তোমার খবরাখবর জানতে চেয়েছেন। একবার জোড়ে শান্তিনিকেতন যেতেও বার বার অনুরোধ করেছেন।"

ঈশিতা বলেছিল, "তুমি নিজেই ওঁকে চিঠি লেখো না—একটা খামের মধ্যে দু'জনের চিঠি পাঠিয়ে দিই। খুব খুশী হবেন, নিশ্চয় উত্তর দেবেন।"

"রবীন্দ্রনাথকে? ওরে বাবা, মরে গেলেও নয়!"

"কেন, তোমার বাংলা বানান ভুল হয় নাকি? সায়েন্সের ছাত্র, হলেও হতে পারে, কিন্তু আমি তো রয়েছি, দেখে দেবো।"

"পাঠশালায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগটা যত্ন করে পড়তে হয়েছিল, তাই বানান ভুল হয় না—কিন্তু একেবারে কাঠখোট্টা মানুষ। একটুও রসকষ নেই," জীমূতবাহন বলেছিলেন।

"রস না থাকুক, কষ যে আছে সেটা বেশ বুঝিয়ে দিচ্ছো।" অভিমানিনী ঈশিতা উত্তর দিয়েছিল।

রোমান্সের সেই অবমাননা ঈশিতা বোধহয় আজও ভুলতে পারেনি। কিন্তু কী করবেন জীমূতবাহন? কোটি কোটি কীটপতঙ্গের জীবনে আদিম রোমান্সের যে পুনরাবৃত্তি হচ্ছে তার গহনে একবার প্রবেশ করলে অন্য কিছুতেই আর রস পাওয়া যায় না।

ঈশিতা যদি তার মধ্যে প্রবেশ করতো, সেও নিশ্চয় সমান আনন্দ পেতো। মানুষের সমাজে যে উত্থান-পতন চলেছে, পিঁপড়ের সামাজিক কাহিনী কি তার থেকে কম রোমাঞ্চকর? ধরিত্রীর বক্ষ খনন করে পুরাতত্ত্ববিদ্‌রা মহেঞ্জোদারোর যে ইতিহাস অতীতের আলিঙ্গন থেকে উদ্ধার করেছেন, তা অবশ্যই আকর্ষণীয়; কিন্তু মাটির গর্ভে উই পোকার নগরে যে রমণী প্রতিদিন সাত হাজার সন্তানের জন্ম দিচ্ছে এবং অলিখিত সংবিধানের বলে

ত্রিশ লক্ষ নাগরিকের উপর কর্তৃত্ব করছে, সেও কি কম আকর্ষণীয় ?

ঈশিতাকে জীমূতবাহন কিছুদিন আগেই বলেছিলেন, "জানো, উইদের রানীকে পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকতে দেখা গেছে। প্রতিদিন সাত হাজার ডিম পাড়লে অর্ধ-শতাব্দীতে কত হয় ভেবে দেখো তো !"

ঈশিতা কোনো বিস্ময় বোধ করেনি, বরং ঘেন্নায় তার গা ঘিন ঘিন করতে শুরু করেছিল। বলেছিল, "সবে মাত্র খেয়ে এসেছি—এখন এই সব বলতে আরম্ভ করলে বমি হয়ে যাবে আমার।"

কিন্তু ঈশিতার অতীত রোমন্থনের অনেক সময় পাওয়া যাবে ; এখন বরং অমিতাভর মনে যে-সব প্রশ্ন জাগতে পারে তার উত্তর দেওয়া যাক।

জীমূতবাহন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। আচমকা ঝাঁকানি খেয়ে উঠে পড়ে অমিতাভকে বললেন, "তুমি সিগারেট ধরাচ্ছো না কেন অমিতাভ ? নিজে সিগারেট খাই না, কিন্তু তাই বলে 'নাদার মধ্যে কুকুরের' পলিসি অনুসরণ করি না আমি।"

অমিতাভ তখনও ইতস্তত করছিল দেখে জীমূতবাহন নিজেই ভিতর থেকে সিগারেট নিয়ে এলেন। বললেন, "জাপানী অধ্যাপক মিচিকানা কিছুদিন এখানে আতিথ্য নিয়েছিলেন। তিনি চুরুটের ভক্ত নন। সিগারেট না হলে তাঁর চলতো না—সেই সময় কিনে রেখেছিলাম।" জীমূতবাহন সিগারেট এগিয়ে দিয়ে দেশলাই জ্বেলে দিলেন। নিজেও এবার একটা চুরুট ধরালেন তিনি।

সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ছে অমিতাভ। ধোঁয়ার কুণ্ডলীগুলো প্রশ্নচিহ্নের আকার ধারণ করে জীমূতবাহনকে সেই সব প্রশ্ন জিগ্যেস করছে যা অমিতাভ সোজাসুজি বলতে পারছে না।

অন্তত জীমূতবাহনের তাই মনে হলো। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে তিনি আবার অমিতাভকে বললেন, "তোমার যা-যা জানতে ইচ্ছে করছে আমাকে নিঃসঙ্কোচে বলো।"

অমিতাভ কোনো উত্তর দিলে না।

"চুপ করে রইলে কেন, অমিতাভ ? আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র আমাদের বলতেন—ইউ মাস্ট আস্ক কোয়েশ্চেনস্।"

"প্রফেসর ব্ল্যাকারের কাছে শুনেছি, আপনি নতুন অনেক কিছু করার স্বপ্ন দেখেছেন," অমিতাভ ধীরে ধীরে বললে।

"স্বপ্ন অনেকেই দেখে, অমিত। আসলে সারাজীবন ধরে যা দেখে এলাম সে কি শুধু স্বপ্ন, না তার কোনো বাস্তব সম্ভাবনা আছে? সেইটাই আজকে আমার কাছে, শুধু আমার কাছে কেন, সমাজের কাছে, এমনকি আমার বাড়ির লোকের কাছেও মস্ত বড় একটা প্রশ্ন।"

"মানে?" অমিতাভ প্রশ্ন করে।

"মানে, মনে করো পরীক্ষার হলে বহুক্ষণ ধরে একটা জটিল অঙ্ক কষে যাচ্ছো। অঙ্কটা শেষ পর্যন্ত মিলবে কিনা তুমি নিজেই বুঝতে পারছো না, অথচ সময় ফুরিয়ে আসছে। এই অবস্থায় তুমি কি সেই অঙ্কটাই কষে যাবে, না অন্য কোনো সহজ অঙ্ক ধরবার চেষ্টা করবে?"

সিগারেট টানা বন্ধ করে অমিতাভ যে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে তাঁর কথা শুনছে, জীমূতবাহন এবার তা বুঝতে পারলেন। নিজের উত্তেজনা চেপে রেখে বললেন, "একদিনে তোমার ঘাড়ে সব ডেটা চাপিয়ে দিতে চাই না। আস্তে আস্তে তুমি নিজেই সব বুঝতে পারবে। এখন মোটামুটি দরকারী কথাগুলো বলে দিই।"

"বলুন স্যর।"

"তুমি জানো, আমি পেস্টিসাইডের ওপর কাজ করে প্রথম বৈজ্ঞানিক জগতে নাম করেছিলাম। পৃথিবীতে আমাদের অনেক ফসল দরকার। যদি এতগুলো মানুষকে দু' বেলা খাওয়াতে হয়, তাহলে পোকামাকড়ের হাত থেকে কৃষিপণ্যকে রক্ষা করতেই হবে। ধানের মাজরা পোকা, স্টেম বোরার অর্থাৎ কিনা Schoenobius bipunctifera এবং পামরী পোকা —রাইস হিস্পা (Hispa armigera)-এর উপর প্রথম কাজ আরম্ভ করি।"

অমিতাভ বললে, "আপনার গোড়ার যুগের সেই রিপোর্ট ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এখনও পড়ে থাকে। হাইমেনোপটেরা, নিউরোপটেরা ও কোলিওপটেরার ওপর আপনার কয়েকটা কাজ তো ক্লাসিক স্বীকৃতি পেয়েছে।"

অমিতাভর দিকে তাকিয়ে জীমূতবাহন বললেন, "সেসব কাজের পর বিজ্ঞানের বহু অগ্রগতি হয়েছে—জাপান এবং স্টেটসের বৈজ্ঞানিকরা অনেক নতুন আলোকসম্পাত করেছেন। ঐতিহাসিক মূল্য ছাড়া সেনস্ রিপোর্টের আর কোনো মূল্য নেই আজ। আর কবে মান্ধাতার আমলে একটা কিছু করে, সেই নাম ভাঙিয়ে বাকি জীবনটা কুড়েমি করে এবং ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেওয়াটাও আমি ঘৃণা করি।"

"ভারতীয়দের এ-রকম একটা বদনাম আছে বটে—খুব ভাল স্টার্ট এবং ব্যাড ফিনিস।" অমিতাভ তার নিজের মত জানাল।

"অথচ সব ভাল যার শেষ ভাল।" জীমূতবাহন এবার অমিতাভর কথার সূত্র ধরলেন। "আমার স্থির বিশ্বাস ছিল, কেমিক্যাল কণ্ট্রোল ছাড়া পতঙ্গের এই পরাক্রম থেকে কৃষির মুক্তি নেই। আমেরিকায় সেই সময় পাগলের মতো পরিশ্রম করেছিলাম এবং ভাগ্যের দেবতা স্মিতহাস্যে আমার দিকে কৃপাদৃষ্টিপাতও করেছিলেন।"

অমিতাভ বিস্মিতভাবে জীমূতবাহনের কথা শুনে যাচ্ছিল। "আপনি কেমিক্যাল পেস্টিসাইডে দুটো পেটেন্ট পেয়েছিলেন, তাই না?"

"অত অল্প সময়ের মধ্যে দুটো পেটেন্ট পাওয়া নিতান্ত ঈশ্বরের আশীর্বাদ ছাড়া কি বলবো? অনেকে তখন বলেছিল, নিজের ফার্ম চালু করো—ক্রমশ বড় কোম্পানী হয়ে উঠবে। নিজের আবিষ্কারকে মূলধন করে যাঁরা কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁদের বিশ্বজোড়া নাম হয়েছে—আলফ্রেড নোবেল, হেনরি ফোর্ড, আলেকজাণ্ডার গ্রাহাম বেল, মার্সিজ মার্কনি ও আনেস্ট ফন সীমেন্স—আরও কত নাম বলতে পারি।"

"করলেন না কেন? পৃথিবীর রসায়ন শিল্পে একজন ভারতীয়ের নাম অন্তত পরিচিত হয়ে যেতো," অমিতাভ প্রশ্ন করে।

জীমূতবাহন বললেন, "অনেকে যেমন বিশ্বজোড়া কোম্পানী ফেঁদেছেন, তেমন আবার অনেকে দেউলিয়াও হয়ে গিয়েছিলেন।"

"সেটা তো অ্যাডভেঞ্চারের প্রশ্ন। চেষ্টা করে হেরে যাওয়ার মধ্যে কোনো লজ্জা আছে?" অমিতাভ জানতে চায়।

"না অমিতাভ, ব্যবসা আমাদের কাজ নয়। আমাদের কাজ গবেষণা।

তা ছাড়া, আমার এক এক সময় কীটনাশক ইনসেকটিসাইড-এর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সন্দেহ হয়।"

"মানে, আপনি কী বলতে চান? রাসায়নিক কীটনাশক আবিষ্কৃত না হলে পৃথিবীতে এতোদিন দুর্ভিক্ষ লেগে যেতো। পোকামাকড় পৃথিবীময় চাষের যে সর্বনাশ করছিল—ইনসেকটিসাইড তার হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করেছে।"

জীমূতবাহন চুরুটে আর একটা টান দিয়ে বললেন, "কীটনাশক ছাড়া এগ্রিকালচারের কথা ভাবা পর্যন্ত যায় না—স্বীকার করি। আমাদের দেশেই প্রতি বছর অন্তত এক হাজার কোটি টাকা দামের খাদ্যশস্য পোকামাকড় এবং জন্তুজানোয়াররা নষ্ট করছে। কোটি কোটি টাকার কীটনাশক ক্ষেতে ক্ষেতে বিভিন্ন সময় স্প্রে করা দরকার। পৃথিবীর অন্য দেশেও তাই হচ্ছে—এরোপ্লেন এবং হেলিকপ্টার পর্যন্ত এই কাজে লাগানো হচ্ছে! কিন্তু যে জিনিসটা আমাকে ক্রমশই চিন্তিত করে তুলছে তা হলো পতঙ্গরাও বাঁচবার নতুন পথ খুঁজে বার করছে।"

একটু থেমে জীমূতবাহন বললেন, "কীটনাশকে প্রথম দিকে যে-রকম কাজ হতো ইতিমধ্যেই আর ততটা হচ্ছে না। এমন একদিন আসতে পারে, যেদিন পতঙ্গের সহ্যশক্তি এমন বেড়ে যাবে যে, মানুষের তৈরি এই ইনসেকটি-সাইডে আর কোনো কাজই হবে না। মশা, মাছি, বীট্‌ল, মথ এরা মহানন্দে রসায়নকে অবজ্ঞা করে নিজেদের বংশবৃদ্ধি করে যাবে।"

অমিতাভ বললে, "সেদিন এখনও অনেক দূরে।"

জীমূতবাহন বললেন, "দূরে, কিন্তু হয়তো খুব দূরে নয়। আগে যেখানে ফাইভ পারসেন্টে কাজ হতো, এখন সেখানে দশ পারসেন্ট দিতে হচ্ছে, তাতেও সব সময় মনের মতো ফল পাওয়া যাচ্ছে না। পোকারা নীলকণ্ঠ হবার সাধনা করছে।"

অমিতাভ উত্তর দেয়, "কয়েকটা বড় বড় কেমিক্যাল ল্যাবরেটরি দেখেছি আমি। নতুন নতুন বিষ বার করবার জন্যে নিরন্তর গবেষণা চলছে। সেই সব ছড়িয়ে কৃষিবিজ্ঞানীরা শিশু চারাদের সর্বভুক্ পোকাদের হাত থেকে রক্ষা করবে।"

জীমূতবাহন বললেন, "রাসায়নিক যুদ্ধ যারা করছে, করুক। কিন্তু এর বিপদের দিকটাও যে ক্রমশ আরও প্রকট হয়ে উঠবে, এ সম্বন্ধে আমার মনে একটুও সন্দেহ নেই। নির্বিচারে বিষ ছড়িয়ে, প্রকৃতির রাজ্যে, আমরা ইতিমধ্যে বহু সর্বনাশ করেছি। শত্রু পোকার সঙ্গে যে-সব পোকা মানুষের বন্ধু, আমরা তাদের নির্বংশ করে ফেলে, নতুন বিপদ ডেকে আনছি।"

"নিখাদ আশীর্বাদ বলে কোনো জিনিস তো পৃথিবীতে নেই। একদিন বাষ্পীয় রেল-ইঞ্জিন আমাদের জন্যে নতুন আশীর্বাদ বহন করে এনেছিল, কিন্তু তার সঙ্গে এসেছিল ম্যালেরিয়া। ম্যালেরিয়ার ভয়ে রেলপথ বিস্তার বন্ধ করে হাত গুটিয়ে বসে থাকলে ভাল হতো কি?" অমিতাভ নিজের মত জানায়।

কিন্তু জীমূতবাহন এই বিষয়ে চিন্তা করেছেন। তিনি বললেন, "মোটর গাড়ি না থাকলে মোটর অ্যাক্সিডেন্টে লোক মারা যেতো না—সুতরাং মোটর গাড়ি না হওয়াই ভাল ছিল, এমন মতে নিশ্চয় আমি বিশ্বাস করি না অমিতাভ। কিন্তু নির্বিচারে ইনসেকটিসাইড ব্যবহার করে আমরা ভবিষ্যৎ মানব জাতির দৈহিক ক্ষতি করছি, একথা পশ্চিমের অনেক বৈজ্ঞানিক এখন বলছেন। বৈজ্ঞানিক জার্নালের সীমা পেরিয়ে, মাঝে মাঝে খবরের কাগজেও এ-সম্বন্ধে কথা উঠছে। আমরা বোধহয় ধীরে ধীরে অনেক শস্যকেও বিষাক্ত করে ফেলছি। গোরুবাছুররা এই সব খড় এবং ঘাস খাচ্ছে। তাদের দুধ থেকে এইসব বিষ তোমার আমার ঘরে ফিরে আসছে। কোটি কোটি অনাগত শিশুর ওপর একদিন এই বিষের কী ক্রিয়া হবে, তা এখনও আমাদের জানা নেই।"

অমিতাভ বললে, "তা হলে হাত গুটিয়ে বসে থাকবে চাচা? দেখবে তার সোনার ক্ষেত ঝাকে ঝাঁকে পতঙ্গ এসে লুট করছে?"

"না, তা বলছি না।"

"তবে?"

"কেমিক্যাল কণ্ট্রোল আমি ছেড়ে দিতে বলছি না—আরও অনেকদিন ধরে এই সব বিষ আমাদের চাষ-আবাদ রক্ষা করতে সাহায্য করবে। কিন্তু অন্য যেসব পথ রয়েছে, সেসব সম্বন্ধে আরও বেশী করে চিন্তা করবার সময়

এসে গিয়েছে। আমার এই ছোট্ট ল্যাবরেটরিতে সেই নিয়েই তো কাজ চালাবার চেষ্টা করছি।"

"আপনি বায়োলজিক্যাল কণ্ট্রোলের কথা বলছেন?"

জীমূতবাহন বললেন, "ক্যালিফোর্নিয়ায় একবার কটনি কুশন স্কেল পোকার অত্যাচার শুরু হলো। অস্ট্রেলিয়া কিংবা নিউজিল্যাণ্ড থেকে কীভাবে তারা আমেরিকা পাড়ি দিয়েছিল। অস্ট্রেলিয়ায় তাদের বংশ তেমন দ্রুত বৃদ্ধি পায় না, কিন্তু ক্যালিফোর্নিয়ায় তারা এতো বেড়ে যাচ্ছে কেন? এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করবার জন্যে আলফ্রেড কীবিল নামে এক ভদ্রলোককে অস্ট্রেলিয়ায় পাঠানো হলো। তিনি সেখানে ওই পোকার জন্মগত শত্রু আর এক পোকাকে আবিষ্কার করলেন। লেডি বার্ড বীট্‌ল এনে ক্যালিফোর্নিয়ায় ছেড়ে দিতেই মন্ত্রের মতো ফল পাওয়া গেল।"

একটু কেশে জীমূতবাহন বললেন, "আমার বন্ধু ডাক্তার মায়ার পোকা দিয়ে পোকা তাড়ানোর যে আশ্চর্য ফল হাওয়াই দ্বীপে পেয়েছেন, তা তো গল্পের মতো শোনায়। ফিজিতে লেভুয়ানা মথকে কিছুতেই বাগে আনা যাচ্ছিল না। সেখানে ট্যাকিনিড প্যারাসাইট ছেড়ে দিতেই কাজ পাওয়া গিয়েছে।"

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে জীমূতবাহন এবার চমকে উঠলেন, বললেন, "প্রায় বারটা বাজতে চলেছে। এখন আর আলোচনা নয়। আলোচনা করবার অনেক সময় পাওয়া যাবে। দু'দিন ট্রেন জার্নি করে তোমার এখন ঘুমের প্রয়োজন। যতক্ষণ খুশী ঘুমিয়ে থেকো।"

জীমূতবাহন নিজে অমিতাভকে এগিয়ে দিয়ে গেলেন। অমিতাভর ঘরে খাবার জল দেওয়া হয়েছে কিনা নিজে দেখলেন। তারপর শুভরাত্রি জানিয়ে বিদায় নিলেন।

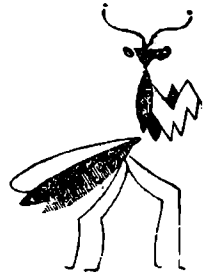

অমিতাভর কটেজ থেকে নিজের বাংলোয় ফিরে আসছেন জীমূতবাহন। তিনি ছাড়া নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরির সব মানুষ এতোক্ষণে নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু একনম্বর শেডে পতঙ্গদের কনসার্ট শুরু হয়েছে। কত রকমের অদ্ভুত আওয়াজ তাদের—কিন্তু সব মিলে সুন্দর ঐকতানের সৃষ্টি হয়েছে। ওদিকে বাইরের পতঙ্গ শিল্পীরাও অনাহূত হয়েই আসরে যোগ দিয়েছে। ল্যাবরেটরির ক্ষেতে অনেক ঝিঁ ঝিঁ জমা হয়েছে নিশ্চয়—তারাও সঙ্গীত সম্মেলনে মনের সুখে সুর ধরেছে।

টর্চের আলোটা ক্ষেতের ওপর ফেললেন জীমূতবাহন। আলোটা অনেক দূর পর্যন্ত দৌড়ে গেল—কিন্তু ল্যাবরেটরির সীমানার বাইরে নয়। পঞ্চাশ একর জমি নিয়ে এই ল্যাবরেটরি।

একবার শেডে যাবেন নাকি? কাটুই পোকা Agrotis ypsilon-গুলোর খবর নিয়ে এলে হয়। নতুন অতিথি। মাদ্রাজ থেকে আনিয়েছেন তিনি।

কাটুই পোকার জীবনটা আরও ভাল করে অনুসন্ধান করে দেখবেন জীমূতবাহন। ডিডিটি আর টক্সোফিন দিয়ে এদের এখনও নিধন করা হচ্ছে। কিন্তু আর কতদিন? রাতের অন্ধকারে এরা সক্রিয় হয়ে উঠে আলু, ছোলা, তামাক, তুলো এবং মটর গাছের চারার গোড়া কেটে দেয়। সেবার এক বছরে এক লক্ষ একর জমির চাষ নষ্ট করে দিয়েছিল কাটুই পোকারা।

না, কাল সকালে এদের খোঁজ খবর নিলে চলবে। সেই সঙ্গে আর একজন অতিথি অমিতাভ মিত্রর খবরও নেওয়া যাবে'খন। টর্চটা হাতে নাচাতে নাচাতে জীমূতবাহন ডান দিকে মোড় ফিরলেন। কাঁচা রাস্তার উপর দিয়ে একবার খামারের পশ্চিম কোণের দিকে চলতে আরম্ভ করলেন। মাঝে মাঝে টর্চের আলোটা জ্বালছেন আর নেভাচ্ছেন। যেন অন্ধকারে মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকে উঠছে।

সাত নম্বর প্লটের কাছাকাছি এসে জীমূতবাহন টর্চ জ্বালানো বন্ধ করে দিলেন। যাদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে এসেছেন তারা আলো পছন্দ করে না। ধানের চাষ হয়ে রয়েছে কয়েক কাঠা জমিতে। গাছগুলো দু'দিন আগেও নীরোগ ছিল। হাওয়ায় দুলে দুলে সুস্থ সবুজ শিশুরা তখন জীমূত-বাহনকে অভিবাদন জানিয়েছিল। সঙ্গে ছিল ইন্দুমতী।

ইন্দুমতী বোধ হয় মাস্টারমশাইয়ের হাবভাব দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। "কী ভাবছেন মাস্টারমশাই?" ইন্দুমতী প্রশ্ন করেছিল।

"ভাবছি, উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে তা এই চারাদের দিকে তাকিয়ে যে কেউ বলে দিতে পারে। এর জন্যে বৈজ্ঞানিক প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। তোমার কি মনে হচ্ছে না এরা জীবন্ত? আমাদের দেখে এই সব শিশুরা উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে।"

ইন্দুমতী বলেছিল, "মাস্টারমশাই, আপনি বোধ হয় আমাদের থেকে অনেক বেশী দেখতে পান। ওরাও বোধ হয় বুঝতে পারে, আপনি ওদের বন্ধু।"

খুব খারাপ লেগেছিল, এই সুস্থ সবল নীরোগ শিশুদের মধ্যে রাক্ষসদের ছেড়ে দিতে। কিন্তু ওরা যে গিনিপিগ।

"এদের মধ্যে কী ছাড়ছেন মাস্টারমশাই?" ইন্দুমতী প্রশ্ন করেছিল।

জীমূতবাহন বলেছিলেন, "সোয়ারমিং কেটারপিলার—বৈজ্ঞানিক নাম স্পোডোপটেরা মরিসিয়া। শিশু ধান চারার চরম শত্রু। বাংলা দেশের চাষীরা বলে লেদা পোকা। জমিতে এদের দেখলে চাষীদের ঘরে কান্না শুরু হয়ে যায়।"

ধান ক্ষেতের খুব কাছে এসে পড়েছেন জীমূতবাহন। আলো না

জ্বালিয়েই খপ করে একটা চারায় হাত দিলেন তিনি। যা ভেবেছেন তাই —তাঁর হাতেই গোটা পাঁচেক লেদা পোকা ছটফট করছে। রাতের অন্ধকারে তারা নির্মম হত্যাকাণ্ড শুরু করেছে। দিনের বেলায় মাটির তলায় খুনেগুলো লুকিয়ে থাকে। নিরীহ চাষী বুঝতে পারে না। তারপর রাতের অন্ধকারে ওরা ঝাঁকে ঝাঁকে বেরিয়ে আসে। পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্রে কত চাষীর ঘরে ঘরে কান্না ওঠে—সোনার ধানে তাদের মাঠ আর ভরে উঠবে না।

লেদা পোকাগুলো হাতের মধ্যে থেকে পালাবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছে—জীমূতবাহনের হাতে ছুঁচ ফুটিয়ে দেবার চেষ্টা করছে। এখনই টিপে মেরে ফেলে একটা চারাগাছকে অন্তত তিনি নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন। কিন্তু মাত্র দুটো হাতে ভারতের লক্ষ লক্ষ কৃষিজীবীর ক'জনকে তিনি উদ্ধার করবেন? ভারতবর্ষের বিশাল মানচিত্রটা জীমূত-বাহনের মানসচক্ষে ভেসে উঠলো। তিনি দেখলেন, ধানের চারা দিয়েই যেন তাঁর প্রিয় জন্মভূমির সুবিশাল মানচিত্রটা তৈরী হয়েছে। পতঙ্গের আক্রমণ থেকে ত্রাণ পাবার জন্যে কোটি কোটি শিশু হঠাৎ ক্রন্দন শুরু করেছে।

এবার আলো জ্বালালেন জীমূতবাহন। সমস্ত গাছগুলোর রঙ রাতা-রাতি পালটিয়ে গিয়েছে। সোয়ারমিং কেটারপিলারের দল মরণ আলিঙ্গনে চারাদের আবদ্ধ করেছে। কিন্তু একা তিনি কী করবেন? ভারতবর্ষের কৃষকরা জানে না, একটা ঋতুতেই এরা পাঁচটা বংশধারা বিস্তার করতে পারে।

কেমন যেন মায়া হলো জীমূতবাহনের। তাঁর গবেষণার জন্যে চারাগাছগুলো মৃত্যুবরণ করছে—না হলে নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরির চতুঃসীমানায় লেদা পোকাদের ঢোকার সাধ্য থাকত না। কাল সকাল বেলায় সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কীটদের আর দর্শন মিলবে না—তখন মেপে দেখতে হবে একদিনে কত ক্ষতি করতে পেরেছে এরা।

সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাতে চারাগুলোকে সঁপে দিয়ে জীমূতবাহন এবার নিজের বাংলোর দিকে চলতে লাগলেন। ঝিঁঝিরা তাদের বাজনা বাজিয়ে চলেছে

—এদের কোনো ক্লান্তি নেই।

বাড়িতে ফিরে এসেই যদি জীমূতবাহন ঘুমোতে পারতেন, কেমন সুন্দর হতো।

কিন্তু জীমূতবাহনের এক এক দিন কী হয়, কিছুতেই ঘুম আসে না। একদিক দিয়ে তিনি ভাগ্যবান, সাধারণত ঘুমকে ডাক দিলেই এসে হাজির হয়। ঘুমকে ডেকে কতবার জীমূতবাহন কত সর্বনাশা দুশ্চিন্তার হাত থেকে সাময়িকভাবে মুক্তি পেয়েছেন। কিন্তু মাঝে মাঝে কী যে হয়—ঘুমদের বাড়ি ফেরার কথাই মনে থাকে না।

শেষ যেবার কলকাতায় ঈশিতার সঙ্গে দেখা হলো, বোনের বাড়ির কী একটা বিয়ে নিয়েই সে দিন-রাত ব্যস্ত থাকতো। কতদিন পরে কলকাতায় এসেছেন জীমূতবাহন! কিন্তু ঈশিতা বাপের বাড়ির আত্মীয়দের নিয়েই মশগুল।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে জীমূতবাহন দেখেছেন দশটা বাজলো, এগারোটা বাজলো, রাত সাড়ে এগারোটার সময়েও ঈশিতার দেখা নেই। বারোটায় গাড়ি গ্যারেজে তোলার আওয়াজ পাওয়া গেল।

কিন্তু ঈশিতাকে তিনি কিছুই বলেননি। শুধু একবার তার দিকে তাকিয়েছিলেন। ঈশিতা তাও সহ্য করতে পারে না। বিরক্তভাবে বলেছিল, "তোমাকে দেখলে সত্যি হিংসে হয়। সমাজ, সংসার, আত্মীয়-স্বজনের কথা না ভেবে কেমন নিজেকে নিয়েই খুশী হয়ে রয়েছো।"

"মানে?" জীমূতবাহন প্রশ্ন করেছিলেন।

"মানে, আমার বাবাও হাইকোর্টের একজন নামজাদা ব্যারিস্টার ছিলেন। অনেক রাত পর্যন্ত তাঁকেও কাজ করতে হতো। কিন্তু তবুও তিনি সামাজিকতার সমস্ত দায়িত্ব আমার মায়ের ঘাড়ে জোর করে চাপিয়ে দিতেন না। মাঝে মাঝে নিজেও যেতেন পার্টিতে। সবার সঙ্গে দেখাশোনা করে ফিরে আসতেন। বৈজ্ঞানিককে নিশ্চয় হাইকোর্টের টপ ব্যারিস্টারের থেকে বেশী ব্যস্ত থাকতে হয় না!"

বিরক্তভাবে জীমূতবাহনের বলতে ইচ্ছে হয়েছিল, "আজকের পৃথিবীতে বৈজ্ঞানিকের অনেক বেশী ব্যস্ত থাকা প্রয়োজন।" কিন্তু কী হবে ঈশিতার সঙ্গে তর্ক করে? ব্যারিস্টারের মেয়ের সঙ্গে তর্ক করে কোনোদিন পেরে উঠবেন না।

তর্ক চানও না জীমূতবাহন। শুধু একটু শান্তি চান—অখণ্ড শান্তিতে তিনি নিজের সাধনায় মগ্ন থাকতে চান!

যে ঈশিতার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল আর এই ঈশিতা কি এক? বিয়ের পর সেই মধুর দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যাচ্ছে জীমূতবাহনের। স্বামীকে নিয়ে হৈ হৈ করবার, নিজের দলে টানবার জন্যে ঈশিতার কী উৎসাহ!

স্বামীর কোলে মাথা রেখে মুখ ভার করে ঈশিতা বলেছে, "গুরুদেবের কাছে আমার মুখ দেখাবার উপায় রইল না। আমাকে দেখেই বললেন, একা কেন? বরকে নিয়ে আসতে পারলি না?"

"তুমি কী উত্তর দিলে?" জীমূতবাহন জিগ্যেস করলেন।

"তোমার জন্যে এক কাঁড়ি মিথ্যে কথা বলতে হলো।"

প্রিটোরিয়া স্ট্রীটের জগদানন্দ বসুর বাড়িতে তিনি যে জামাই হয়ে প্রবেশ করতে পারবেন, জীমূতবাহনের কাছে এটাই একটা আশ্চর্য ঘটনা।

ব্যারিস্টার জগদানন্দ বসুর কন্যারা তখন কলকাতার সম্ভ্রান্ত মহলে আলোচনার বস্তু। বেথুনের বসু-বালিকারা তখন সর্বগুণান্বিতা বলে স্বীকৃত। এরা গান গায়, আসরে রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যে অংশগ্রহণ করতে এদের সঙ্কোচ নেই। এরা ঝুড়ি ঝুড়ি গয়না আর জমকালো কাজ-করা শাড়ি পরে লোকের চোখ ধাঁধায় না; অথচ এদের কথাবার্তা, চালচলন, বেশভূষায় রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। সত্যি কথা বলতে কি, বসু-বালিকারা যা পরেন, সেইটাই আধুনিক ফ্যাশান হয়ে যায়।

কী করে এই পরিবারের সঙ্গে যুক্ত হবার সৌভাগ্য অর্জন করলেন জীমূতবাহন? সেইসব স্মৃতি রোমন্থনের সময় পাওয়া যাবে অনেক। এখন কেবল ঈশিতার সেই অভিমানের দিনটির কথা মনে পড়ছে। তখনও বোধ হয় সম্পূর্ণ আশা ছেড়ে দেয়নি ঈশিতা। ভেবেছিল, স্বামীর জড়তা কাটিয়ে

তাকে সামাজিক জীব করে তুলতে পারবে সে।

তাই আনন্দে বিগলিত হয়ে ঈশিতা বলেছিল, "তোমার সাবজেক্টেও আমাকে একটু পড়িয়ে-শুনিয়ে নিও তো।"

বেশ অবাক হয়ে গিয়েছিলেন জীমূতবাহন। প্রশ্ন করেছিলেন, "কেন বলো তো?"

"গুরুদেবের কাছে বেশ লজ্জা পেয়ে গেলাম। উনি গান গাইতে বললেন। গান গাইলাম। একথা সেকথার পর বললেন, 'তোর বর কী করে?' বললাম, কেমেস্ট্রি এবং পোকামাকড়ের জীবন-বৃত্তান্ত দুটো নিয়েই মত্ত হয়ে থাকে।

"কবিগুরু শুনে বেজায় খুশী। বললেন, 'এটা একটা অদ্ভুত বিষয়। এ নিয়ে আমাদের দেশে অনেক কাজ করবার আছে।' তারপর বললেন, 'তোর তাহলে খুব মজা। কত পোকামাকড়ের ঘরের কথা জানতে পারছিস।'

"আমি বললাম, 'পৃথিবীতে এতো সুন্দর জিনিস থাকতে পোকামাকড় নিয়ে মাথা ঘামাতে যাবো কেন?'

"কবিগুরু রসিকতা করে বললেন, 'তোর সাধারণ জ্ঞান পরীক্ষা করে দেখি। আমার বন্ধু রায়মশাইয়ের বই পড়ে এই সব শিখেছি। বল দেখি ঝিল্লীপক্ষ পতঙ্গ বলতে কাদের বোঝায়?'

"চুপ করে ছিলাম আমি। কবিগুরু বললেন, 'পারলি না তো—বোলতা, ভীমরুল, কুমার-পোকা এগুলো হলো ঝিল্লীপক্ষ পতঙ্গ। আর গোবরে পোকা, উকুন, ঘুণ এরা হলো কঠিনপক্ষ পতঙ্গ। এদের চারটে ডানা থাকে—উপরকার ডানা দু'খানা হাড়ের মতো শক্ত।'

"গুরুদেবের কাছে হেরে চলে এসেছি। ভাবছি পতঙ্গবিদের পত্নী যখন হয়েছি তখন এ-সব জেনে রাখবো।" ঈশিতার কথাগুলো জীমূতবাহনের বেশ মনে আছে।

আর মনে আছে সহপাঠীদের কথা। বিয়ের নেমন্তন্ন খেতে এসে তারা বলেছিল, "এতোদিন জে বি সেন ছিলিস, এবার আই বি সেন হবি।"

জীমূতবাহন ঠিক বুঝতে না পেরে ব্যাখ্যা চেয়েছিলেন। তারা বলেছিল,

"জীমূতবাহন এবার ঈশিতাবাহন হবে!"

ইঙ্গিতটা মোটেই ভাল লাগেনি জীমূতবাহনের। তিনি যদি কারও সেবক হন সে বিজ্ঞানের। বড় জোর বি বি সেন অর্থাৎ বিজ্ঞানবাহন সেন হবেন, কোনোদিন আই বি সেন হচ্ছেন না তিনি।

এ-সব পুরনো কথা জীমূতবাহন আজ রাত্রে শুধু শুধু কেন ভাবছেন, তিনি নিজেই বুঝতে পারছেন না। এখন একটু ঘুমোলে শরীরটা হাল্কা হতো। কিন্তু বোধ হয় ঘুম আসবে না। কারণ অমিতাভর কথাও আবার মনে পড়ছে। সে-বেচারা নিশ্চয় এতক্ষণে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। ছেলেটিকে বেশ পছন্দ হয়েছে তাঁর। এখন প্রশ্ন, রাখতে পারবেন তো?

জীমূতবাহনের বয়স হচ্ছে। যে প্রতিষ্ঠান তিনি নিজের রক্ত দিয়ে তিলে তিলে গড়ে তুলছেন, সেখানকার সাধনার ধারা অব্যাহত রাখার জন্যে মানুষ চাই। অমিতাভর কাছে তাঁর অনেক প্রত্যাশা।

"নমস্কার", কটেজের ড্রইং রুমে একটা ইজিচেয়ারে আধ-শোয়া অবস্থায় দূর থেকে ইন্দুমতীকে দেখেই অমিতাভ প্রভাতের শুভেচ্ছাটা ছুঁড়ে দিল।

গায়ে একটা হাল্কা চাদর জড়িয়ে ইন্দুমতী অমিতাভর ঘরে ঢুকে পড়ল। নমস্কার জানিয়ে বলল, "রাত্রে ঘুম হয়েছিল তো!"

"ঘুম ভালই হয়েছিল। দু'দিন রেলযাত্রার শোধ এক রাতেই তুলে নিয়েছি।" অমিতাভ হাসতে হাসতে বললে।

ইন্দুমতী একটু আশ্বস্ত হলো। "তাও ভাল। আমার ভয় হচ্ছিল মাস্টারমশাই হয়তো বহুরাত পর্যন্ত আপনাকে জাগিয়ে রাখবেন। ল্যাবরেটরি এবং গবেষণা সম্বন্ধে কথা বলতে আরম্ভ করলে ওঁর কোনো খেয়ালই থাকে না।"

"তাই নাকি?" অমিতাভ জিগ্যেস করলে।

একটা চেয়ারে বসে পড়ে ইন্দুমতী বললে, "সেবার টোকিও থেকে প্রফেসর মিচিকানা যখন এলেন, দুই বন্ধুতে খাওয়া-দাওয়ার পর একদিন আলোচনা করতে বসলেন। তারপর কখন যে রাত কেটে গেছে দু'জনের কেউ খেয়াল করেননি। সকালবেলায় প্রফেসর মিচিকানার খবর নিতে এসে দেখি খুব ঘুমোচ্ছেন—শুনলাম সাড়ে পাঁচটার সময় শুতে এসেছেন, তাও মাস্টারমশাই পৌঁছে দিয়ে গিয়েছেন।"

অমিতাভ হাসতে হাসতে বললে, "না, আমার সমস্ত রাত জাগবার সৌভাগ্য হয়নি।"

ইন্দুমতী বললে, "সেদিন মাস্টারমশাইকে খুব বকেছিলাম। মাস্টার-

মশাই স্বীকার করলেন, দুই বন্ধু মিলে সারারাত ধানের পোকা নিয়ে আলোচনা করেছেন। হিস্পা আর্মিজেরা, প্যাডি বাগ, চুঙ্গী পোকা, ভেঁপু পোকা আরও কত কী! ধানের শিষ কাটা লেদা পোকা অর্থাৎ সার্ফিস ইউনিপাংটাটা নিয়ে তর্ক করতে করতে দু'জনের মধ্যে কথা বন্ধ না হলে হয়তো আরও চলতো। আমরা তো রেগে গিয়ে শেষপর্যন্ত মিচিকানাকে প্যাডিকানা বলে ডাকতাম।"

"ধানকানা বলেননি এই যথেষ্ট," বলে অমিতাভ হাসতে লাগল।

ইন্দুমতী বললে, "সকালে আর একবার খোঁজ নিয়েছিলাম, তখনও আপনি দরজা খোলেননি।.মাস্টারমশাইয়ের কড়া হুকুম কেউ যেন আপনার ঘুমের ব্যাঘাত না করে। এখানকার লোকদের বদনাম আছে, মোরগ ডাকার আগেই তারা উঠে পড়ে।"

"তাই নাকি? তাহলে তো বিপদের কথা! আমি একটি লেট লতিফ!" ইন্দুমতীর দিকে চেয়ার এগিয়ে দিয়ে অমিতাভ বলে।

ইন্দুমতী হেসে বললে, "আপনার সঙ্গদোষে মাস্টারমশাইয়ের যদি কিছু অধঃপতন হয়, তাহলে আমরা অনেকেই খুশী হই। উনি ভোর চারটের সময় উঠে পড়ে ল্যাবরেটরিতে ঢোকেন। ল্যাবরেটরি ইনসেক্টদের স্টাডি করবার ওইটাই নাকি প্রশস্ত সময়!"

অমিতাভর যে চা খেতে ইচ্ছে করছিল, তা ইন্দুমতী তার মুখের ভাব দেখেই বুঝে নিল। ইন্দুমতী জানালে, "হরিমোহনকে বলে এসেছি, আপনার এবং আমার চা সে এখানে নিয়ে আসছে।"

হরিমোহন চা এনে হাজির করলো। ইন্দুমতী নিজেই চা তৈরি করতে শুরু করলে। চা ঢালতে ঢালতে বললে, "একটা জিনিস বলা হয়নি আপনাকে, মশারি টাঙাতে ভুলবেন না। পোকামাকড়ের আড়তে বসে আছেন। মাস্টারমশাইয়ের ল্যাবরেটরিতেও কয়েক হাজার মশা বংশবৃদ্ধি করছে। দু-চারটে যে সেখান থেকে বেরিয়ে ঘরে ঢুকবে না, এ-কথা গ্যারান্টি দেওয়া যায় না।"

ইন্দুমতী নামটা অমিতাভর একটু সেকেলে সেকেলে ঠেকেছিল। পরিচয়টাও জানবার আগ্রহ হচ্ছিল না এমন নয়। কিন্তু ইন্দুমতী নিজেই

এবার যা প্রকাশ করলে তার জন্যে অমিতাভ প্রস্তুত ছিল না।

ইন্দুমতী বললে, "আমার পুরো নামটা আপনাকে বলে রাখা ভাল—ইন্দুমতী দেশাই, আমার দেশ গুজরাটে।"

বিস্মিত অমিতাভ বললে, "আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দিন। এমন সুন্দর বাংলা শিখলেন কেমন করে?"

হেসে উঠলো ইন্দুমতী। "আমার বাংলার একটা সার্টিফিকেট পাওয়া গেল। বাবা বলেন, আমার বাংলায় যথেষ্ট দোষ আছে। ছোটবেলায় তিনি শান্তিনিকেতনে পড়েছিলেন; ওঁর কথা শুনলে বোঝা মুশকিল যে তিনি বাঙালী নন।"

অমিতাভ বেশ কৌতূহলী হয়ে উঠলো। ইন্দুমতী বললে, "আমার বাবা অম্বালাল দেশাই মাস্টারমশাইয়ের বিশেষ বন্ধু। ভক্তও বটেন। সংসারের চাপে পারিবারিক ব্যবসা নিয়েই তিনি ব্যস্ত থাকেন। ইটালিয়ান কোলাবরেশনে একটা ওষুধের কারখানা খুলেছেন আমেদাবাদে। কিন্তু রিসার্চে খুব ঝোঁক।"

অমিতাভ চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে ইন্দুমতীর কথা শুনতে লাগল। "আমেরিকায় মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে আমার বাবার প্রথম আলাপ। তখন আমার পাঁচ বছর বয়েস। তারপর এই এতোদিন ধরে দু'জনের বন্ধুত্ব প্রগাঢ় হয়েছে। এই যে বিদেশী সহযোগিতায় নতুন কারখানা হয়েছে, যোগাযোগটা মাস্টারমশাই করিয়ে দিয়েছিলেন। ওঁর দুটো পেটেন্ট থাকায় কেমিক্যাল এবং ফার্মাসিউটিক্যাল মহলে বেশ জানাশোনা।"

অমিতাভ অভিযোগ করল, "আপনি কিন্তু চা খাচ্ছেন না, মিস দেশাই।"

ইন্দুমতী বললে, "বাড়িতে আমরা চা খাই না। যা বলছিলাম, বাবা মাস্টারমশাইকে ডিরেক্টর বোর্ডে যোগ দিতে বলেছিলেন। মাস্টারমশাই রাজী হলেন না। বড় খেয়ালি লোক। যখনই দরকার হয়, বাবা অবশ্য চলে আসেন। উপদেশ নিয়ে যান।"

অবাক হয়ে অমিতাভ শুনছিল। ইন্দুমতী বললে, "আমি যে বিজ্ঞান পড়ছি, তাও মাস্টারমশাইয়ের আগ্রহে। বোম্বাই ইউনিভার্সিটি থেকে এম এস-সি পাস করেছি। তারপর ডি-ফিল-এর জন্যে তৈরি হচ্ছি। ওখানে

নামটা রেজেস্ট্রি করা আছে—আমার আসল রিসার্চ গাইড মাস্টারমশাই। যখন খুশি চলে আসি। কোনো প্রবলেম হলেই মাস্টারমশাইকে জ্বালাতন করি।"

"তার মানে আপনি এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা নন?" অমিতাভ প্রশ্ন করে।

"অস্থায়ী বাসিন্দা বলতে পারেন। বাবার মতে নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরি তো শুধু একটা গবেষণাগার নয়—এটা একটা আশ্রমের মতো। একদিন এই ল্যাবরেটরিকে কেন্দ্র করেই হয়তো বিশ্বভারতীর মতো আর একটা বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠবে, যেখানে ন্যাচারাল সায়েন্সের চর্চা হবে। দেশবিদেশের ছাত্রছাত্রীরা উচ্চতর গবেষণার জন্যে নিবেদিতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসবেন।"

"নিবেদিতা কে আপনি জানেন?"

"জানি না মানে? বাবা এবং মাস্টারমশাই এঁরা দু'জনেই নিবেদিতার বিশেষ ভক্ত। মাস্টারমশাই তো বলেন, আমরা এই বিদেশিনীকে বুঝে উঠতে পারিনি; তার দানের কণামাত্র পরিশোধের চেষ্টা করেনি ভারতবর্ষ। আমাদের বাড়িতে ওঁর লেখা সব বই আছে। আর ওঁর বাগবাজারের বাসায় এবং নিবেদিতা গার্লস স্কুলেও গিয়েছি আমি। মাস্টারমশাই বলেন, ভারতবর্ষের বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাস যেদিন লেখা হবে সেদিন নিবেদিতা সম্বন্ধে আরও অনেক কিছু প্রকাশিত হবে। আচার্য জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান-সাধনার সাফল্যের পিছনেও নিবেদিতার দান কম নয়। এক সময় তাঁর প্রতিটি ইংরেজি লেখা নিবেদিতা দেখে দিয়েছেন; বিলেতের বৈজ্ঞানিক মহলে তাঁর প্রাথমিক পরিচিতির ব্যবস্থা সিস্টার নিবেদিতাই করেছিলেন।"

ঘড়ির দিকে তাকালে ইন্দুমতী। "মাস্টারমশাই কয়েকটা কাজ দিয়েছেন, সেগুলো যাবার আগে করে দিয়ে যাবো।"

"কবে যাচ্ছেন?" অমিতাভ প্রশ্ন করে।

"এক সপ্তাহের মধ্যেই। আমার বড় কষ্ট হয় মাস্টারমশাইয়ের জন্যে। কত বাজে কাজ যে ওঁকে নিজে হাতে করতে হয়। যে ক'দিন থাকি ওঁকে সাহায্য করি।"

"নিজে হাতে করতে হয় ?" আমিতাভ প্রশ্ন করে।

অমিতাভর কাপে আর একটু চা ঢেলে দিয়ে ইন্দুমতী বললে, "কী করবেন বলুন ? লোকজন নেই। বেশী লোকজন রাখতে হলে অনেক টাকা দরকার। সে-টাকা মাস্টারমশাই পাবেন কোথায় ? কয়েকজন ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যাণ্ট না রাখলেই নয়—তাদের মাইনে আছে। টাকা বাঁচাবার জন্যে চিঠিপত্তর টাইপ করার কাজ উনি নিজেই করেন। আমি এলে যতটা পারি সাহায্য করি। ওঁর রিসার্চের পেপারগুলো টাইপ করতে আমার খুব ভাল লাগে। টাইপও হয়, আমার পড়াও হয়ে যায়। জীপ আছে, কিন্তু আলাদা ড্রাইভার নেই। আবার একটা এক্স-রে মেশিন আসছে। সেটা কে চালাবে জানি না।"

ইন্দুমতী মেয়েটি বেশ সরল ; কিন্তু অনেক খবর রাখে সে। নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরির ভিতরের সব খবর তার মুখস্থ। অসুবিধা অনেক আছে, কিন্তু এই ল্যাবরেটরির খ্যাতি একদিন যে দেশের সীমানা পেরিয়ে সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে, সে-সম্বন্ধে তার কোনো সন্দেহ নেই।

"যেখানে ইনসেক্ট নিয়ে কাজ হচ্ছে, সেখানে এক্স-রে মেশিন কী হবে ?" অমিতাভ জানতে চায়।

"নিশ্চয় দরকার আছে। মাস্টারমশাই আপনাকে নিশ্চয়ই সব বলবেন সময়মতো। আপনার ওপর অনেক ভরসা করে বসে আছেন।"

"আমার ওপর ?"

"বিলেত থেকে ফিরে এসে পর্যন্ত আপনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ তিনি। আপনাকে টেলিগ্রাম পাঠাবার পর মাস্টারমশাইয়ের কী উত্তেজনা! আমাকে পর্যন্ত রোজ জিগ্যেস করতেন, তোমার কী মনে হয় ইন্দুমতী ? অমিতাভ কি এখানে আসবে ?"

"আমাকে কতটুকু দেখেছেন মাস্টারমশাই ?" লজ্জা পেয়ে অমিতাভ প্রতিবাদ করে।

"তা জানি না, যাঁরা দেখতে জানেন, অল্প দেখাতেই কাজ হয়ে যায় তাঁদের।" ইন্দুমতী হাসতে হাসতে উত্তর দেয়।

আবার গম্ভীর হয়ে যায় ইন্দুমতী। "যখন দেখি মাস্টারমশাই বেলা

ছুটোর সময় নিজের খাবার কথা ভুলে পোকামাকড়দের খাওয়াচ্ছেন, যখন দেখি গভীর রাতে আরশোলাদের খাঁচাগুলোর টেমপারেচার কণ্ট্রোল করছেন, কিংবা উইপোকাদের ঢিবিটা ঢাকা দেবার জন্যে বৃষ্টির মধ্যে ওয়াটারপ্রুফ নিয়ে ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছেন, তখন বেশ দুঃখ হয়।"

"ডঃ সেন কি উইপোকাও পুষছেন?"

"শুধু উইপোকা? চলুন আজই দেখাবো আপনাকে। এ এক আজব চিড়িয়াখানা। এখানে কত রকমের জীবন্ত কীটপতঙ্গ আছে দেখলে সাধারণ লোক ভয় পেয়ে যাবে।"

ইন্দুমতীকে একটু অপেক্ষা করতে বলে অমিতাভ ভিতর থেকে জামা পাল্টে এল। ইন্দুমতী বললে, "চটি নয়, বুট পরে নিন। অমানান হলেও আমি বুট পরেছি। না হলে মাস্টারমশাই বকবেন।"

ল্যাবরেটরিটা বিরাট মনে হচ্ছে। দুনিয়ার অজস্র কীটপতঙ্গ সংগ্রহ করে সত্যিই এক আজব চিড়িয়াখানা তৈরি করেছেন জীমূতবাহন সেন।

সূর্য ওঠার আগেই ডক্টর সেন নিশ্চয় কাজে লেগে গিয়েছেন। কিন্তু তাঁকে কাছাকাছি কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

হাঁটতে হাঁটতে একটা কাঁচের জারের সামনে এসে ইন্দুমতী দাঁড়িয়ে পড়ল। জারের মধ্যে গোটাকয়েক পোকা রয়েছে। তাদের দেখতে দেখতে ইন্দুমতী বললে, "যদি কিছু মনে না করেন, একটু অপেক্ষা করবেন?"

অমিতাভ বললে, "নিশ্চয়। ভিজিটরের জন্যে কাজ আটকে থাকতে পারে না।"

ইন্দুমতী বললে, "এদের দায়িত্ব আমার ওপর আছে—একটু খোঁজখবর নিয়ে নিই। এক ধরনের গুবরে পোকা, এখানে নতুন এসেছে। নাগপুরে এদের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।"

অমিতাভ সরে গিয়ে পোকাগুলোর দিকে ভাল করে তাকাল। ইন্দুমতী বললে, "লেবুগাছের উইভিল পেস্ট।"

"সাইট্রাস প্ল্যান্টে এদেশে তেমন উইভিল হয় না শুনেছিলাম।" অমিতাভ প্রশ্ন করে।

ইন্দুমতী বললে, "বেশী হতে কতক্ষণ, মাস্টারমশাই বলছিলেন।"

ভাল করে লক্ষ্য করে অমিতাভ বললে, "এরা কি মিলোসেরাস ?"

খাতার দিকে নজর দিয়ে ইন্দুমতী বিস্ময়ের সঙ্গে জিগ্যেস করলে, "ধরলেন কী করে ? ভারতবর্ষে খুবই দুষ্প্রাপ্য স্পেসিমেন।"

অমিতাভ বললে, "এনটমোলজি জার্নালে এদের সম্বন্ধে লেখা পড়েছি। কী খাওয়াচ্ছেন এদের ?"

"মাস্টারমশাই আঙুরপাতা ছাড়া আর কিছু দিচ্ছেন না। কী পেটুক দেখুন না, একটা পোকা একখানা গোটা পাতা কয়েক ঘণ্টার মধ্যে খেয়ে ফেলেছে।"

"ল্যাবরেটরিতেই যখন এত খিদে রয়েছে, গাছে এরা কী ভয়াবহ ক্ষতি করতে পারে বুঝুন।" অমিতাভ বললে।

"আপেল গাছে, আঙুরলতায়, লেবু গাছে বিষাক্ত কীটনাশক বেশী ছড়ানোর পক্ষপাতী নন মাস্টারমশাই। অজ্ঞাতে এই সব ফল দিনের পর দিন খেয়ে মানুষ হয়তো তার সমূহ ক্ষতি করছে।" ইন্দুমতী বললে।

"উনি কি মিলোসেরাসের প্রাকৃতিক শত্রুর সন্ধান করছেন ?"

"রীতিমতো। ওঁর ধারণা এখন থেকে প্যারাসাইট খুঁজে রাখা ভাল। হঠাৎ হয়তো উইভিলদের এমন বংশবৃদ্ধি শুরু হবে যে, সাইট্রাস গাছগুলোকে বাঁচানো কঠিন হবে।"

ইন্দুমতী এবার অমিতাভর অনুমতি নিয়ে তার ল্যাবরেটরি রিপোর্ট লিখতে শুরু করলো। আর অমিতাভ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলো মাস্টারমশাইয়ের প্যারাসাইট সন্ধানের কথা।

প্যারাসাইট—পরজীবী! প্রকৃতির রাজ্যে এই পরাশ্রিত কীট-পতঙ্গরা না থাকলে মানুষের কী সর্বনাশই হতো! আত্মীয়-নিধনকারী এই বিভীষণদের জন্যেই আজও পৃথিবীতে পতঙ্গের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কত পতঙ্গ তো অন্য পতঙ্গ, তাদের শূককীট এবং ডিম খেয়ে ক্ষুধা নিবৃত্তি করছে। কিন্তু আশ্চর্য এই পরজীবীরা, যারা বিনা অনুমতিতেই অন্য জীবের দেহে বাসা বাঁধে। গর্ভিণী পতঙ্গ পোষকের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়, তারপর প্রথম সুযোগেই তার দেহে প্রসবকার্য সম্পন্ন করে পালিয়ে যায়। ক্ষুধার্ত কীটের দল পোষকের রক্ত-মাংসে বড় হয়ে ওঠে এবং তার মৃত্যুর কারণ হয়।

পরজীবীদের জীবনবৃত্তান্ত নিয়ে দেশ-বিদেশের গবেষণাগারে কত অনুসন্ধান চলেছে—ডঃ সেনের কত প্রবন্ধই তো অমিতাভ গভীর আগ্রহের সঙ্গে পড়েছে। এমন পরজীবী পতঙ্গ আছে যা কেবল একটি পোষক ছাড়া অন্য কোথাও আশ্রয় নেবে না। আবার এমন পতঙ্গ আছে যে পোষক সম্বন্ধে তত খুঁতখুঁতে নয়—দশ বার রকম পোষকের যে কোনো একটি হলেই হলো। এই পলিফেগাস প্যারাসাইটদের সম্বন্ধে ডঃ সেনের একটি প্রবন্ধ কিছুদিন আগে বৈজ্ঞানিক মহলে বেশ আলোড়ন তুলেছিল।

টেকিনিড মাছি সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ ছিল সেখানে। মথ এবং প্রজাপতির শূককীটের ওপর এরা ডিম পেড়ে দেয়—ডিমগুলো আঠার মতো গায়ে লেগে থাকে। তারপর ডিম ফুটে টেকিনিড মাছির শূককীট পোষকের মাংস খেতে শুরু করে।

এই মাছিরই জ্ঞাতিভাই লাইডেলা স্টেবুলাঁ, ইউরোপীয়ান কর্ণবোরার নামে এক সর্বনাশা পোকার যম। গর্ভবতী এই মাছি হাজারখানেক শূককীট কর্ণবোরারের গর্তের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে আসে। ক্ষুধার্ত ম্যাগটগুলো এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে কর্ণবোরারের দেহে আশ্রয় নেয়। মৃত্যুর ছায়া ঘনিয়ে আসতে তখন বিলম্ব হয় না—বড় জোর পনেরো-ষোলো দিন। পোষকের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ম্যাগটও সাবালক হয়ে ওঠে এবং লাইডেলা স্টেবুলাঁয় রূপান্তরিত হয়ে আকাশে উড়তে আরম্ভ করে।

পোকার পিছনে এইরকম প্যারাসাইট লেলিয়ে দিয়ে ধ্বংস করার চেষ্টা চলেছে দেশে দেশে। বায়োলজিক্যাল কণ্ট্রোলের এই সাধনায় জীমূত-বাহন আত্মনিয়োগ করেছেন।

ইন্দুমতীর কাজ শেষ হয়েছে। অমিতাভকে সে বললে, "অবাক হয়ে দেখছেন কী? এখন থেকে প্রতিদিন এই সব কীটপতঙ্গের সঙ্গে পরিচয় হবে আপনার।"

অমিতাভ প্রতিবাদ করবে ভেবেছিল। ইন্দুমতীর জানা উচিত, ডারহামের ডি-ফিল অমিতাভ মিত্র কেবল জীমূতবাহন সেনের নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরি দেখতে এসেছে। এখানে সে যোগ দেবে কিনা সে-সম্বন্ধে এখনও কিছুই ঠিক হয়নি। অথচ কেমন দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে ইন্দুমতী বললে,

অমিতাভর সঙ্গে জীমূতবাহনের আশ্রিত ও লালিতপালিত পতঙ্গদের প্রতিদিনের পরিচয় হবে। তবু অমিতাভ কিছুই বলতে পারলে না। ইন্দুমতীর কথাই সাময়িকভাবে বিনা প্রতিবাদে তাকে স্বীকার করে নিতে হলো।

অগত্যা পতঙ্গ প্রসঙ্গ আবার উত্থাপিত হলো। অমিতাভ বললে, "আমি অন্য কথা ভাবছি। কত ধরনের পোকা এখন নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরিতে বসবাস করছে?"

খোঁপার ভারে বিব্রত ইন্দুমতী ফুলের মালা থেকে একটা বোলতা তাড়াতে তাড়াতে বললে, "তা কয়েক হাজার রকম তো বটেই। কখন কোন্‌টা দরকার হবে তার ঠিক নেই। মাস্টারমশাইয়ের মিউজিয়ামে যাদের মৃতদেহ সংগ্রহ করা আছে তার সংখ্যা অন্তত পঞ্চাশ হাজার।"

"আর এদের তত্ত্বাবধান উনি একা করে চলেছেন? আশ্চর্যই বটে!" অমিতাভ তার বিস্ময় চেপে রাখতে পারলে না।

মাস্টারমশাই কোথায়?

ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট গঙ্গাধর লোলেকার সামনেই দাঁড়িয়েছিল। সে বললে—তিনি কাজ শেষ করে পুকুরধারে গিয়েছেন।

ওরা দু'জনে ল্যাবরেটরি থেকে বেরিয়ে খোলা জায়গায় এসে দাঁড়াল। দেড়শো বিঘে জমি যে কতটা তা রাত্রে বোঝা যায়নি। একটু লম্বাটে হওয়ায় জমির যেন শেষ নেই। আর কত রকমের চাষই যে সেখানে হয়েছে।

কিন্তু এক ধরনের চারা কোথায়ও বেশী নেই। ইন্দুমতী বললে, "ছোট ছোট প্লটে চাষ করায় বিশ্বাস করেন মাস্টারমশাই—এঁরা তো খুব বড় হতে পারবে না। এখানে পতঙ্গদের ছেড়ে দেওয়া হবে। নিবেদিতা ল্যাবরেটরির গিনিপিগ তো এরাই। প্রত্যেকটা প্লটের নম্বর আছে, নম্বর অনুযায়ী খাতায় সব বিবরণ লেখা থাকে।"

দূরে একটা পুকুর রয়েছে। অবশেষে সেইখানেই জীমূতবাহনকে আবিষ্কার করা গেল। পুকুরধারে একটা ইটের ওপর থুতনিতে হাত দিয়ে পাথরের মতো নিশ্চল হয়ে বসে রয়েছেন। কাছাকাছি গিয়ে অমিতাভ ফিরে

যেতে চাইল। বলা যায় না, হয়তো কোনো গভীর চিন্তায় ডুবে রয়েছেন জীমূতবাহন। শুধু শুধু তাঁকে বিরক্ত করাটা ঠিক হবে না।

ইন্দুমতী বললে, "না না, উনি মোটেই বিরক্ত বোধ করবেন না। বরং আপনাকে দেখলে খুশীই হবেন। তাছাড়া আমার নিজেরও দরকার রয়েছে ওঁর সঙ্গে।"

মাস্টারমশাই এবার তাজ্জব কাণ্ড করে বসলেন। জামাকাপড় পরা অবস্থায় জলে নেমে পড়লেন। হঠাৎ কী হলো? কিছু পড়ে গেল নাকি? জলের মধ্যে মাস্টারমশাই কী যেন খুঁজছেন? আরও খানিকটা এগিয়ে গিয়ে কয়েকটা লতার পাতা পটাপট ছিঁড়ে নিলেন। সাঁতার কেটে এবার পাড়ে উঠে এলেন জীমূতবাহন। ভিজে ছপ ছপ করছে সমস্ত জামাকাপড়।

ইন্দুমতী ব্যস্ত হয়ে বললে, "তোয়ালে আনেননি?" জীমূতবাহন লজ্জায় পড়ে গেলেন। "না, আনা হয়নি। তবে জলের দেশের ছেলে আমি—ভেজা অভ্যাস আছে।"

ইন্দুমতী বললে, "না স্যর, এটা আপনার খুব অন্যায়। আমি এখনই তোয়ালে নিয়ে আসছি।" সময় নষ্ট না করে সে এবার দ্রুত তোয়ালে আনতে ছুটলো।

অমিতাভ অবাক হয়ে একলা দাঁড়িয়ে রইল। জীমূতবাহন ততক্ষণে পরম যত্নে কয়েকটা কাঁচের জারের মধ্যে পাতাগুলো আলাদা আলাদা পুরতে লাগলেন।

"পানিফলের পাতা নয়?" অমিতাভ প্রশ্ন করে।

"হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছো তুমি। জলের পোকামাকড়ও আমাদের কম ক্ষতি করে না। পানিফল অনেক চাষীর লাভের ব্যবসা। কিন্তু সেখানেও পোকারা ডাঁটাগুলো ছিঁড়ে ফেলছে। পুসা ইনস্টিটিউটে জলের কয়েকটা পোকা ওরা আবিষ্কার করেছে। অনেক কষ্টে কয়েকটা নমুনা আনিয়েছি। কয়েকদিন আগে ওদের এখানে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তাই খবর নিতে এসেছিলাম।"

অমিতাভ বললে, "জামাটা ছেড়ে ফেললে পারতেন।"

জীমূতবাহন বললেন, "দেখবে? এই উইভিলগুলোর নাম বেগাস ট্রেপি।"

অমিতাভ বললে, "আপনি অন্তত: জলটা নিংড়ে ফেলে দিন।"

জীমূতবাহন বললেন, "পোকাগুলোর কোনো প্যারাসাইট আছে। যদি খোঁজখবর নিয়ে তাদের আবিষ্কার করা যায় এবং এই পোকাগুলোর পিছনে লাগিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে পানিফলগুলো বেঁচে যাবে।"

"জলের ধারের পোকা। সুতরাং প্যারাসাইট খুঁজে পাওয়া সম্ভব হলেও হতে পারে।" অমিতাভ তার মতামত দিল।

জীমূতবাহন বললেন, "তা হলে পানিফলের দাম কমে যাবে। লোকে খেয়ে বাঁচবে। ছোটবেলায় পানিফলের গুঁড়ো দিয়ে মা একরকম জিলিপি করে দিতেন, এখনও যেন মুখে লেগে রয়েছে।"

ইন্দুমতীকে দূর থেকে তোয়ালে নিয়ে আসতে দেখা গেল। জীমূতবাহন বললেন, "ওহো, ইন্দু কবে যাবে জিগ্যেস করা হয়নি।"

ইন্দুর হাত থেকে তোয়ালে নিয়ে গা মুছতে মুছতে জীমূতবাহন বললেন, "তুমি যে এখানকার লোক নও, এটা কিছুতেই মনে থাকে না। তুমি কবে যাচ্ছো ইন্দু?"

ইন্দু বললে, "আপনাকে তো বলেছিলাম। সাতদিন আরও আছি।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম। তোমার টিকিট কাটার কী ব্যবস্থা হলো?"

"আমি তো মাস্টারমশাই আগেই রিজার্ভেশান করে রেখেছি।"

"বেশ ভাল, ইন্দু। আবার কবে আসবে?"

"থিসিসটা জমা দিয়ে এবার আসবো। হাতে লম্বা সময় থাকবে, আপনার সঙ্গে নতুন কিছু নিয়ে আলোচনা চালানো যাবে।"

"নিশ্চয়। তবে আমরা তো সেকেলে হতে চলেছি।" অমিতাভকে দেখিয়ে জীমূতবাহন বললেন, "এরা নতুন যুগের বৈজ্ঞানিক। আনকোরা বিদেশ থেকে নতুন জ্ঞান নিয়ে এসেছে।"

প্রতিবাদ না করে পারলো না অমিতাভ। "বিদেশে কি এর থেকে বেশী কিছু শেখা যায়?"

ইন্দুমতী বললে, "আমি ডক্টর মিত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত।"

ঘুরে ঘুরে দেখতে কখন যে সকাল গড়িয়ে দুপুর নেমেছে তা তিন জনের

কারুর খেয়াল হয়নি। ল্যাবরেটরির পোকাদের সঙ্গে অমিতাভর পরিচয়পর্ব শেষ করিয়ে জীমূতবাহন এবার ক্ষেতের দিকে যাবার প্রস্তাব করলেন।

একটা চুরুট ধরিয়ে জীমূতবাহন বললেন, "কী বলো ইন্দু, টমাটো বাগানের দিকে যাওয়া যাক একবার। অমিতাভর নিশ্চয় খুব ভাল লাগবে। টমাটোর ওই বিশ্রী পোকাগুলো—হেলিওথিস অবসোলিটা—কেমন জব্দ হয়ে গিয়েছে।"

অমিতাভর দিকে তাকিয়ে জীমূতবাহন বললেন, "ইন্দু অবশ্য এর পিছনে খুব খেটেছে। তুমি হয়তো বলবে, হেলিওথিস অবসোলিটা আর ক'টা টমাটোর ক্ষতি করবে? কিন্তু যে কথা ইন্দুকে আমি বার বার বলি, ছোলার কথাটা ভুলে যেও না। আমাদের দেশের কত লোক ছোলা খেয়ে বাঁচে! কলেজে পড়বার সময় আমরা মোহনবাগানের খেলা দেখতে যেতাম, পথে ছোলাভাজা কেনা হতো। অর্ধেক ছোলায় পোকা। ভুনাওয়ালাকে বকাবকি করতাম—কিন্তু এখন বুঝি সে বেচারা কী করবে? পোকা জব্দ করা তো তার কাজ নয়।"

টমাটো গাছ দেখিয়ে, জীমূতবাহন বললেন, "বিলিতী বেগুন যখন দেখলে তখন দেশী বেগুন কী দোষ করলে। বেগুনের স্টেমবোরার—ইউসোফেরা পার্টিসেলাও রয়েছে পাশেই। প্রফেসর মিচিকানাকে কয়েকটা উপহার দিতে চেয়েছিলাম—কিন্তু যা লোক, ধান নিয়েই পাগল হয়ে আছেন। অন্য কোনোদিকে নজর নেই।"

বেগুন-বাগানে একবার হাজির হলে কত সময় লাগতো ঠিক নেই। কিন্তু অমিতাভর কথা চিন্তা করেই ইন্দুমতী বাধা দিলে। বললে, "মাস্টার-মশাই, পৌনে দুটো বাজে।"

জীমূতবাহন বললেন, "তাইতো, খেয়াল হয়নি! তোমাদের বোধহয় আমার সঙ্গে খেতে বলেছি, তাই না?"

হেসে ফেললে ইন্দুমতী। "বোধ হয় কি মাস্টারমশাই? বার বার করে বললেন, ইন্দু দুপুরে আজ আমার ওখানে খাবে।"

মাস্টারমশাই একটু বিব্রত হয়ে পড়লেন। "অমিতাভ আমার সঙ্গে খাবে, সে হরিমোহন জানে। তোমারটা বলেছি কিনা মনে করতে পারছি

না। চলো সঙ্গে, যা হয় একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।"

মাস্টারমশাইয়ের অসহায় অবস্থা দেখে ইন্দুমতী ব্যাপারটা এবার প্রকাশ করে ফেললে। "আপনি মাস্টারমশাই হরিমোহনকে বলেননি। সকালে আমি নিজে গিয়ে তাকে বলে এলাম।"

"তাই তো করবে মা। হরিমোহনটা কোনো কাজের নয়। কী আবার রেঁধেছে কে জানে, অমিতাভর কষ্ট হবে।" মাস্টারমশাই বিড়বিড় করতে লাগলেন। "ওকে রোজ বলি, আমার সঙ্গে সকালবেলায় রান্নার বিষয়টা আলোচনা করে নিবি।"

ইন্দুমতী বললে, "আপনি ভাববেন না, আজকের মেনু আমি নিজেই ঠিক করে দিয়ে এসেছি।"

জীমূতবাহন বললেন, "আই অ্যাম ভেরি স্যরি, অমিতাভ। তোমাকে স্নান করতে যাবার সময় পর্যন্ত দিইনি। আমি ভোরে স্নান করি, ইন্দুও তো দেখছি ভোরবেলায় কাজ গুছিয়ে ফেলেছে।"

অমিতাভ বললে, "আপনারা বাড়িতে গিয়ে বসুন। আমি দশ মিনিটে আপনাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছি।"

ইন্দুমতীকে নিয়ে জীমূতবাহন নিজের বাংলোয় এলেন। ইন্দুমতীর দুঃখ হলো মাস্টারমশাইকে দেখবার কেউ নেই। সকালে নিজে রান্নাঘরে এসে দেখে বেগুন এবং আলু ছাড়া আর কিছুই নেই হরিমোহনের ভাঁড়ারে।

ইন্দুমতী বললে, "অমিতাভবাবু যতদিন থাকবেন, একটু মাছ বা মাংসের ব্যবস্থা করা দরকার। আজকে আমি হরিমোহনকে দিয়ে আনিয়ে নিয়েছি।"

জীমূতবাহন বললেন, "তুমি তো নিরামিষাশী।"

"আমি নিরামিষাশী বলে অমিতাভবাবু বা আপনার তো চলবে না।" ইন্দুমতী জানায়।

জীমূতবাহন অসহায়ভাবে বললেন, "শাকসব্জী খেতে আমার খুব ভাল লাগে, অমিতকেও বলে দেবো'খন আমি, তুমি ভেবো না।"

জীমূতবাহনের জন্যে ইন্দুমতীর মনটা করুণার্দ্র হয়ে উঠলো। ভদ্রলোক

নিজের সাধনায় মগ্ন থাকবেন, না মাছমাংসের খবর নেবেন ?

ইন্দুমতী বললে, "মাস্টারমশাই, খাবার ব্যাপারে অমিতবাবুকে আপনি এখন কিছু বলবেন না। খাবার কষ্ট হলে মানুষের কাজে মন বসে না।"

জীমূতবাহন বললেন, "বেশ, তুমি যখন বলছো, ও সম্বন্ধে কোনো কথাই তুলবো না। সত্যিই তো, খাওয়ার কষ্টের জন্যে অমিতাভ যদি আমার ল্যাবরেটরি ছেড়ে চলে যায়, তাহলে দুঃখের শেষ থাকবে না।"

জীমূতবাহন এবার কী যেন ভাবতে শুরু করলেন। পাশেই যে ইন্দুমতী বসে রয়েছে খেয়াল নেই। ইন্দুমতী একটু পরে ডাকলো, "মাস্টারমশাই।"

জীমূতবাহন নড়েচড়ে বসলেন। "এ্যাঁ। কিছু বলছো আমায় ?"

সস্নেহে ইন্দুমতী জিগ্যেস করলে, "কী ভাবছেন মাস্টারমশাই ?"

"নাথিং পার্টিকুলার। তেমন কিছু নয়। কে বড় ? ব্রহ্মা না বিষ্ণু ?"

"মানে ?" ইন্দুমতী জিগ্যেস করলে।

মোটা চশমাটা খুলে জামার খুঁট দিয়ে মাস্টারমশাই চোখের কোণ দুটো মুছে নিলেন। বললেন, তৈরি করাটা শক্ত হতে পারে, কিন্তু তার থেকে হাজারগুণ শক্ত তাকে রক্ষা করা। এই তো কত সহজে নিবেদিতা ল্যাবরেটরির সৃষ্টি হলো। কিন্তু এর স্থিতি হবে কি ?"

"কেন হবে না মাস্টারমশাই ? নিশ্চয় হবে। আপনার এত পরিশ্রম কি ব্যর্থ হতে পারে ?" ইন্দুমতী আশ্বাস দেয়।

"তোমার বাবাও সেই কথা বলেন আমাকে। কিন্তু পৃথিবীতে কত লোক আমার থেকে বেশী পরিশ্রম করেছেন, কিন্তু স্থিতি হয়নি।"

মাস্টারমশাই জামার খুঁট দিয়ে আবার চোখ মুছতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ইন্দুমতীর বকুনি খেলেন। "আপনার রুমাল নেই মাস্টারমশাই ?"

"আছে বৈকি, নিশ্চয় আছে—চারটে পাঁচটা আছে। কিন্তু আমি তো নস্যি নিই না, তাই রুমাল ছাড়াই চলে যায়।"

"নস্যি আমিও নিই না মাস্টারমশাই, কিন্তু রুমালের দরকার হয়। আপনাকে অনেকদিন বলেছি, ওইভাবে চোখ মুছবেন না, সব সময় পোকা-মাকড় ঘাঁটছেন, কোনসময় ইনফেকশন হয়ে যাবে।"

মাস্টারমশাই বিনা প্রতিবাদে ইন্দুর কথা মেনে নিলেন। "জানো ইন্দু, একদিন আমাদের ল্যাবরেটরিতে ভাইরাস সম্বন্ধেও কাজ হবে। বায়োলজিক্যাল কণ্ট্রোলে ভাইরাস অসাধ্যসাধন করতে পারে। কানাডাতে অমিতাভ এই কাজ করবার সুযোগ পেয়েছিল। ভাইরাস এলে আমাকে অবশ্যই রুমাল রাখতে হবে!"

ইন্দুমতী আর কিছুই বললে না। মনে মনে ভাবলে, এই লোকের মাথায় বিজ্ঞানের এতো জটিল সমস্যার সমাধান হয় কী করে?

জীমূতবাহন বললেন, "ছেলেটির প্রতিভা আছে। ওর কথাবার্তা দেখে বুঝলাম, বিদেশে সময়টা নষ্ট করেনি, জানে অনেক কিছু। বোধহয় মনটাও সবুজ। কাজ করতে চায়। অমিতাভ যদি থেকে যায়, আমি আরও বাড়িয়ে ফেলবো রিসার্চ ল্যাবরেটরিকে।"

পায়ের শব্দ পাওয়া গেল এবার—অমিতাভ আসছে। জীমূতবাহন বললেন, "অমিতাভ, আজকে তোমার খাওয়ার অসুবিধে হবে। তবে আমি নিজে একদিন রেঁধে তোমাদের খাওয়াব।"

"আপনি রাঁধতে পারেন?" অমিতাভ জিগ্যেস করলে।

"পারি মানে? স্যর পি সি রায়কে প্রায়ই রেঁধে খাওয়াতাম। উনি আমার খিচুড়ির খুব প্রশংসা করতেন। প্রায়ই বলতেন, জীমূতের কোনো ভাবনা নেই। লেখাপড়ায় ভাল না করলে রান্না লাইনে উন্নতি করবে!"

খেতে খেতে জীমূতবাহন বললেন, "ভাগ্যে ইনসেক্ট ওয়ার্লডে রান্নার হাঙ্গামা নেই—তাহলে এতগুলো পোকামাকড়ের রান্নার ব্যবস্থা করতে করতেই পাগল হয়ে যেতাম।"

ইন্দুমতী বললে, "আমাদের মিউজিয়ামটা কেমন দেখলেন?"

অমিতাভ উত্তর দিলে, "ইন্টারেস্টিং। তবে সাজানোটা আরও বৈজ্ঞানিক-ভাবে করা যায়—এবং একটা কার্ড ইনডেক্স করতে পারি যদি, ভাল হয়।"

জীমূতবাহন উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। "ঠিক বলেছো, একটা ইনডেক্স দরকার। তুমি করো, আমি তোমার অ্যাসিস্ট্যান্ট হবো।"

ইন্দুমতী বললে, "ফিরে এসে আমিও আপনাদের দলে যোগ দেবো।"

জীমূতবাহন ইন্দুর হয়ে ওকালতি করলেন, "ওকে তুমি নিতে পারো

অমিত, ওর হাতের লেখাটা মুক্তোর মতো।"

এবার তিনজনেই একসঙ্গে হেসে উঠলো। অমিতাভ অবাক হয়ে গেল, গতকালও এমন সময় যারা পরস্পরের কাছে অপরিচিত ছিল, তারা এর মধ্যে এত কাছাকাছি আসতে পেরেছে। জীমূতবাহনের হাবভাব এবং সরল কথাবার্তা দেখে কে বলবে, ইনিই সেই বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক জে বি সেন, যিনি বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থার বিরাট চাকরি হেলাভরে প্রত্যাখ্যান করে এসেছেন!

খেতে খেতে জীমূতবাহন বললেন, "আর একটা দিকের কথাও অমিত ভেবে দেখো। ইনসেক্টরা আমাদের খাদ্যও হতে পারে—সেক্ষেত্রে এই দরিদ্র দেশের সাধারণ মানুষের খাবারে প্রোটিনের অভাব থাকবে না।"

অমিতাভ বললে, "ব্যাপারটা একেবারে উড়িয়ে দেবার মতো নয়—কারণ অতি সহজেই আমরা অসংখ্য ইনসেক্ট সৃষ্টি করতে পারি।"

জীমূতবাহন হাসতে হাসতে বললেন, "এ-ব্যাপারে আমরা অবশ্য ইন্দুমতীর কোনো সাহায্য পাবো না। ও মাছ মাংস ছোঁয় না।"

"ছুঁই, খাই না।" ইন্দুমতী প্রতিবাদ করলে।

"আমার মাও তাই করতেন। বিধবা মানুষ, আমার জন্যে মাছ রাঁধতেন, কিন্তু খেতেন না", জীমূতবাহন বললেন। তিনি যে আজ বেজায় খুশী তা তাঁর মুখের ভাব থেকেই ইন্দুমতী বুঝতে পারছে।

একটা সপ্তাহ যে কোথা দিয়ে কেটে গেল অমিতাভ নিজেই বুঝতে পারেনি। খেয়াল হলো, জীমূতবাহন যখন ইন্দুমতীকে জিগ্যেস করলেন, "আজ তাহলে তুমি যাচ্ছো?"

মাইক্রোস্কোপ থেকে মুখ তুলে ঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে ইন্দুমতী বললে, "হ্যাঁ মাস্টারমশাই।"

অমিতাভর মনে পড়লো, অন্ততঃ সাত-আটদিনের জন্যে নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরির আতিথ্য গ্রহণ করতে অনুরোধজানিয়ে চিঠি লিখেছিলেন জীমূতবাহন।

এই ক'দিন তার ভবিষ্যৎ নিয়ে সে প্রায়ই মনে মনে নিজের সঙ্গে তর্ক

করেছে। বাক্‌যুদ্ধ অনেক হয়েছে, এবার ভোটে তুলে সমস্যার সমাধান করা প্রয়োজন। কিন্তু তারও আগে প্রয়োজন ইন্দুমতীকে স্টেশনে তুলে দিয়ে আসা। এই দায়িত্বটা ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছেন মাস্টারমশাই।

ইন্দুমতী নিজেই স্টিয়ারিং ধরতে চেয়েছিল। "আমাকে দিন। এই গাড়িটা চালাতে আমি বেশ অভ্যস্ত।"

অমিতাভ বললে, "আমারও তো অভ্যস্ত হয়ে ওঠা প্রয়োজন। আপনি না হয় ড্রাইভ করে স্টেশন পর্যন্ত গিয়ে ট্রেনে উঠে বসলেন। ফেরার পথে আমার এবং গাড়িটার কী হবে?"

ইন্দুমতী বললে, "আত্মরক্ষার উৎকণ্ঠায় তখন ঠিক চলে আসতে পারবেন!"

গাড়িতে যেতে যেতেই ইন্দু বলেছিল, "আপনার নিজের সম্বন্ধে কিছু ঠিক করলেন নাকি?"

"না, এখনও শুধু দেখে যাচ্ছি, ঠিক করা হয়ে ওঠেনি কিছু।"

ইন্দু বললে, "শেষ পর্যন্ত যদি আপনি থেকে যান, নিবেদিতা ল্যাবরেটরির পক্ষে ভাল হবে। মাস্টারমশাই অনেক কিছু করতে চান। অনেক কিছু করবার মতো শক্তিও ওঁর আছে।"

"বিজ্ঞানের নতুন দিক নিয়ে তিনি যে সাধনা করছেন, সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই।"

"আপনি বলছেন?"

"জোর করেই বলছি—কারণ শুধু ইনসেকটিসাইড দিয়ে পোকা-মাকড়দের চিরদিন দাবিয়ে রাখা না-ও চলতে পারে। তাছাড়া আমাদের মতো গরীব দেশের পক্ষে পোকা দিয়ে পোকা ধ্বংস করতে পারলে অনেক অর্থের সাশ্রয় হবে। কেমিক্যাল কীটনাশক আপনাকে বার বার স্প্রে করতে হবে এবং প্রতি বছর তা চালিয়ে যেতে হবে। প্যারাসাইটরা একবার ছাড়া পেলে তারাও প্রকৃতির অংশ হয়ে যাবে এবং বহু বছর ধরে, হয়তো চিরদিনের জন্য, ফসলখেকো কীট-পতঙ্গদের পিছনে তারা রাহুর মতো লেগে থাকবে।"

ট্রেনে উঠে পড়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল ইন্দুমতী। তারপর একটু ইতস্ততঃ করে বললে, "আপনি ক'দিনের জন্যে এসেছেন। বলতে সঙ্কোচ

বোধ করছি।"

"সঙ্কোচের কী আছে? বলুন।"

"মাস্টারমশাইকে একটু দেখবেন। ওঁকে বড় অসহায় মনে হয়। নিজের কাজে পাগল হয়ে থাকেন, পোকামাকড়ের জগতের অনেক খবর রাখেন, কিন্তু মানুষের জটিলতার সঙ্গে ঠিক খাপ খাইয়ে উঠতে পারেন না।"

লোকটার ওপর অমিতাভর বেশ মায়া পড়ে যাচ্ছে। এই তো ক'দিন সে এখানে এসেছে। এরই মধ্যে সে যেন নিবেদিতা আশ্রমের একজন হয়ে উঠেছে।

অমিতাভ জানতে চাইলে, "ওর স্ত্রী এখানে থাকেন না কেন?"

ইন্দু বললে, "কী জানি!"

অমিতাভ বললে, "স্যরি, এরকম ব্যক্তিগত প্রশ্ন করাটা হয়তো আমার ঠিক হচ্ছে না।"

"কেন জিগ্যেস করবেন না? বেশ করবেন, জিগ্যেস করবেন। আমার মন বলে, আমাদের সবার উচিত মাস্টারমশাইকে সাহায্য করা। ঈশ্বর ওঁকে অনেক বড় কাজ করবার জন্যে তৈরি করেছেন। একদিন সমস্ত ভারতবর্ষ তাঁর জন্যে গর্ববোধ করবে।"

অমিতাভ বললে, "বিজ্ঞানের আবিষ্কারের কথা কেউ বলতে পারে না মিস্ দেশাই—আজ যেটা অসম্ভব মনে হচ্ছে, কাল দেখা যাবে সেইটাই সবচেয়ে সোজা কাজ!"

ইন্দুমতী বললে, "এখানে থাকলে টাকা আনা পাইয়ের মাপে আপনার কী হবে জানি না, কিন্তু এমন কাজের সুযোগ, এমনভাবে জানবার এবং শিখবার সুযোগ আর কোথাও পাবেন কিনা সন্দেহ।"

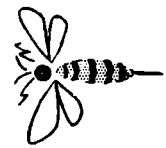

আজ বড়ো আনন্দের দিন। জীমূতবাহন সেন এখন খুশিতে ভরপুর। অমিতাভ নিজেই বলে গিয়েছে, নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরিতে থাকতে চায় সে। সুযোগ-সুবিধা, লোকবল, অর্থবল, যন্ত্রবল না থাকা সত্ত্বেও এই সামান্য গবেষণাগারে যে কাজ হচ্ছে, অমিতাভ তাতে বিস্মিত। কে জানে, সাফল্যের দেবতা বিজ্ঞানের জয়মাল্য নিয়ে একদিন হয়তো এই অখ্যাত নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরির দ্বারেই উপস্থিত হবেন।

"আর যদি না-ই বা আসেন, কী এসে যায়?" অমিতাভ ধীরকণ্ঠে জীমূতবাহনকে বলেছে।

পৃথীবীর কত বৈজ্ঞানিকই তো সমস্ত জীবন ধরে আলেয়ার পিছনে ঘুরেছেন। জীবনের কোনো ধনই ফেলা যায় না। তাঁদের ব্যর্থতার ভস্মরাশির ওপরই অনাগত যুগের কোনো নিবেদিতপ্রাণ ভারতসন্তান সাফল্যের জয়স্তম্ভ গড়ে তুলবেন।

অমিতাভর কথাগুলো চিন্তা করতে জীমূতবাহন খুব আনন্দ অনুভব করছেন। অমিতাভ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছে। জীমূতবাহন মনে প্রাণে চান তাঁরা দু'জনে অনেক কাজ করবেন। তারপর শিষ্যের কীর্তি একদিন যেন গুরুর কীর্তিকে পিছনে ফেলে রেখে বহুদূর এগিয়ে যায়। গুরু শিষ্যের নিকট পরাজয় ইচ্ছা করেন।

নিজেকে এবার একটু শাসন করবার চেষ্টা করলেন জীমূতবাহন। আনন্দটা তাঁর যেন একটু বেশী হচ্ছে।

আনন্দকে মুহূর্তে নিরানন্দে পরিবর্তন করবার এক অসাধারণ ক্ষমতা আছে জীমূতবাহনের। তা তিনি নিজেও জানেন। জীমূতবাহন ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিলেন। চোখের সামনে রাশি রাশি পতঙ্গ দেখতে

পাচ্ছেন। তিনি নিজেও যেন একটা পতঙ্গ। এবং তাঁর উল্লাসের কারণও এতক্ষণে খুঁজে পেয়েছেন। পূর্ণগর্ভা প্যারাসাইট পতঙ্গ এতক্ষণে একটা পোষকের সন্ধান পেয়েছে। তাঁর স্বপ্ন, যে-স্বপ্নের সর্বভুক শূককীটগুলো তাঁকে উত্ত্যক্ত করে সংসারের সব সুখ থেকে বঞ্চিত করছিল, তাদের লালন-পালনের জন্যে মনের মতো পোষকের সন্ধান পেয়েছেন শেষ পর্যন্ত।

চমকে উঠলেন জীমূতবাহন সেন। বোধ হয় একটু ঘুমিয়েই পড়েছিলেন তিনি। ঘরের আলোটা জ্বালা। দাঁড়িয়ে রয়েছে ঈশিতা। জীমূতবাহন সেনের স্ত্রীর আজ যে কলকাতা থেকে আসবার কথা ছিল, তা মুহূর্তে মনে পড়ে গেল!

যে-ঈশিতাকে তিনি বিয়ে করেছিলেন আর আজকের প্রৌঢ়া ঈশিতা এক নয়। ঈশিতাকে প্রৌঢা বলছেন কেন জীমূতবাহন? ঈশিতাও তো পঞ্চাশের সীমারেখা অতিক্রম করে গিয়েছে। কিন্তু ঈশিতাকে দেখলে তো তা মনে হয় না। ঈশিতাকে এখনও অনেক কচি কচি দেখায়। স্বাস্থ্য ও শ্রীকে ঈশিতা অন্য অনেক জিনিসের মতো নিজের শাসনে রেখে দিয়েছে। এত চুপি চুপি ঈশিতা প্রৌঢ়ত্বের অক্ষরেখা অতিক্রম করেছে যে, পোষ-মানানো অনুগত যৌবন চাকরি ছাড়া তো দূরের কথা, এখনও নোটিশ পর্যন্ত দেয়নি।

আজ বড় ভুল করে ফেলেছেন জীমূতবাহন। ঈশিতা এতদূর থেকে আসছে, তাঁর নিজেরই স্টেশনে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ইস্টার্ন লেডি বার্ড বীট্‌লগুলো ক'দিন আগেই সহবাস করেছে, আজই তাদের ডিমপাড়ার কথা। অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী বীট্‌লগুলোর স্বভাবের দিকে নজর রাখা প্রয়োজন ছিল। প্রসবের সময়ে ওদের হাবভাব থেকে কিছু কিছু নতুন সংবাদ জানবার আশা আছে। মানুষের পরম বন্ধু এই লেডি বার্ড বীট্‌ল। শূককীট অবস্থা থেকেই বহুরকমের পতঙ্গ এবং তার ডিম খেতে আরম্ভ করে।

ইস্টার্ন লেডি বার্ড বীট্‌ল—অ্যাডালিয়া বাইপাংটাটা—আমেরিকান লেডি বার্ড বীট্‌লের মাসতুতো বোন। প্রসবের আগে বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছিল—খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আবার পাতার ওপর আছড়ে পড়ছিল। ভয় পেলে ওরা ওইরকমই করে। জীমূতবাহনের মনে পড়ে গিয়েছিল তাঁর

প্রথম যৌবনের কথা। ঈশিতাও প্রথমবার মা হবার সময় খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল। জীমূতবাহন নিজেও সেই দুশ্চিন্তার দিনগুলো আজও ভুলতে পারেননি। কিন্তু ভাবী পতঙ্গমাতাদের স্বামীরা কেমন খোশমেজাজে পাশের খাঁচায় নিজেদের পেটের খিদে মেটাতে ব্যস্ত।

জীমূতবাহন এখনও দায়িত্বজ্ঞানহীন হতে পারলেন না ; পতঙ্গদের লেবার রুমের পাশেই পাহারায় রইলেন। স্টেশনে যাওয়া হলো না, জীপটা পাঠিয়ে দিলেন।

খাঁচার মধ্যে সবুজ গাছের ডালের দিকে তাকিয়ে জীমূতবাহনকে আরও অনেকক্ষণ হয়তো বসে থাকতে হতো। কিন্তু একটু পরেই প্রসব করলো গর্ভিণী—হলদে, অনেকটা কমলালেবু রঙের এক ডজন ডিম। নবজাতকদের প্রয়োজনীয় যত্নের ব্যবস্থা করে হাতটাত ধুয়ে নিজের ঘরে ফিরে, আনন্দের রোমন্থন শুরু করেছিলেন জীমূতবাহন। ঘরের আলোটা জ্বলতেই সংবিৎ ফিরে পেলেন।

ঈশিতা কেমন টাটকা তাজা রয়েছে। কে বলবে লম্বা ট্রেনজার্নি করে ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে এইমাত্র এসেছে সে? ঈশিতাকে দেখে কে বলবে, চারটে সন্তানের জন্ম দিয়েছে সে!

"ঈশিতা, কেমন আছ তুমি?" জীমূতবাহন জিগ্যেস করলেন।

"ভালই।" একটু গম্ভীর হয়েই ঈশিতা উত্তর দিলেন।

"ট্রেনে কোনো অসুবিধে হয়নি তো?" জীমূতবাহন আবার প্রশ্ন করলেন।

"দুদিন ট্রেন-জার্নিতে যত না অসুবিধে হয়েছে, তার ডবল অসুবিধে হয়েছে স্টেশনে। আমি তোমার অপেক্ষায় হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছি, কুলিদের গালাগালি খাচ্ছি, কিন্তু কোথায় তুমি?"

"হঠাৎ এমন আটকে গেলাম যে, কিছুতেই যাওয়া হলো না।"

"আমি এলে স্টেশনে যাবে কেন? কোনো অচেনা প্রফেসর হলে আড়াই ঘণ্টা আগে গিয়ে বসে থাকতে।" ঈশিতা বেশ অভিমানের সঙ্গেই উত্তর দিলেন।

"না না, ঈশিতা, ইনসেক্টগুলোর ডেলিভারির মুহূর্তে আমার থাকার

বিশেষ প্রয়োজন ছিল।" জীমূতবাহন উত্তর দিলেন।

"এতই যখন হচ্ছে, একটা ড্রাইভার রাখো না কেন? স্টেশনে যে গিয়েছিল ছেলেটি কে? কিছুই বলতে পারে না। বড্ড লাজুক মনে হলো। ভিড়ের মধ্যে আমার খোঁজখবর না করে, গেটের ধারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। ভাগ্যে গাড়ির নম্বর জানতাম; তাই নিজেই এসে খোঁজ করলাম।"

জীমূতবাহনের ইচ্ছে হলো স্ত্রীকে বলেন, গাড়িটা প্রাইভেট ব্যবহারের জন্যে নয়। যে-সব মধ্যবিত্ত জাপানীরা চাঁদা করে এ গাড়িটা উপহার দিয়েছে, তারা আশা করে এইটা চড়ে দূর-দূরান্তে, গ্রামের মধ্যে কিংবা অরণ্যের ধারে আমরা কীটপতঙ্গ সংগ্রহ করবো। কিন্তু বললেন না কিছুই। মনে হলো, ঈশিতা এ-সবের মূল্য দেবে না।

জীমূতবাহন বললেন, "যে-ছেলেটি তোমাকে নিয়ে আসতে গিয়েছিল সে সম্প্রতি আমার এখানে যোগ দিয়েছে।"

"একটু গোবেচারি এই যা, কিন্তু খুব বিদ্বান নিশ্চয়।"

"ডারহাম ইউনিভার্সিটিতে ডক্টরেট করেছে।"

ঈশিতা ভাবলেন, ছেলেটা তাহলে বেঁচেছে। ডক্টরেট ডিগ্রিটা মুঠোর মধ্যে ধরতে পেরেছে যখন, তখন গবেষণার হাত থেকে মুক্তি পাবে। একবার তাঁর ইচ্ছে হলো জীমূতবাহনকে সে কথা বলেন, কিন্তু জীমূতবাহন প্রচণ্ড দুঃখ পাবেন। সঙ্গে সঙ্গে বলে বসবেন, পরীক্ষার পর যেমন আসল পড়াশোনার শুরু, তেমনি পি-এইচ-ডি বা ডি-এস-সির শেষেই প্রকৃত গবেষণার আরম্ভ। কত সময় যে জীমূতবাহন বৃথা নষ্ট করেন, সে কথা কে ওঁকে বোঝাবে!

ঈশিতা জিগ্যেস করলেন, "ছেলেটির বয়েস কত?"

এবার বেশ শঙ্কিত হয়ে উঠলেন জীমূতবাহন। ঈশিতা আবার এইসব প্রশ্ন করছে কেন? না না, এইসব কোতূহলের প্রশ্রয় কিছুতেই আর দেবেন না তিনি। ভাবলেন, কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক থাকলেই প্রসঙ্গের পরিবর্তন হবে। কিন্তু ঈশিতা যা জেদী। আদর দিয়ে দিয়ে ব্যারিস্টার জগদানন্দ বসু মেয়েগুলোর কিছুই রাখেননি।

ঈশিতা বললেন, "কী গো, কথার উত্তর দিচ্ছ না কেন ?"

জীমূতবাহন বললেন, "তা সাঁইত্রিশ আটত্রিশ হবে নিশ্চয়।" জীমূতবাহন ইচ্ছে করেই বয়েসটা যথাসম্ভব বাড়িয়ে দিলেন।

কিন্তু ঈশিতা অত সহজে বোকা বনতে চাইলেন না। "কী যে বল তুমি। ওই রকম কচি কচি মুখ, আটত্রিশ হবে কি করে ?"

জীমূতবাহনের বলতে ইচ্ছে হলো, কচি কচি মুখ তো তোমারও আছে, কিন্তু তাই বলে কি তোমার বয়েস সাতাশ ? কিন্তু সামান্যক্ষণ এসেছে ঈশিতা। এরই মধ্যে বিস্ফোরণের ইন্ধন যোগাতে চান না জীমূতবাহন।

"তুমি নিজে ওর সার্টিফিকেট দেখেছো ?" ঈশিতা প্রশ্ন করলেন।

"এটা কিছু সরকারী চাকরি নয় যে, গেজেটেড অফিসারের আশীর্বাদপূত পরীক্ষার সার্টিফিকেটের নকল আমার কাছে নিবেদন করতে হবে। বয়েসটা তোমাকে আন্দাজেই বললাম।"

ঈশিতা অবজ্ঞাভরে বললেন, "এই জ্ঞান নিয়ে পোকামাকড়ের বয়েস ঠিক করো তোমরা ?"

জীমূতবাহন এবার পরিবেশটা হাল্কা করার সুযোগ পেয়ে গিয়েছেন। বললেন, "ঈশিতা, পতঙ্গদের জগতে একটা বছর যেন একটা শতাব্দী। তারই মধ্যে চতুর্দশ পুরুষের জন্মমৃত্যু ঘটতে পারে। কোনো মে-ফ্লাইকে আটচল্লিশ ঘন্টার বেশী বেঁচে থাকতে দেখা যায়নি। দীর্ঘজীবী সেভেনটিন-ইয়ার-সিকাডা পতঙ্গ জগতের ব্যতিক্রম। এরা জন্মের পর সতেরো বছর ঘুমিয়ে থাকে, তারপর কিন্তু বেঁচে থাকে মাত্র কয়েক দিন।"

ঈশিতাও ছাড়লেন না। সঙ্গে সঙ্গে বললেন, "সতেরো বছরের বেশী তোমরা তাই বোধহয় গুনতে পারো না।"

"ঈশিতা, তুমি স্নান করবে নাকি ? ঠাণ্ডা আছে। গরম-জল করে দিতে বল হরিমোহনকে।" জীমূতবাহন এবার আলোচনার মোড় ফেরাতে চেষ্টা করলেন।

ঈশিতা কিন্তু অন্য প্রশ্ন করলেন, "ছেলেটি পড়াশোনায় কেমন ছিল ?"

"ব্রিলিয়ান্ট।" উত্তরটা না দিতে পারলেই খুশী হতেন জীমূতবাহন। কিন্তু কিছুতেই মিথ্যে বলতে পারলেন না। কেমন ভয় ভয় করছে

জীমূতবাহনের।

ঈশিতা যদি এখন প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে, কিংবা সোজা স্নানঘরে চলে যায়, তাহলে স্বস্তি পেতেন জীমূতবাহন। ঈশিতাকে তিনি যে ভয় পান, এটা অস্বীকার করেন না জীমূতবাহন।

স্নান সেরে এসে ঈশিতা প্রসাধনে বসলেন। জীবনের কত সময় ঈশিতা প্রসাধনে ব্যয় করেছে, সেটা কষে দেখতে ইচ্ছে করে জীমূতবাহনের। সেটা অন্তত কয়েক বছর হবে, একথা জোর করে বলতে পারেন জীমূতবাহন।

নরম তোয়ালে দিয়ে ততোধিক নরম গাল দুটো আলতোভাবে মুছতে মুছতে ঈশিতা বললেন, "তাড়াতাড়ির মাথায় যা ভুল করে ফেলেছি! এখন ভদ্রসমাজে মুখ দেখাবো কী করে?"

উদ্বিগ্ন জীমূতবাহন ব্যস্তভাবে বললেন, "কী হয়েছে?"

"মেক-আপের কৌটোটা ফেলে এসেছি। কাল সকালেই খুকুমণিকে একটা টেলিগ্রাম করে দেবে? যেন একটা ম্যাক্সফ্যাক্টর কিনে এয়ারমেলে পাঠিয়ে দেয়।"

"ম্যাক্সফ্যাক্টর এখানকার শহরেও পেতে পারো।" জীমূতবাহন বললেন।

"সেগুলো মেড-ইন-ইণ্ডিয়া! নিউ মার্কেটে একটা লোক আমাদের বিলিতী জিনিস দেয়।"

জীমূতবাহন বললেন, "আমাদের দেশে ভাল ভাল কসমেটিক তৈরি হচ্ছে, কাগজে পড়লাম।"

"দিশী কসমেটিক ব্যবহার করা থেকে মুখে চুনকালি মাখা ভাল।" প্রসাধনরতা ঈশিতা তাঁর সুচিন্তিত অভিমত জানালেন। "খুকুটুকুর জন্যে দুঃখ হয়। ওদের বয়েসে আমরা যখন কলেজে পড়তাম, তখন বাবা কত রকমের কসমেটিকস্ প্যারি থেকে আনিয়ে দিতেন। সন্তানদের জন্যে আমার বাবা যা আগ্রহ নিতেন…" ঈশিতা ইচ্ছে করেই কথাটা অসমাপ্ত রেখে দিলেন।

জীমূতবাহনের মনে হলো ঈশিতা কৌশলে তাঁর গায়ে হুল ফোটাচ্ছে, তাঁকে মনে করিয়ে দিচ্ছে, পিতৃত্বের পরীক্ষায় তিনি পাস নম্বরও জোগাড়

করতে পারেননি এখন পর্যন্ত।

ঈশিতা বললেন, "আমার একখানা শাড়ি বাবা সত্যিই একবার ফ্রান্স থেকে কাচিয়ে এনে দিয়েছিলেন। এটা গল্পের কথা নয়।"

সপ্তকন্যার এক কন্যা ঈশিতা। কিন্তু সপ্তকন্যাকেই কী প্রচণ্ড দাপটে মানুষ করেছিলেন ব্যারিস্টার জগদানন্দ বসু। টাকাকে কোনোদিন টাকাই মনে করেননি তিনি।

ঈশিতা মনে করিয়ে দিলেন, "বাবা বলতেন, টাকা পয়সা হাতে পেলে ছেলেরা বকে যায়, কিন্তু মেয়েরা তা হয় না। মেয়েরা যে লক্ষ্মী—লক্ষ্মীর যত্ন করতে হয়।"

"আর একটা কী যেন বলতেন?" জীমূতবাহন প্রশ্ন করলেন।

"বলতেন, মেয়েরা বাড়িতেও এমনভাবে সব সময় সাজগোজ করে থাকবে যে, মনে হবে এখনই কোথাও বেরোচ্ছে। তোমাদের সমুদ্র সেন এখন তো এতো নামকরা ডাক্তার হয়েছে। তখন মোটেই প্র্যাকটিশ ছিল না। অর্ডিনারি এম-বি। মেজদির প্রেমে পাগল। বাবার কাছে প্রপোজ করেছিল পর্যন্ত। বাবা সোজা বলেছিলেন,-তোমার একমাসের রোজগারে আমার মেয়ের শাড়ির খরচ উঠবে না।"

খিল খিল করে হেসে উঠলেন ঈশিতা। "ধনেখালির রাজাবাহাদুরদের বাড়িতে শেষ পর্যন্ত মেজদির বিয়ে হলো। ওদের জমিদারিটারি এখন গিয়েছে। কিন্তু কলকাতাতে এখনও যা খাস জমি আছে, তাতে তোমার মতো পোকামাকড় না ঘেঁটেই পাঁচপুরুষ চলে যাবে।"

ঈশিতা সূক্ষ্মভাবে তাঁকে ব্যঙ্গ করছে কিনা জীমূতবাহন ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না। কিন্তু এরকম হুল অনেকবার দেহে ফুটেছে জীমূতবাহনের! তেমন কষ্ট হয় না, বেশ সহ্য হয়ে গিয়েছে। প্রতিবাদ না করে শুনে যাওয়াই ভাল।

"তোমাকে একেবারে বলতে ভুলে গিয়েছি। মেজদির বড় ছেলে অনিরুদ্ধ এবার ক্রফোর্ড অ্যাণ্ড ক্রফোর্ডের ডিরেক্টর হলো। স্টার্লিং কোম্পানী ছিল এতোদিন। এবার ইণ্ডিয়া লিমিটেড হচ্ছে।" ঈশিতা স্বামীকে জানালেন।

বড় বড় কোম্পানীর খবরাখবর ঈশিতা তাঁর থেকে অনেক বেশী রাখেন।

বড় বড় অফিসের বড় বড় পোস্টে ওঁর অনেক আত্মীয়স্বজন অথবা দিদিদের কেউ-না-কেউ কাজ করে। বোধ হয় কোনো মন্তব্য না করাটা অশোভন হবে, এই মনে করে জীমূতবাহন বললেন, "তাই নাকি! খুবই সুখবর। তোমার দিদিকে যখন লিখবে, তখন আমার অভিনন্দনটা জানিয়ে দিও।"

"আমি কেন লিখতে যাবো? তোমার হাত পা আছে, গণ্ডা গণ্ডা বাজে চিঠি লিখছ দুনিয়ার সর্বত্র, ইচ্ছে করলে আমার দিদিকেও একটা চিঠি ছাড়তে পারো।"

জীমূতবাহন চুপ করে রইলেন।

জীমূতবাহনের নীরবতা যে ঈশিতাকে বিরক্ত করেছে, তা তাঁর পরবর্তী কথা থেকেই বোঝা গেল। "দিদি তো বলে—সপ্তম লাইনে ছন্দপতন। এই শেষ লাইনে এসেই বাবা কবিতা মেলাতে পারলেন না।"

"মানে?" হাসতে হাসতে জীমূতবাহন জিগ্যেস করলেন। ল্যাবরেটরিতে কাজ আছে কিছু, কিন্তু সেগুলো আজ করা যাবে বলে মনে হচ্ছে না।

"মানে তুমি অত্যন্ত অসামাজিক।"

"অসামাজিক?"

"তোমার থেকে অসামাজিক আমাদের সাতগুষ্টিতে কেউ নেই।"

কোনো প্রতিবাদ করলেন না জীমূতবাহন। কারণে অকারণে প্রতিবাদ জানানোর জন্যেই পৃথিবীতে এতো অশান্তি।

যাদের স্ত্রীরা মুখরা, তারা যদি স্বল্পবাক্ হয় তবেই তো ভারসাম্য বজায় থাকবে। পৃথিবীর সব পুরুষই যে ঝিঁঝি পোকার মতো ভাগ্যবান নয়, তা অ্যারিস্টটলেরও দুশো বছর আগে এক গ্রীক ভদ্রলোক লিখে গিয়েছিলেন:

Happy the Cicadas' lives
For they have only voiceless wives.

সিকাডার প্রেমপর্ব এই ক'দিন আগেই জীমূতবাহন ল্যাবরেটরিতে বিশ্লেষণ করছিলেন। একটা পাখার সঙ্গে আর একটা পাখা ঘষে পুরুষরা আকাশে বাতাসে আহ্বান ছড়িয়ে দেয়। শ্রীমতী সিকাডা নির্বাক হলেও বধিরা নন। তাই সঙ্গে সঙ্গে চঞ্চল হয়ে ওঠেন এবং তীরবেগে প্রিয়তমের কাছে উড়ে আসেন!

প্রসাধন শেষ করে ঈশিতা এবার স্বামীর সামনে এসে বসলেন।

"তোমার খিদে পেয়েছে নিশ্চয়", জীমূতবাহন প্রশ্ন করলেন।

"তুমি আজকাল খাও কখন?" ঈশিতা জানতে চাইলেন।

"ঠিক নেই কিছু", জীমূতবাহন উত্তর দেন।

ঈশিতা বিরক্ত হয়ে বলেন, "আমার বাবারও নিশ্বাস ফেলবার সময় থাকতো না, তবু রাত্রের খাওয়াটা ঠিক আটটায় সেরে নিতেন।"

"সব সময় হয়ে ওঠে না, ঈশিতা।"

"এইটা তোমার বাড়াবাড়ি। বাবার জন্যে বড় বড় মক্কেলরা বসে থাকতেন। ডজনখানেক পোকা যদি তোমার জন্যে আধঘণ্টা বেশী অপেক্ষা করে, তাহলে নিশ্চয় তাদের জমিদারি লাটে উঠবে না!"

এত বলেও ঈশিতার মন ভরলো না। আবার আরম্ভ করলেন, "নাম কেনার চেষ্টা করা ভাল, আমার ছেলে থাকলে তাকেও তাই বলতাম, কিন্তু কোনো জিনিসের বাড়াবাড়ি ঠিক নয়।"

সুযোগ পেলেই ঈশিতা যে তাঁকে ব্যঙ্গ করেন, তাঁর এই সাধনাকে নাম কেনার একটা চেষ্টা মনে করেন, তা জীমূতবাহন লক্ষ্য করেছেন। বাবার বিরাট সাফল্য দেখেছেন ঈশিতা। দিদিদের বড় বড় ঘর থেকে বর এসেছে। তাদের ধনগৌরবও ঈশিতাকে প্রভাবান্বিত করেছে। ছোটখাট সার্থকতা, ছোটখাট স্বপ্নকে তাই বোধহয় জগদানন্দ বসুর কনিষ্ঠা কন্যা আমল দিতে পারেন না।

এক একবার জীমূতবাহনের মনে হয়, ঈশিতাকে বিয়ে করে মস্ত ভুল করেছিলেন। ঈশিতাকে বিয়ে করে নিজের ওপর এবং তার থেকেও বেশী ঈশিতার ওপর অন্যায় করেছিলেন জীমূতবাহন। কতদিন আগেকার কথা, এসব নিয়ে এই বৃদ্ধ বয়সে চিন্তা করে কোনো লাভ নেই। তবু জীমূতবাহন এই ধরনের ভাবনাকে মন থেকে দূর সরিয়ে রাখতে পারছেন না। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধেই চিন্তার প্যারাসাইটগুলো তাঁর দেহে ঘর-সংসার পেতে বসছে এবং তিলে তিলে তাঁকে কুরে কুরে খাবার চেষ্টা করছে।

ঈশিতাকে বিয়ে না করলে জীমূতবাহনের জীবনধারা কোন্‌দিকে প্রবাহিত হতো কে জানে? কিন্তু ঈশিতা বিরক্ত হলেই যে কথাটা মনে

করিয়ে দেন সেটা মিথ্যা নয়—"আমার বাবাই তোমাকে সমস্ত খরচ দিয়ে বিলেত পাঠিয়েছিলেন। তিন বছর তোমাকে শুধু রাজার হালে রাখেননি, তোমার মাকেও টাকা পাঠিয়েছেন। বল, এসব মিথ্যে ? বল, আমার বাবা না থাকলেও তোমার নামের পিছনে ওই বিলেতের ডক্টরেট ডিগ্রিটা জুড়তে পারতে ?"

অস্বীকার করে লাভ নেই—সত্যিই জীমূতবাহন কিছুই পারতেন না যদি না ঈশিতাকে বিয়ে করতেন। মাস্টারমশাই স্যর পি সি রায় ব্যারিস্টার জগদানন্দ বসুকে চিনতেন। দু'জনে ভাবও ছিল খুব।

জগদানন্দই বোধ হয় বলেছিলেন, "বিত্তবানদের ঘরে ছ'টা মেয়ের বিয়ে দিয়েছি। এবার ভাবছি মুখ পাল্টাবো। এটা বেশ বুঝতে পারছি, প্রফুল্লবাবু আপনাদের ইউনিভার্সিটির ছেলেরাই দেশের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলবে। আমার খুব ইচ্ছে ছোট মেয়ে ঈশিতাকে জ্ঞানবানের হাতে দান করি।"

স্যর পি সি রায় তখন জীমূতবাহনের কথা বলেছিলেন—"বিশ্ববিদ্যালয়ের রত্ন। তাছাড়া পরীক্ষায় ফার্স্ট সেকেণ্ড হওয়াটাই বড় কথা নয়। ইংরিজীর ফার্স্ট ক্লাশ ফার্স্টরাই যেমন ইংরিজী সাহিত্যের কর্ণধার হয়নি, তেমনি সায়েন্সের ফার্স্ট ক্লাশ ফার্স্টরাই বিজ্ঞানের বৃহৎ আবিষ্কার করেনি।"

জগদানন্দ বসুকে তিনি বলেছিলেন, "এদের বাড়ির অবস্থা ভাল নয়, কিন্তু ছেলেটার মধ্যে প্রতিভার চমক দেখতে পাই। সুযোগমতো যদি আমাদের কলকাতার কুয়ো ছেড়ে একবার বিদেশটা দেখে আসতে পারে এবং যদি গবেষণার সুযোগ পায়, তাহলে জীমূতবাহন বড় কিছু করে ফেলতে পারে।"

জীমূতবাহনকেও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র অনেক কথা বলেছিলেন। বড়-লোকদের সম্বন্ধে চিরকালই জীমূতবাহনের ভীতি ছিল। বড়লোকের জামাই, সে তো আরও ভয়ের কারণ!

মাস্টারমশাইকে জীমূতবাহন বলেছিলেন, "কলেজের সামান্য মাস্টারি করে ক'টা টাকা পাবো মাস্টারমশাই ? বড়লোকের মেয়ের শাড়ি কেনবার টাকাই থাকবে না।"

প্রচণ্ড বকুনি লাগিয়েছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র। "সংসার সম্বন্ধে কিছুই বুঝিস না

তুই। গরীবের মেয়েরাই অনেক সময় শাড়ি বেশী চায়। অনেক শাড়ি পরে পরে বড়লোকের মেয়ের প্রায়ই দামী শাড়িতে লোভ থাকে না।"

"কিন্তু স্যর, ওদের স্ট্যাণ্ডার্ড আর আমার স্ট্যাণ্ডার্ড!" জীমূতবাহন আবার আবেদন জানিয়েছিলেন।

"তুই বড্ড বকিস আজকাল," স্যর পি সি রায় বকুনি লাগিয়েছিলেন। "সুযোগের সদ্ব্যবহার যারা করতে পারে না, তারা বড় বৈজ্ঞানিক হবে কী করে? তোকেও তো স্ট্যাণ্ডার্ড উঁচু করতে হবে। তোকে বড় হতে হবে না? আমি তো দেখতে পাচ্ছি, জগদানন্দ বোসের মেয়েকে বিয়ে করে তুই বিদেশে লেখাপড়ার সুযোগ পাচ্ছিস। তারপর সংসারের তেল-নুন-ডালের হিসেবে সময় নষ্ট না করে নিজের জগতে তন্ময় হয়ে তুই গবেষণা করছিস।"

জীমূতবাহন মাস্টারমশাইয়ের একটা কথা আজও ভুলতে পারেননি। "থিওরিটিক্যাল গবেষণা দরকার, কিন্তু আমাদের এই গরীব দেশে তার থেকেও বেশী দরকার কি জানিস—অ্যাপ্লিকেশন। প্রয়োগ বিদ্যা। অ্যাডিসনের মতো আবিষ্কারক প্রয়োজন আমাদের, বুঝলি?"

"ইচ্ছে করলেই কেউ কি অ্যাডিসন বা ওয়েস্টিংহাউস হতে পারে মাস্টারমশাই!"

"তা সত্যি।" পি সি রায় স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে এও বলেছিলেন, "আমাদের এই দেশের অবস্থা দেখছিস তো! ভাত-কাপড়ের দুর্গতি দেখলে মাথার ঠিক থাকে না। এমন সব বিষয় নিয়ে কাজ করবি, যাতে দেশের এই মানুষগুলোর একটু সুরাহা হয়।"

তাঁর কথা ভাবলে জীমূতবাহনের চোখ দুটো সজল হয়ে ওঠে। ছেলেদের কথা অমনভাবে কেউ চিন্তা করে কী? মাস্টারমশাই বলেছিলেন, "দেখিস, একদিন তোর মনে হবে বিয়েটা দিয়ে আমি ভালই করেছিলাম।"

জীমূতবাহন তখন যেন কেমন ছেলেমানুষ হয়ে গিয়েছিলেন। মাস্টার-মশাইকে বলেছিলেন, "অমন শিক্ষিতা মেয়ে বিয়ে করে অসুবিধেয় পড়ে যাবো না তো!"

হেসে ফেলেছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। "তার মানে তুই কি শিক্ষিত না?"

"তা নয়, তবে সায়েন্সের মধ্যেই তো পড়ে রয়েছি। আর্ট লিটারেচার অস্পৃশ্য হয়ে আছে, অথচ ঈশিতা কবিতা লেখে শুনেছি।"

মাস্টারমশাই জোরে হেসে উঠেছিলেন। "বিয়ে-থা করিনি বটে, কিন্তু তোকে একটা সাংসারিক উপদেশ দিয়ে রাখি, শোন্। বিয়ের সময় মেয়েরা থাকে একতাল নরম মাটির মতো। নতুন স্বামীটি হচ্ছে পটো। যেমনভাবে গড়ে নিবি মেয়েটা ঠিক তাই হবে। তুই কেষ্টনগরের কারিগর হবার চেষ্টা করিস।"

কারিগর, কেষ্টনগরের কারিগর তো দূরের কথা, ইস্কুলের ড্রয়িং মাস্টারও হতে পারেননি জীমূতবাহন। ঈশিতাকে গড়ে তুলবেন তিনি! মাটির নয়, ঢালাই লোহার পুতুল বলে মনে হয়েছে ঈশিতাকে।

ঈশিতা এখন কী করছে? চমকে উঠলেন জীমূতবাহন। ঈশিতা বেডরুম থেকে উঠে গিয়েছেন। বোধ হয় তিনি একটু অন্যমনস্ক হয়েছিলেন, সেই সুযোগেই চলে গিয়েছেন ঈশিতা।

"কোথায় গেলে ঈশিতা?" জীমূতবাহন ডাক দিলেন। ঈশিতা ডাইনিং টেবিলে বসে চিঠি লিখছেন।

"চিঠি লিখছো? কাকে?" জীমূতবাহন প্রশ্ন করেন।

"যাদের তুমি কোনোদিন চিঠি লেখো না," ঈশিতা কর্কশভাবে উত্তর দিলেন।

"মানে?"

"মানে, সন্তানরা বাবা-মায়ের সংবাদ আশা করে। মদালসা এসেছিল আমাকে স্টেশনে তুলে দিতে। সে-বেচারা এতক্ষণ মুখ শুকনো করে মায়ের কথা ভাবছে নিশ্চয়।"

ক্ষমা প্রার্থনা করলেন জীমূতবাহন। "চিঠি লেখা শেষ করো।"

চিঠি লেখা শেষ করলেন না ঈশিতা। কলমটা নামিয়ে রেখে বললেন, "পরের জন্মে পুরুষ হবার প্রার্থনা করবো।"

"কেন?"

"মা হওয়ার দুঃখ অনেক। বাবা হওয়ার কোনো দায়িত্ব নেই।" একটা বোলতা যেন জীমূতবাহনের দেহে হুল ফুটিয়ে দিয়ে গেল। জীমূতবাহন তবুও রেগে উঠলেন না। উত্ত্যক্ত হলে কেঁচোরাও ফোঁস করে ওঠে। জীমূতবাহন নিজেকে ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না।

দু'জনের এক সঙ্গে খাওয়াদাওয়া শুরু হলো। খাওয়া শেষ করে বিছানায় এসে বসলেন জীমূতবাহন। লুঙিটা পরলেন তিনি।

বাথরুম থেকে শাড়ি পাল্টে স্লিপিং গাউন পরে এলেন ঈশিতা। এই স্লিপিং গাউনটা কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারেন না জীমূতবাহন। কোনো কারণ নেই; তবু অচেতন মনে একটা বিরাগ আছে। বিয়ের পর ঈশিতাও তাঁকে স্লিপিং সুট পরাবার কত চেষ্টা করেছেন। কিছুতেই রাজী হননি জীমূতবাহন। দেশ-বিদেশ যেখানেই যান, রাত্রে লুঙি পরেই শুয়েছেন তিনি।

ঈশিতাও রেগে গিয়েছিলেন, "পররুচি পরনা যখন নয়, তখন আমিও স্লিপিং গাউন ছাড়বো না।"

খাট দুটো পাশাপাশি জোড়া রয়েছে। "এখনই ঘুমোবে?" জীমূত-বাহন জানতে চাইলেন।

ঈশিতা চুলের বেণী থেকে কাঁটা খুলছিলেন। বললেন, "তুমি?"

"আমি একটু শুতে পারি।"

"পারি মানে?"

"কিছুক্ষণ শুয়ে আমি উঠে পড়ি। ওই সময় ঘণ্টাখানেক কাজ করলে খুব ভাল ফল পাই।"

ঈশিতা ঘাড় বেঁকিয়ে স্বামীর দিকে তাকিয়ে রইলেন। ঈশিতার এই ক্রুদ্ধ বিস্ময়ের ভঙ্গী জীমূতবাহনের খুব ভাল লাগে। সব বিভেদ কিছুক্ষণের জন্যে মিটিয়ে ফেলে শান্তি স্থাপনের লোভ হয়।

ঈশিতা ব্যাগ থেকে ক্লিনসিং মিল্কের শিশি এবং তুলো বার করে মুখে, গলায়, ঘাড়ে, হাতে এমন কি পায়ে ঘষতে লাগলেন।

জীমূতবাহন দেখতে লাগলেন সাদা তুলো একটু পরেই কেমন ময়লা হয়ে উঠছে। ঈশিতার পরিচ্ছন্ন দেহে যে এত ময়লা থাকতে পারে, খালি চোখে কে বলবে। দুধ দিয়ে এমনিভাবে আস্তে আস্তে সমস্ত দেহটা মুছে ফেলতে নিশ্চয় অনেক সময় লাগবে।

জীমূতবাহন বললেন, "তুমি ক্লান্ত হয়ে আছ, এখন ঘুমোও।"

ঈশিতা বালিশের ওপর কনুই রেখে, আধশোয়া অবস্থায় বললেন, "তোমার বন্ধু জনার্দন মিত্র পড়াশোনায় কেমন ছিল?"

"বাজে বলতে পারো। থার্ড ক্লাশ পেয়েছিল।" জীমূতবাহন চশমাটা খুলে রাখতে রাখতে উত্তর দেন।

"তোমার কাছে দু'একটা ফরমুলা দেখিয়ে নিতে এসেছিল না?" ড্রেসিং গাউনটা একটু আলগা করতে করতে ঈশিতা প্রশ্ন করলেন।

"মাঝে মাঝে আসতো। বেচারার খুব অভাব ছিল।"

লিপস্টিক মাখা ঠোঁট উল্টিয়ে ঈশিতা বললেন, "তোমার সেই অভাবের জনার্দন লেক প্লেসে চারতলা বাড়ি করেছে। দোতলাটা পুরো এয়ার-কণ্ডিশন।"

"তাই নাকি? খুবই আনন্দের কথা।" পুরনো বন্ধুর সাফল্যের সংবাদে জীমূতবাহন সত্যিই খুব খুশী হয়ে উঠলেন।

"তোমার ক'কাঠা জমি আছে?" ঈশিতা এবার গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করলেন। জেরা করবার এই কঠিন ভঙ্গীটা ঈশিতা বোধ হয় বাবার কাছ থেকে পেয়েছেন।

জীমূতবাহন প্রথমে একটু বিব্রত বোধ করলেন। তারপর সহজভাবেই উত্তর দিলেন, "জমি আমি কোথায় পাবো? কলকাতা শহরের জমি কেনা কি সহজ কথা?"

ঈশিতা বললেন, "প্রিটোরিয়া স্ট্রীটে বাবা আমাদের কিভাবে রেখেছিলেন তা তো তোমার দেখা। আর আমি আমার মেয়েকে নিয়ে কসবাতে দু'খানা ঘরে কীভাবে থাকি?"

জীমূতবাহন অস্বস্তিতে কাশতে লাগলেন।

ঈশিতা আবার বললেন, "যখন তুমি প্রিটোরিয়া স্ট্রীটে আসতে, শুধু

শোয়ার ঘর নয়, একটা স্যুইট পুরো পেতে। চিত্রাকে নিয়ে সুপ্রিয় এসেছিল সেদিন। মেয়ে-জামাইকে শোয়ার ঘর ছেড়ে দিতে চেয়েছিলাম। ওরা রাজী হলো না—বাইরের ঘরে সোফা সরিয়ে ওরা শুলো।"

"আমার শ্বশুর বিখ্যাত ব্যারিস্টার ছিলেন।" গম্ভীর হয়ে জীমূতবাহন উত্তর দেন।

ঈশিতার পক্ষে বিরক্তি চেপে রাখা আর সম্ভব হলো না। গালটা ঠিকমতো তৈলাক্ত হয়েছে কিনা ডান হাতে অনুভব করতে করতে চোখটা ছোট করে বললেন, "সুপ্রিয়র শ্বশুরও শুনেছি জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক।"

আর পারলেন না জীমূতবাহন। ঈশিতার দুটি হাত ধরে বললেন, "ঈশিতা, অনেকদিন পরে আমাদের দেখা হচ্ছে। কতদিন পরে তুমি আবার এখানে এলে। অন্তত আজকের রাতটা বিনা কলহে কাটলে কেমন হতো? প্লিজ, আজকের রাতটা।"

ঈশিতা এবার পাশ ফিরে শুয়ে পড়লেন। ঈশিতার পিঠের দিকে তাকিয়ে জীমূতবাহনের মনে হলো জেলখানার দুর্লঙ্ঘ্য পাঁচিলের মধ্যে বন্দী হয়ে রয়েছেন তিনি। দেওয়ালটা যেভাবে ফুলে ফুলে উঠছে তাতে মনে হয়, বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছে, স্পর্শ করলেই দুর্ঘটনা ঘটবে। ঘরের সিলিঙের দিকে তাকিয়ে জীমূতবাহন প্রশ্ন করলেন, "সুপ্রিয়র খবর কী?"

"প্রমোশন হয়েছে ওর। সমস্ত পূর্বাঞ্চলের সেলস্ ম্যানেজার। গাড়ি তো ছিলই, অফিস থেকে এবার ড্রাইভার দিল। এয়ারকণ্ডিশন ক্লাশের ভাড়া পায়। বছরে একবার বৌকে নিয়ে যেখানে খুশি ঘুরে আসতে পারে।"

ঈশিতা এবার সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছেন। আলোটা নিভিয়ে দিলেন জীমূতবাহন। কিন্তু তাঁর ঘুম আসছে না। ঈশিতা তাঁর রক্তচাপ বাড়িয়ে দিয়েছেন।

নানা উদ্ভট চিন্তা মাথায় জড়ো হচ্ছে। চিন্তার পোকাগুলোকে কোনো ওষুধে অবশ করে দিয়ে একটু ঘুমোতে পারলে মন্দ হতো না। চোখ বুজে ঘুমোবার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন জীমূতবাহন।

কিন্তু কোথায় ঘুম? চিন্তার প্যারাসাইটগুলো নররক্তের আস্বাদ পেয়েছে, তারা অসহায় জীমূতবাহনের মাথায় তীক্ষ্ণ শুঁড় ফুটিয়ে ছোট ছোট গর্ত করছে।

তাঁর সেজ মেয়ে চিত্রলেখার মুখটা দেখতে পাচ্ছেন জীমূতবাহন। সুপ্রিয়র মুখটা আরও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন। জামাই বলে নয়, তারও আগের আর এক সুপ্রিয়কে দেখতে পাচ্ছেন অধ্যাপক জীমূতবাহন। সুপ্রিয়র উন্নতি হয়েছে! আড়াই হাজার টাকা মাইনে পাচ্ছে সুপ্রিয়। কিন্তু সুপ্রিয় সেলসম্যান হয়েছে। বিজ্ঞানের গবেষণা ছেড়ে দিয়ে প্রিয় ছাত্র সুপ্রিয় চৌধুরী ইনসেকটিসাইডের ফেরিওয়ালা হয়েছে।

একটা প্রশ্নের উত্তর জানতে ইচ্ছে হচ্ছে জীমূতবাহনের। ফেরিওয়ালার চাকরিতে যদি সবচেয়ে বেশী মাইনে পাওয়া যায়, তাহলে মাইক্রোসকোপ পাশে সরিয়ে রেখে, বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগার ছেড়ে দেশের সেরা ছাত্ররা কোটপ্যান্ট পরে, এয়ারকণ্ডিশন ক্লাশে বিভিন্ন শহরে ঘুরে ঘুরে মাল বিক্রি করে বেড়াবে? প্রাইস ক্যাটালগ, সেলস্ ট্যাক্স আর একচুয়াল ইউজার্স লাইসেন্সের তলায় চাপা পড়ে বিজ্ঞানের দীপশিখা অক্সিজেনের অভাবে নিভে যাবে?

এ সব কী ভাবছেন জীমূতবাহন? নিউ আলিপুরে তাঁর মেয়ে স্বামীর সঙ্গে কোম্পানির-দেওয়া ফ্ল্যাটে রয়েছে। সব সময় কোম্পানির ড্রাইভার থাকায় চিত্রার মার্কেটিঙের কোনো অসুবিধে হয় না। শ্বশুর জীমূতবাহনের এতে আনন্দিত হবারই কথা। কিন্তু অধ্যাপক জীমূতবাহন, বৈজ্ঞানিক জীমূতবাহন, যে-জীমূতবাহন প্রতিভাবান ছাত্র সুপ্রিয় চৌধুরীকে নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরিতে গবেষণার জন্যে নিয়ে এসেছিলেন, তিনি কী করে আনন্দিত হবেন? সামান্য সাড়ে তিন শ' টাকার একটা স্কলারশিপ ছিল সুপ্রিয়র। কিন্তু সঙ্গে স্বপ্নও তো ছিল। সম্ভাবনা? বিজ্ঞানের কী বিরাট সম্ভাবনা সুপ্রিয়র মধ্যে ছিল!

অনেক আগেই বোঝা উচিত ছিল জীমূতবাহনের। কিন্তু বুঝেই বা কী করতেন? জগদানন্দ বোসের নাতনী সাড়ে তিন শ' টাকা রোজগারের স্বামী নিয়ে কী করতো?

ঈশিতা নিজেই তো বলেছিলেন, "ভাল অফিসের বেয়ারাও আজকাল সাড়ে তিন শ' টাকা মাইনে পায়!"

বাধা দিতে পারতেন জীমূতবাহন। কিন্তু কী করে পারেন! ঈশিতা ছেলে পছন্দ করেছেন। চিত্রার সঙ্গে জীমূতবাহন কথা বলেননি, কিন্তু সুপ্রিয়র সঙ্গে তাঁকে নিবেদিতা ল্যাবরেটরির বাইরেও ঘুরে বেড়াতে দেখা গিয়েছে।

ঈশিতা বলেছেন, "ছেলেটি বেশ। সংসারেও ঝামেলা নেই। বড় সংসার আমার দু-চোখের বিষ। তোমার মেয়ের একটু হ্যাণ্ডসাম পছন্দ! আর অতি বড় শত্রুও স্বীকার করবে সুপ্রিয় সুন্দর।"

"কন্যা বরয়তে রূপম্" ঈশিতাই তাঁকে বলেছিলেন। খুব দুঃখ পেয়েছিলেন জীমূতবাহন। তিনি আশা করেছিলেন তাঁর মেয়ে অন্তত অত সাধারণ হবে না। তিনি বিশ্বাস করেছিলেন সুপ্রিয়র গুণেই আকৃষ্ট হয়েছে তাঁর মেয়ে।

না, এ সব চিন্তায় এই রাতদুপুরে নিজেকে বিব্রত করে কী লাভ হচ্ছে? কিছুই না। তবু জীমূতবাহন নিজেকে ঘুমের কোলে সঁপে দিতে পারছেন না। তাঁর চোখে ঘুম নেই; অথচ এই দুর্ঘটনার জন্যে যে দায়ী, সুপ্রিয়র মতো গবেষককে যে ফেরিওয়ালা হতে বাধ্য করলে, সে পাশের বিছানায় কেমন নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাচ্ছে।

জীমূতবাহন কি তাঁর স্বপ্ন সফল করতে পারবেন? সেই ছোটবেলা থেকে বিজ্ঞানের যে সাধনা তিনি করে আসছেন, তা কী সার্থক হবে না? প্রশংসা কি মনের ওপর উত্তেজকের কাজ করে? সাফল্য, হাততালি এগুলো কি লক্ষ্যে পৌঁছনর জন্যে ম্যারাথন দৌড়বীরের পক্ষে একান্তই প্রয়োজন?

প্রশংসা, ভালবাসা, উৎসাহ এক সময়ে তিনিও তো পেয়েছেন যথেষ্ট। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের স্নেহধন্য তিনি। প্রফুল্লচন্দ্র বিশ্বাস করতেন, সস্তা হাততালির মোহে বিভ্রান্ত না হয়ে জীমূতবাহন মানুষের সংসারে বড় কোনো কাজ করে যাবেন। ব্যারিস্টার জগদানন্দ বসু কন্যাস্নেহে অন্ধ হলেও এইটুকু বুঝেছিলেন যে, এই ছাত্রের পিছনে অর্থ বিনিয়োগ করাটা খুব ভুল হবে না।

আর ঈশিতা? যে-ঈশিতাকে জীমূতবাহন সেন বিবাহ করেছিলেন, যে-ঈশিতা তাঁর দীর্ঘপ্রবাসে একদিন ছাড়া একটা দীর্ঘ চিঠি লিখেছেন, যে-ঈশিতা বিছানায় শুয়ে বলেছেন, "আমি চাই তুমি খুব বড় হও, অন্য জামাইবাবুদের থেকে তোমার খ্যাতি যেন সমস্ত দেশে ছড়িয়ে পড়ে"

ঈশিতা লিখতেন, "আমাকে চিঠি লেখার জন্যে তোমার যদি পড়ার সময় নষ্ট হয়, তাহলে বড় চিঠি লিখো না। মাঝে মাঝে শুধু কুশল সংবাদ দিও। আমি অবশ্য তোমাকে চিঠি লিখে যাবো।"

ঈশিতাকে নিয়েই ওর বাবা একবার বিলেত বেড়াতে এসেছিলেন। কী রোমাঞ্চকর উত্তেজনার দিন সে-সব! কী কাজ করছ, কেমন ভাবে করছ, গবেষণার লক্ষ্যে পৌঁছতে আর কতদিন লাগবে সব খুঁটিয়ে জিগ্যেস করেছেন ঈশিতা।

ঈশিতা বলেছেন, "জাহাজে ওঠবার আগে স্যর পি সি রায়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। উনি কী বললেন জানো?"

"কী বললেন?" জীমূতবাহন ঈশিতার কাঁধে একটা হাত রেখে জিগ্যেস করেছিলেন।

লজ্জায় মুখ রাঙা করে ঈশিতা বলেছিলেন, "এখন বলা যায় না। রাত্রে বলবো।"

দেরি সয়নি জীমূতবাহনের। বলেছিলেন, "এখনই তাহলে ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে রাত্রি করে দিচ্ছি।"

চারদিকে তাকিয়ে নিয়ে ঈশিতা বলেছিলেন, "উনি বললেন, বরের খবর নিতে যাচ্ছ যাও, কিন্তু বরের থিসিস দেবার সময় ঘনিয়ে এসেছে—তার মাথা গরম করে দিও না।"

দু'জনে খুব হেসেছিলেন। ঈশিতা বলেছিলেন, "আসতাম না। প্রিভি-কাউন্সিলে বাবার একটা কেস এসে গেল। ভাবলাম বরকে দেখে আসবার এই সুযোগটা ছাড়া যায় না।"

জগদানন্দ বোস কেস শেষ করেই জাহাজে চেপে বসেছিলেন। ঈশিতা স্বামীর অনুরোধ রাখেননি, বাবার সঙ্গেই ফিরে এসেছেন। যাবার আগে বলেছেন, "যন্ত্রপাতি সব পাচ্ছো তো? দরকার হয় তো বলো আমায়।

বাবাকে জানাবো না, আমার গয়না আছে সঙ্গে।"

দু'একটা যন্ত্রপাতির দরকার ছিল। ঈশিতা কিছুতেই শোনেননি। হীরের দুল বিক্রি করে স্বামীর যন্ত্র কিনে দিয়েছিলেন।

বিশ্বাস হয়? জীমূতবাহন কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারেন না, সেই ঈশিতাই আজকের ঈশিতার রূপ নিয়ে তাঁর পাশে ঘুমিয়ে রয়েছে।

বিদেশে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের কথা মনে পড়ে যেতো, আর গর্ব হতো যে, মাটির তাল দিয়ে সুন্দরী সুশ্রী স্বপ্নময়ী এক নারী তৈরি করেছেন জীমূতবাহন।

এখন মাঝে মাঝে অন্য কথা মনে হয়। মনে হয় মূর্তি গড়া প্রায় শেষ করে একটু অন্যমনস্ক হয়েছিলেন জীমূতবাহন আর সেই সুযোগে নরম পুতুলটাকে কে চেপ্টে দিয়েছে—একটা বীভৎস সৃষ্টির মালিক হয়েছেন জীমূতবাহন সেন।

দেশে ফিরে এসেছেন জীমূতবাহন। অধ্যাপনার পদ পেয়েছেন তিনি। কিন্তু ঈশিতা বলেছেন, "তুমি শুধু ছেলে পড়াও তা চাই না আমি। আমি চাই তুমি কিছু আবিষ্কার কর।"

ইতিমধ্যে বিদেশ থেকে অধ্যাপনার নিমন্ত্রণ এসেছে। জগদানন্দ বসু ততদিনে দেশের কাজে ঝুঁকেছেন। ব্যারিস্টারি করা থেকে দেশের কোটি কোটি মানুষের মুক্তির চিন্তা যে অনেক বড় কাজ, তা বুঝতে আরম্ভ করেছেন। প্র্যাকটিশ ছেড়ে দেবেন ভেবেছেন, কিন্তু মেয়েদের জন্যে প্রচুর টাকা লাগে তাঁর। সংসারের খরচ যে অনেক।

জগদানন্দ বলেছেন, "বিদেশে গিয়ে বিদেশীর সেবা করে টাকা হয়তো পাবে। কিন্তু টাকাটাই কী সব? তুমি আমাদের দেশের কথা ভাবো।"

ঈশিতা বলেছেন, "বাবার কথা তোমাকে যে শুনতেই হবে, এমন কোনো দিব্যি নেই।"

জীমূতবাহন বলেছেন, "আজকে আমি যা, তার পিছনে রয়েছে তোমার বাবার আর্থিক সাহায্য।"

"কিন্তু সে সাহায্য তো তিনি বিনা স্বার্থে দেননি।" বলেছেন ঈশিতা।

"স্বার্থেক রাজত্বের সঙ্গে যদি রাজকন্যা দিয়ে থাকেন, সেটা তো বাড়তি

লাভ।"

"বাড়তি কমতি বুঝি না। তোমার খ্যাতির বাড়তি দেখতে চাই আমরা। তুমি চাকরি নাও।"

চাকরি নিয়েছিলেন, জীমূতবাহন। সঙ্গে ঈশিতাকেও নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু যে কথাটা আজ বার বার মনে হচ্ছে, বিজ্ঞানের সাধনা কি শুধু খ্যাতির বাড়তির জন্যে? সাফল্য দিয়েই শুধু সাধনার বিচার হবে? এ কেমন করে সত্য হয়?

ইনসেকটিসাইডের জগতে জীমূতবাহনের বৈজ্ঞানিক গবেষণা আন্তর্জাতিক মহলে সমাদর লাভ করেছে। ধীরে ধীরে রসায়নের জগৎ থেকে পতঙ্গের বিস্ময়কর জগতের প্রতি অধিকতর আকর্ষণ অনুভব করেছেন জীমূতবাহন। এটা স্থির বুঝেছেন, রাসায়নিক কীটনাশকের সন্ধান করতে হলে পতঙ্গের রহস্যময় পৃথিবীতেই তাঁকে বিচরণ করতে হবে।

বাধা দেননি ঈশিতা। বরং তাঁকে অনুপ্রেরণাই দিয়েছেন। ওই বয়সে নতুন করে ছাত্র হতে হয়েছে তাঁকে।

এনটমোলজির নতুন ডিগ্রি সংগ্রহ করেছেন জীমূতবাহন। কত কষ্ট করে সংসার চালিয়েছেন ঈশিতা। কারণ সমুদ্রের ওপারে স্বদেশে জগদানন্দ বোস তখন প্র্যাকটিশ ছেড়ে জেলে না ঢুকলেও স্বদেশীদের অর্থসাহায্য করতে ব্যস্ত। জগদানন্দ মেয়েকে লিখেছেন, "আশা করি, তোমরা জীমূতের রোজগারেই চালিয়ে নিতে পারবে।"

তারপর সাফল্য এসেছিল। সাফল্যের জোয়ার যেন জীমূতবাহনের জীবনকে কানায় কানায় পূর্ণ করে তুলেছিল। কীটনাশকের গবেষণায় একদিন গভীর রাত্রে জীমূতবাহন যে সত্যের সন্ধান পেয়েছিলেন, তার থেকেই একটা পেটেন্ট জোগাড় হয়েছিল। সেই পেটেন্টের খবর পেয়ে ইউরোপ আমেরিকার বাঘা বাঘা কেমিক্যাল ফার্ম তাঁর পেছনে ঘোরাঘুরি শুরু করেছিল।

জীমূতবাহন বলতেন, "এইসব টাকা পয়সার ব্যাপারে ঈশিতা তুমিই আমার সেক্রেটারির কাজ কর। হাজার হোক ব্যারিস্টারের মেয়ে তুমি।"

"ঠিক বলেছো।" প্রবল উৎসাহে নিজের দায়িত্ব পালন করেছেন

ঈশিতা।

আর ল্যাবরেটরির নির্জন কক্ষে আরও বেশী সময় কাটিয়েছেন জীমূত-বাহন। এই পৃথিবীতে মানবশিশুর জন্মসংখ্যা প্রতিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই তো মাত্র সেদিন পৃথিবীর লোকসংখ্যা যা ছিল, এখন তার দ্বিগুণ সংখ্যক মানুষ পৃথিবীতে বিচরণ করছে। এই কোটি কোটি মানুষের ক্রমবর্ধমান ক্ষুধার অন্ন কেমন করে জুটবে, যদি না পতঙ্গের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু হয়? পতঙ্গদের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ই তো রাসায়নিক সংগ্রাম—কেমিক্যাল ওয়ারফেয়ার।

সেই সংগ্রামে যে প্রচণ্ড অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন জীমূতবাহন, তা কীসের জন্যে? নিজেকেই মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় জীমূতবাহনের। বিজ্ঞানের নির্মল সাধনাই কি ছিল একমাত্র লক্ষ্য, না অর্থের লোভ?

প্রচুর অর্থ পেয়েছিলেন জীমূতবাহন। দূর-দূরান্তে পৃথিবীর শস্যক্ষেত্রে পতঙ্গের অত্যাচার যত বেড়েছে, কেমিক্যালের বিক্রি ততই ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে, আর ততই মোটা অঙ্কের চেক পেয়েছেন জীমূতবাহন। ঈশিতাও সেই সঙ্গে পরিবর্তিত হতে শুরু করেছেন।

জীমূতবাহনের সংসারে নতুন অতিথিদের আগমন শুরু হয়েছে। একে একে চারটি মেয়ের মা হয়েছেন ঈশিতা। ঈশিতার মধ্যে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা লক্ষ্য করেছেন জীমূতবাহন। যে-ঈশিতা হীরের দুল বিক্রি করে তাঁর যন্ত্র কিনে দিয়েছিলেন, আর মেয়েদের নিয়ে সদাব্যস্ত এই ঈশিতা এক নয়। ঈশিতা বড়বেশী সংসারী হয়ে উঠছেন। পাউণ্ড শিলিং পেন্স আর দুশ্চিন্তামুক্ত ভবিষ্যৎ এই দুটোর মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক আবিষ্কার করছেন তিনি।

প্রতিটি মেয়ের মধ্য দিয়ে রঙীন সব স্বপ্ন দেখেন ঈশিতা সেন। ঈশিতার মধ্যে এতো অ্যামবিশন যে এইভাবে ঘুমিয়ে ছিল তা জীমূতবাহন কোনোদিন বুঝতে পারেননি।

চাকরির সুযোগ এসেছে। লোভনীয় চাকরি। কিন্তু জীমূতবাহন মনস্থির করে উঠতে পারেননি।

ঈশিতা বলেছেন, "কোম্পানিতে বসেও তো তুমি নিজের বিষয়ে কাজ করার সুযোগ পাবে—বরং বেশী সুবিধে হবে।"

"তাই কি?" প্রশ্ন করেছেন জীমূতবাহন।

"কেন নয়?" ঈশিতা বলেছেন, "স্বীকার করি বিশ্ববিদ্যালয়ই এখনও গবেষণার কেন্দ্র, কিন্তু পৃথিবীর বড় বড় কোম্পানিগুলোর ল্যাবরেটরিতে কম কাজ হয় না। ডু পণ্ট, আই-সি-আই, ইউনিয়ন কারবাইড, বেল টেলিফোন, ডুফার ও ফিলিপস্ ল্যাবরেটরিতে কত আশ্চর্য জিনিসের অনুন্ধান চলেছে। আমেরিকান সাইনামাইড, ফাইজার, পার্ক ডেভিস, লেডারলি, স্কুইব, গ্ল্যাক্সো এবং বেয়ারের গবেষণাগারে মানুষের মঙ্গলের এবং ব্যাধিমুক্তির কম প্রচেষ্টা চলছে না।"

অবাক হয়ে যেতেন জীমূতবাহন। বিদেশী পরিবেশে ঈশিতা নিজেকে সব সময় আপটুডেট রেখেছে। "ঈশিতা, তুমি যদি ব্যারিস্টার হতে, তোমার বাবার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারতে।"

ঈশিতা হাসতে হাসতে উত্তর দিয়েছেন, "তার থেকে যদি নার্স হতাম, তা হলে মেয়েগুলোর বেশী যত্ন করতে পারতাম।"

জীমূতবাহন উপলব্ধি করেছেন, ঈশিতার যুক্তিতে কোনো ভুল নেই। "গবেষণাই যদি লক্ষ্য হয়, কোন্ গবেষণাগারে কাজ করলাম সেটা বড় কথা নয়। যেখানে সুযোগ সুবিধা বেশী, সেইটাই আদর্শ জায়গা।"

মোটা মাইনের সেই চাকরির দিনগুলোর কথা জীমূতবাহন আজও মনে করে রেখেছেন। জীমূতবাহন এখন বিশ্বাস করেন, মানুষের ভাগ্যের নদীতেও জোয়ারভাঁটা খেলে। একদিন তাঁর জীবনেও ভরা কোটালের জোয়ার এসেছিল। সম্মান প্রতিপত্তির সঙ্গে সঙ্গে সাফল্যও এসেছিল।

সামান্য কয়েক বছরের মধ্যে ইনসেকটিসাইডের ক্ষেত্রে জীমূতবাহন যা নতুন আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন, তা বহু প্রতিভাবান গবেষক সমস্ত জীবনেও পারেননি। অবশ্য তখন কাজের সুযোগও ছিল যথেষ্ট। কত রকমের কীট-পতঙ্গ কত বিচিত্র রকমের ফসলের সর্বনাশ করছে। কেউ চারা অবস্থায়, কেউ ফলন্ত অবস্থায়, কেউ বীজ অবস্থায়, আবার কেউ গুদামে ক্ষুধার্ত কীটের লক্ষ্যস্থল হয়ে উঠছে। একটা ওষুধে তাদের সবাইকে দমন করা যায় না। আবার পতঙ্গ দমন করতে গিয়ে ফসল অজান্তে বিষময় হয়ে উঠলো, এমন উদাহরণেরও অভাব নেই। তাই প্রয়োজনীয় সাবধানতা

অবলম্বন করতে হয়।

বিশাল খামারে নতুন নতুন ওষুধের ব্যবহার করে জীমূতবাহন ফলাফল লক্ষ্য করতেন। শুধু এইভাবে লক্ষ্য করেই যদি তিনি আরও নতুন আবিষ্কারের পথ খুঁজে পেতেন, তাহলে আজকের পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হতো না জীমূতবাহনকে। এই পরীক্ষা জীমূতবাহন এক জায়গায় দিচ্ছেন না। কত আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। কোথাও বিচারক ঈশিতা। সন্তানদের নিয়ে অভিযোগকারিণীও সে।

আবার কোথাও বৈজ্ঞানিক সমাজের সামনে জবানবন্দী দিচ্ছেন জীমূতবাহন। তাঁরা হাসছেন, তাঁরা বলছেন, "ডক্টর সেন, তুমি ভুল করেছো। যে-লাইনে তোমার নাম হয়েছিল, তাতেই লেগে থাকলে পারতে। কোথায় রাসায়নিক ইনসেক্টিসাইড, আর কোথায় তোমার পোকা দিয়ে পোকা মারার আজব পরিকল্পনা!"

কিন্তু পরীক্ষা দিয়ে যেতেই হবে জীমূতবাহনকে। কালের বিচারশালায় একদিন প্রমাণিত হবে জীমূতবাহন ঠিক করেছিলেন, না ভুল করেছিলেন।

কেমিক্যাল ল্যাবরেটরিতে কাজ করতে করতেই মনের আকাশে নতুন চিন্তার মেঘ জমা হতে শুরু হয়েছিল। ডি ডি টি, এনড্রিন, লিনডেন, প্যারাথিওন, ডায়াজিনন, কেলথেন, ম্যালাথিয়ন, ক্লোরোডেন, টক্সাফিন, হেপ্টাক্লোর, গামা বি এইচ সি ইত্যাদি কেমিক্যালের প্রয়োজন আছে এবং থাকবে। কিন্তু প্রকৃতির রাজ্যেও ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল নিয়মের প্রয়োগ করে আরও আশ্চর্য ফল পাওয়া যেতে পারে। অনন্তকাল ধরে হাতে, মেশিনে এবং উড়োজাহাজ থেকে ওষুধ ছড়িয়ে পতঙ্গের সঙ্গে যুদ্ধ করার কোনো অর্থ হয় না।

কেমিক্যাল ল্যাবরেটরিতে পতঙ্গের মৃতদেহের মধ্যে দাঁড়িয়ে জীমূতবাহন ভেবেছেন, এই সর্বনাশা বিষে মানুষের কত বন্ধু পোকাকেও আমরা হত্যা করছি। যেসব সবুজ ফসলে আমরা ফলের জন্মের অনেক আগে এই বিষ ছড়াচ্ছি, গরুবাছুররা সেই পাতা খাচ্ছে। আজ তাদের দুধের মধ্যেও বিষের লক্ষণ দেখা দিচ্ছে।

রসায়নবিদদের যুক্তি তিনি জানেন। তাঁরা বলেন, 'এর থেকে এইটুকু

প্রমাণ হয়—খুব সাবধানে এই সব বিষ প্রয়োগ করতে হবে।'

জীমূতবাহন তাঁদের সঙ্গে একমত। কিন্তু তাঁর ধারণা, আরও অনেক সহজে, অনেক কম খরচে এবং অনেক নিশ্চিন্তভাবে আমরা ফল পেতে পারি বায়োলজিক্যাল কণ্টোলে।

কত পোকা রয়েছে যারা অন্য পোকা খেতে পেলে আর কিছুই চায় না। আর প্রকৃতির রাজ্যে যে কোটি কোটি স্ত্রী-পতঙ্গ রোজ গর্ভবতী হচ্ছে, তাদের অনেকেই সন্ধান করছে পোষক পতঙ্গকে, যার দেহে প্রসব করে দিয়ে তারা পালাতে পারে। যদি জীমূতবাহনের ক্ষমতা থাকতো তাহলে এইসব প্যারাসাইটদের জীবন নিয়ে এক মহাকাব্য রচনা করতেন।

জীমূতবাহন যখন চাকরি ছেড়ে দেবার প্রস্তাব করলেন তখন ঈশিতা অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। "কী বলছো তুমি?"

একটু বিরক্ত হয়েছিলেন জীমূতবাহন। বৈজ্ঞানিক হিসেবে তিনি কিসের চর্চা করবেন, সেটা নির্বাচনের স্বাধীনতা নিশ্চয় তাঁর আছে। যে-পথে দুটো পয়সা আছে, যে-পথে সহজে সাফল্য আসতে পারে, সবাই সে-পথের যাত্রী হলে চলবে কেন? বেশ তো কেটেছে এতোদিন। যে ক'টা পেটেন্ট আছে, সেগুলো ভাঙিয়ে এখনও কয়েকটা বছর ডাল-ভাতের ব্যবস্থা হবে।

ঈশিতা বলেছিলেন, "তুমি ভুলে যাচ্ছ—একটা নয়, চারটে মেয়ের বাবা তুমি।"

"আমি তো সে দায়িত্ব অস্বীকার করছি না।"

"মুখে করছো না, কিন্তু কাজে করছো। এই চাকরি ছেড়ে তুমি অর্ডিনারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে যেতে চাইছো। তাও সামান্য এক শিক্ষকের পদে।"

জীমূতবাহন বলেছিলেন, "আমার কাজের সুবিধেও তো দেখতে হবে।"

"মানুষ কাজ করে কেন? ছেলেপুলে সংসারের জন্যেই তো?" ঈশিতার সেই প্রশ্নটা আজও জীমূতবাহনের কানে বাজে।

আজ রাত্রে জীমূতবাহন নিজেকে আবার জিগ্যেস করলেন, মানুষ কাজ করে কেন? কেন মানুষ কাজ করে? ছেলে বউকে খাওয়াবার জন্যে, নিজের পেট ভরাবার জন্যে শুধু? শুধু মাইনের লোভে? বেশী টাকার লোভেই কি লোকে আরও পরিশ্রম করে?

ঈশিতা একদিন রাত্রে রেগে গিয়ে বলেছিলেন, "কিছু কিছু লোক আছে যারা নামের লোভে ঘুরে মরে।"

নাম? খ্যাতি? জীবনে এইটাই কি সবচেয়ে বড় কথা? শুধু কি নামের লোভে অমন সুখের মার্কিনী চাকরি ছেড়ে জীমূতবাহন বিলিতী বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ফিরে গিয়েছিলেন?

কিন্তু সেখানেও তো টিকতে পারলেন না তিনি। এতোদিন ঘুরে ঘুরে আবার ভারতবর্ষে ফিরে আসতে হলো তাঁকে।

"কোনো চাকরি না নিয়ে তুমি ইণ্ডিয়ায় যাচ্ছ—এমন সোনার সুযোগ লাথি মেরে সরিয়ে দিচ্ছ তুমি," ঈশিতা কাঁদতে কাঁদতে বলেছিলেন। "তুমি কি আমাদের ভালবাস না?" ঈশিতা জানতে চেয়েছিলেন।

কেন ভালবাসবেন না, নিশ্চয় ভালবাসেন—ঈশিতাকে, তাঁর প্রত্যেকটি মেয়েকে তিনি প্রাণের থেকেও ভালবাসেন। কিন্তু তা বলে, সিকিউরিটি প্রেসে ছাপা গভর্নমেণ্টের কয়েকখানা কারেন্সি নোটের জন্যে তাঁর মন যা চাইছে না, তাই আজন্ম করতে হবে?

ঈশিতা ভাবছেন স্বামীর ঘাড়ে ভূত চেপেছে। গবেষণার ভূত। এমন গবেষণা যা কোনোদিন সফল হবে না। বন্ধুরাও দু'একজন বলেছে, এর নামই বুনো হাঁসের পিছনে ছোটা।

যদি তাই হয়, যদি কোনোদিন হাঁস ধরা না পড়ে, কিছু তথ্য তো পাওয়া যাবে। বুনো হাঁসেরা কেমন দেখতে, তাদের গতি কত এগুলোও তো ভাবীকালের হাঁসধরারা জীমূতবাহনের কাছ থেকে জানতে পারবে। তার কি কোনো দাম নেই?

ঈশিতার কান্নাতেও জীমূতবাহন সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেননি। সরকারী গবেষণাগারে কাজ করার সুযোগ হয়তো পাওয়া যেতো। কিন্তু জীমূত-বাহন স্বাধীনতা চান।

সেই সময় একটা সুযোগ জুটে গিয়েছিল। বন্ধুবর অম্বালাল দেশাই এই জমির ব্যবস্থা করে দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। আর দু'একটা ট্রাস্ট এবং ফাউণ্ডেশন থেকে কিছু চাঁদার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়েছিল।

এই নিয়েই শুরু হয়েছিল নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরি। এর সবটাই

কি তাঁর বোকামির ফল ?

পাশের খাটটা নড়ে উঠলো। ঈশিতা বোধ হয় ঘুমের ঘোরেই পাশ ফিরলেন।

জীমূতবাহনের আজ কি ঘুম আসবে না ? রাত তো অনেক হলো।

জীমূতবাহন রাত্রি জাগতে অভ্যস্ত—কিন্তু সে রিসার্চের কাজে। নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরির বিজলী বাতিগুলো তাঁর সুদীর্ঘ রাত্রি জাগরণের সাক্ষ্য দেবে। কাজের নেশা চাপলে খেয়াল থাকে না। তাছাড়া সব পোকাই তো রাত্রে ঘুমোয় না। রাত্রিই অনেক পোকার দিন। তাদের সকলের সেবাযত্ন করা ল্যাবরেটরির এই বারো-তেরোটা লোকের পক্ষে সম্ভব নয়। অনেক কাজই তাই নিজে করতে হয় এবং নিজে করতেও ভালবাসেন জীমূতবাহন।

এবার হয়তো একটু হাল্কা হতে পারবেন তিনি। অমিতাভ ছেলেটির দায়িত্বজ্ঞান আছে। শেখবার এবং জানবার আগ্রহ তার অসীম। তাঁর নিজের তুলনায় ওর মনটা এখনও অনেক সবুজ আছে। তাই অনেক সমস্যার সহজ সমাধান দেখতে পায় সে, যা জীমূতবাহন নিজে খুঁজে বার করতে পারেননি। অমিতাভকে তিনি মনের মতন করে গড়ে তুলবেন। অতি সামান্য থেকেই পৃথিবীর অনেক বড় বড় প্রতিষ্ঠানের শুরু হয়েছে। একদিন এই নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরিও বড় হয়ে উঠবে—একদা শস্যশ্যামলা এই জন্মভূমির ঋণ কিছুটা শোধ করে যাবেন জীমূতবাহন। অমিতাভকে তিনি এমনভাবে গড়ে তুলবেন যে, যেদিন তিনি থাকবেন না, সেদিনও নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরির কোনো অসুবিধা হবে না।

লোভ। জীমূতবাহন সেন বেশ বুঝতে পারছেন, লোভেই সর্বনাশ হচ্ছে আমাদের। আজ যদি নাপিতের চাকরিতে বেশী পয়সা পাওয়া যায়, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞানের সেরা ছাত্ররাও সেই চাকরির পিছনে ছুটবে। অমিতাভর লোভ নেই, এটা খুব আশার কথা। লোভ না করলেই যে শেষ পর্যন্ত লাভ হবার আশা থাকে, এটা মানুষরা বুঝতে চায় না। তাঁর স্ত্রী অন্ততঃ কিছুতেই তা বুঝবেন না। তবে একটা বিশ্বাস আছে জীমূতবাহনের, টাকার অভাবে কোনো বড় কাজ আটকে যায় না। আজ পর্যন্ত তাঁর

টাকার অভাব হয়নি! নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরির কাজ কোনোদিন আটকে যায়নি, যাবে বলেও মনে হয় না।

ঈশিতা আবার পাশ ফিরলেন। ওঁকে কোনো পোকা কামড়াচ্ছে না তো? ঈশিতার দিকে শঙ্কিতভাবে তাকিয়ে রইলেন জীমূতবাহন। ঈশিতার একটা প্রশ্ন জীমূতবাহনের মোটেই ভালো লাগেনি। অমিতাভর বয়স জিজ্ঞাসা না করলেই জীমূতবাহন খুশী হতেন।

রাত্রি বোধ হয় শেষ হতে চললো। ঘুমের পোকারা আজ ধর্মঘট করেছে। কিংবা ঈশিতাকে দেখেই তারা পালিয়েছে। ঈশিতা তো বেশীদিন থাকেন না।

ল্যাবরেটরির নতুন জমি দেখেই ঈশিতা বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। "পোকা-মাকড়ের পক্ষে এটা আদর্শ স্থান হতে পারে, কিন্তু মানুষের পক্ষে নয়।"

"এখানে অনেক লোক থাকেন—তাঁদের ছেলেপুলেও আছে," জীমূত-বাহন উত্তর দিয়েছিলেন।

"ওসব শুনিয়ে লাভ নেই। আমি মা, চোখের সামনে মেয়েদের গোল্লায় যেতে দিতে পারবো না। একটু বড় শহরে থেকে বিজ্ঞানের কি কোনো উন্নতি করা যায় না? তোমার সন্তানদের ওপর তোমার কি কোনোরকম দায়িত্ব নেই?" শ্লেষের সঙ্গে জিগ্যেস করেছিলেন ঈশিতা।

জীমূতবাহনের কাছ থেকে কোনো উত্তর না পেয়ে, ঈশিতা শেষ পর্যন্ত বলেছিলেন, "বেশ, তুমি এখানে পতঙ্গ প্রতিপালন করো, আর আমি কলকাতায় গিয়ে তোমার সন্তান পালন করি!"

দুটো সংসার না চালাতে পারলেই ভাল হতো। কিন্তু ঈশিতাকে সে কথা মুখ ফুটে বলা যায় না। "আমার বাবা বেঁচে থাকলে, তোমার কাছে পয়সার কথাও তুলতাম না। মেয়ের পড়ার খরচ দিয়েছেন, জামাই-এর খরচ জুগিয়েছেন, নাতনীদের খরচও দিতেন খুশী হয়ে," ঈশিতা বলেছিলেন।

একটু চা খেতে পারলে মন্দ হতো না। ভোর হতেও দেরি নেই। তারপর একবার ল্যাবরেটরির দিকে যেতে হবে। কতকগুলো বীটলকে কনস্ট্যান্ট টেম্পারেচারে রাখার দরকার ছিল, চেম্বারের এয়ারকণ্ডিশন মেশিনটা ঠিক রেগুলেট করে এসেছিলেন কিনা মনে পড়ছে না।

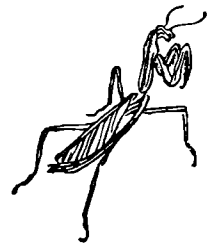

চায়ের পেয়ালার আওয়াজেই বোধ হয় ঈশিতার ঘুম ভেঙে গেল। উঠে পড়ে চোখ মুছতে মুছতে বললেন, "ঘুমোওনি?"

"ঘুম এলো না কিছুতেই," জীমূতবাহন উত্তর দিলেন।

"তার ওপর চা খাচ্ছ। ঘুমের কোনো সম্ভাবনাই থাকবে না।"

জীমূতবাহন বললেন, "ভোর হয়ে এসেছে।"

বিছানা থেকে উঠে পড়ে ঈশিতা বললেন, "দেখি তোমার জ্বরটর হয়নি তো?"

জীমূতবাহনের গায়ে হাত দিলেন ঈশিতা। অনেকদিন পরে একটা উষ্ণ স্পর্শ পেলেন জীমূতবাহন। ঈশিতা বললেন, "না, গা তো বরফের মতো ঠাণ্ডা।"

জীমূতবাহন কিছুতেই উত্তর দিলেন না। ঈশিতা তাঁকে সরিয়ে দিয়ে নিজেই চা করতে লাগলেন। বললেন, "নিজে না করে আমাকে ডাকলে পারতে!"

"তুমি ঘুমচ্ছিলে, তোমার ঘুমটা আমার জন্যে ভেঙে গেল।"

"আর ভদ্রতা করতে হবে না," এই বলে ঈশিতা নিজের কাজে মন দিলেন।

ঈশিতা নিজেও একটু চা নিয়েছে। "বাইরে গিয়ে বসবে? জীমূত-বাহনের প্রস্তাব মতো ঈশিতা দরজা খুলে বাইরে বেরোতে গিয়ে চিৎকার করে উঠলেন। অন্ধকারে একটা শামুকের ওপর পা দিয়ে ফেলেছেন তিনি।

দ্রুত বেরিয়ে এসে জীমূতবাহন মাড়িয়ে-ফেলা শামুকটাকে হাতে তুলে নিলেন। "আহা একটু দেখে পা ফেললে না—বেচারা রোমিওকে শেষ করে দিলে?"

"আমাকে যদি কামড়ে দিত?" ঈশিতা বিরক্তভাবে বললেন। "তোমার কাছে শামুকটাই বড় হলো?"

"শামুকরা কামড়ায় না, ঈশিতা। ও-যে আসবে আমি জানতাম। ওর জুলিয়েটকে এখানে এনে রেখেছি। গন্ধ শুঁকে শুঁকে ঠিক আসতে পারে কিনা, তাই পরীক্ষা করে দেখছিলাম।"

ঈশিতা বিরক্তকণ্ঠে বললেন, "ধন্য তোমাদের গবেষণা। তবে শামুকরা পর্যন্ত শম্বুকগতিতে যা করে, তোমার মত ব্যস্তবাগীশ মানুষরা তাও করে না। কতকাল কলকাতায় যাওনি বলো তো?"

জীমূতবাহন বললেন, "কী করে যাই? কার হাতে এতোগুলো প্রাণের দায়িত্ব ছেড়ে যেতে পারি বলো তো?"

ঈশিতা বললেন, "কার হাতে তোমার সন্তানের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে এখানে নিশ্চিন্তে বসে আছো?"

এই ভোরবেলাতেই বোধ হয় অশান্তি আরম্ভ হলো। জীমূতবাহন বললেন, "তোমার ভরসায় ঈশিতা। তুমি তো আমার সহধর্মিণী। স্ত্রীর সহায়তা ছাড়া আজকের দিনে পৃথিবীতে কোনো বড় কাজ করা কি সম্ভব?"

"তোমাকে একটা কথা বলবো?" ঈশিতা প্রশ্ন করেন।

"নিশ্চয়।"

"সেই বিয়ের দিন থেকেই তো সহযোগিতার কথা চলছে। মরতে আর ক'টা দিন বাকি বলো তো? কোনোদিন কি এর শেষ হবে?"

বিব্রত বোধ করেন জীমূতবাহন। আস্তে আস্তে বললেন, "ঈশিতা, তুমি হয়তো ভয় পাচ্ছো, ভাবছো আমাদের এই নতুন রিসার্চ কোনোদিন সফল হবে না। জোর করে কেউ কোনোদিন কিছু বলতে পারে না। তবে এইটুকু জেনো, কখনও কখনও অল্পেই ফল পাওয়া যায়, আবার কখনও বহু সময় অপেক্ষা করতে হয়। এর আগে অল্পে ফল পেয়েছি, পেটেন্ট রয়ালটির টাকা আজও আসছে। এবার অপেক্ষা করতে হচ্ছে।"

ঈশিতা জানালেন, "সুপ্রিয় বলছিল, যেভাবে আমেরিকায় গবেষণা হচ্ছে, তাতে তোমার পেটেন্ট আর কতদিন টাকা আনবে বলা শক্ত।"

জীমূতবাহন গম্ভীর হয়ে বললেন, "হুঁ।"

ঈশিতা বললেন, "তখন কী হবে ভেবে দেখেছো? দু'খানা ঘরের জন্যেই আমাদের তিন শ' টাকা ভাড়া দিতে হচ্ছে। আমার মোটর গাড়িটার অবস্থা কী হয়েছে দেখেছো? পড়াশোনার জন্যে আজকাল কত খরচ হয় খবর রাখো? যেসব মেয়ে ছোটবেলায় কষ্টের মধ্যে মানুষ হয়, তাদের মন কখনও হেল্‌দি হয় না।"

জীমূতবাহনের ইচ্ছে হলো জিগ্যেস করেন, এই মূল্যবান তথ্য ঈশিতা কোথা থেকে সংগ্রহ করলো। কিন্তু পারলেন না।

ঈশিতা বললেন, "জগদীশদার সঙ্গে দেখা হলো সেদিন। উনি বলছিলেন, এখনও ফিরে যাবার সময় আছে। ইণ্ডিয়াতে বড় বড় কেমিক্যাল কোম্পানিরা আসতে শুরু করেছে। তোমার মতো লোক পেলে তারা লুফে নেবে। বরং অবসর সময়ে ছোটখাট গবেষণা কোরো কিছু।"

জীমূতবাহন চায়ের কাপটা শেষ করে ফেলেছেন। বললেন, "এবার কতদিন থাকবে?"

"কিছুই ঠিক করিনি। তবে কয়েকদিন থাকবার ইচ্ছে আছে।"

"মদালসাকে নিয়ে এলে না কেন?" জীমূতবাহন জিগ্যেস করেন।

"ইয়ুথ প্রোগ্রামে আমেরিকায় যাবার কথা হচ্ছে। একটু ধরাধরির ব্যাপার আছে। তুমি মুখ খুললে এখনই হয়ে যায়।"

"সেটা কি ভাল ঈশিতা? আমার মেয়েকে বিনা পয়সায় বিদেশ ঘুরিয়ে আনবার জন্যে আমি অন্য লোককে বলবো?"

"তবে কি পাড়ার লোকে বলবে? তুমিও যখন প্রথম বিলেত গিয়েছিলে, নিজের পয়সায় যাওনি।" ঈশিতা উত্তর দিতে দ্বিধা করলেন না।

জীমূতবাহন বললেন, "এবার আমি উঠি। যদি ফিরতে দেরি হয়, আমার জন্যে অপেক্ষা কোরো না। খেয়ে নিও।"

ঈশিতা বললেন, "কাউকে দিয়ে মদালসাকে টেলিগ্রামটা পাঠিয়ে দিও —ম্যাক্সফ্যাক্টর র‍্যাচেল কালারের হবে।"

"আচ্ছা।" জীমূতবাহন উত্তর দেন।

"যাচ্ছো কোথায়? আরও কথা আছে। সুস্মিতা চাইল্ড এক্সপেক্ট করছে," ঈশিতা স্বামীকে জানালেন।

"তাই নাকি! কবে?"

"স্টর্ক আসতে আরও মাস চারেক দেরি।'

"তাহলে এখানে চলে আসতে বলো না। শহরে ডাক্তার গোড়বলে রয়েছেন। মিডওয়াইফরিতে খুব ভাল হাত, আমার বন্ধুও বটে।"

"ওদের তো এখনও ভীমরতি ধরেনি। দেবকুমার উডল্যাণ্ড নার্সিং হোমে এয়ারকণ্ডিশনড্ সুইট বুক করে রেখেছে। অফিস থেকে সব খরচ দেবে।"

দেবকুমার সরকার, জীমূতবাহনের আর একটি কৃতী ছাত্র। কৃতী নয়, কৃতী হতে পারতো। কাজ শিখতে এসেছিল, কিন্তু নজর পড়ে গেল ঈশিতার। অতএব সুস্মিতা সেন সুস্মিতা সরকারে রূপান্তরিত হলো। ভাল জামাই পেলেন জীমূতবাহন; কিন্তু হারালেন একটি ভাল ছাত্রকে।

ঈশিতাকে কে বোঝাবে, একটা ভাল বৈজ্ঞানিক মন পেতে অনেক খোঁজাখুঁজি করতে হয়। ভাল ছাত্রের বদলে টেরিলিনের সুট পরা আর একটি অফিসার জামাই পেয়েছেন জীমূতবাহন। নাকের বদলে নরুন পেয়েছেন নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরির জীমূতবাহন সেন।

ঈশিতা ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। "কই, কিছু বললে না তো?"

"আমাদের এখানে এয়ারকণ্ডিশনড্ ঘর নেই।" জীমূতবাহন দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করলেন।

"অসুস্থ মানুষের জন্যে নেই, কিন্তু সুস্থ পোকাদের জন্যে আছে," ফোড়ন দিলেন ঈশিতা।

বিশ্রী চেহারা। তার ওপর বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচির মতো দেহের থেকে লম্বা ল্যাজ। শরীরের মাপ দেড় ইঞ্চি কিন্তু ল্যাজটা তিন ইঞ্চি। ল্যাজ নয়। ওভিপজিটর—ডিম পাড়ার যন্ত্র। নামটি মিষ্টি—মেগারহিসা। বেয়ারা নামটা মনে রাখতে পারে না, বলে মেহেরউন্নিসা।

মেহেরউন্নিসা সন্তানসম্ভবা। ল্যাবরেটরিতে দাঁড়িয়ে অমিতাভ ভাবী মায়ের কীর্তি দেখছিল। অনেকে বুঝতে পারে না, ওই লম্বা নল দিয়ে কী হবে। কিন্তু অমিতাভ জানে, অপ্রয়োজনে প্রকৃতি কিছুই সৃষ্টি করে না। সব কিছুরই প্রয়োজন আছে।

একটা পুরনো কাঠের টুকরো আঁতুড় ঘরে রেখে গিয়েছিল অমিতাভ। বরাবর সেটা ফুটো করেছে মেহেরউন্নিসা। কিন্তু ডিমপাড়া হয়নি। হবে কী করে? ওটা যে শুধু কাঠ। ওই কাঠ ফুটো করার শুঁড় দিয়ে সে অন্য এক পোকার সন্তানকে অনুসন্ধান করছে।

সৃষ্টিকর্তা ভদ্রলোকটির খামখেয়ালিতে বিস্মিত হতে হয়। তাঁর সৃষ্টিতে সর্বদা যে তিনি রুচিজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন, এ-কথাও বলা যায় না। না হলে এ-কেমন কথা, গর্ভিণী মেগারহিসা এক ধরনের ঝিল্লীপক্ষ পতঙ্গের সন্তান ছাড়া আর কারুর ওপর প্রসব করবে না। হর্নটেল পিজিয়নের শূক-কীটরা কাঠের মধ্যে বড় হয়ে ওঠে, ইতিমধ্যে কাঠের গুঁড়ো খেয়ে মানুষ হয়। আর একটা কাঠের টুকরো এবার মেহেরউন্নিসার কাছে এগিয়ে দিল অমিতাভ। আশ্চর্য এদের সন্ধান শক্তি। পোষকের খোঁজ পাওয়া গিয়েছে এটা বুঝতে মেগারহিসার এক মুহূর্তও দেরি হলো না। কাঠফুটো করার কাজ শুরু হয়ে গেল। প্রকৃতির কাজে কোনো তাড়াহুড়ো নেই। সারাদিন ধরে ফুটো করে সে হয়তো হর্নটেল পিজিয়নের শূককীটের সন্ধান করবে,

তারপর তার দেহে প্রসব করে নিশ্চিন্ত হবে।

পতঙ্গ জগতের বিচিত্র রহস্যের স্বাদ যে পেয়েছে, তার পক্ষে এর থেকে বেরিয়ে যাওয়া যে খুব শক্ত, তা অমিতাভ বুঝতে পারে। বিকেলবেলায় অমিতাভ যখন আবার আসবে, তখন হয়তো দেখবে ডিমপাড়া হয়েছে, কিন্তু কাঠের ফুটো থেকে ল্যাজটা বার করে নেওয়া সম্ভব হয়নি। মরণ ফাঁদে প্রাণ হারিয়েছে মেহেরউন্নিসা। তার সন্তানরা ততক্ষণ অন্য শ্রেণীর কতকগুলো শূককীটের মাংস মহানন্দে ভোজন করতে শুরু করেছে। মায়ের সম্বন্ধে তাদের কোনো আগ্রহ নেই। পতঙ্গের রাজত্বে অনেক শান্তি আছে।

হর্নটেল পিজিয়ন মানুষের তেমন কিছু ক্ষতি করে না। এদের নিয়ে বৈজ্ঞানিক চিন্তার তেমন প্রয়োজন আপাতদৃষ্টিতে নেই। কিন্তু জীমূতবাহন যে স্বপ্ন দেখছেন, তাঁর গবেষণার চরম লক্ষ্য যা, তাতে মেহেরউন্নিসা হয়ত কিছু সাহায্য করতে পারে।

এই ক'বছর নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরিতে যা কাজ হয়েছে, তার পরিমাণ অবিশ্বাস্য বলা চলতে পারে। কত রকম পতঙ্গের প্রকৃতি যে জীমূত-বাহন অনুধাবন করে যাচ্ছেন!

পিঠে হাত পড়তেই পিছন ফিরে তাকাল অমিতাভ। জীমূতবাহন এসে গিয়েছেন।

"কী ভাবছো?" জীমূতবাহন প্রশ্ন করলেন।

একটু লজ্জা পেয়ে গিয়েছিল অমিতাভ। তবু কোনরকমে বললে, "সত্যি আশ্চর্য জগৎ। ভাবছি, পতঙ্গদের জীবনের কতটুকু আমরা জানি!"

জীমূতবাহন এবার নিজের এলাকায় এসেছেন। যে জগতে এলে বাইরের সব দুঃখ, সব না-পাওয়ার বেদনা সম্পূর্ণ ভুলে যাওয়া যায়। অদৃশ্য কোনো অ্যানেসথেসিয়ায় সাংসারিক দুঃখের অনুভূতিগুলো অবশ হয়ে আসে।

জীমূতবাহন তাঁর ল্যাবরেটরির এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন আর ভাবেন, এর সবই কি ব্যর্থ হবে? তাঁর এত পরিশ্রমের কোনো মূল্য থাকবে না? কিন্তু জীমূতবাহন বেশ ভরসা পাচ্ছেন। তাঁর মনের ভেতর থেকে কে যেন বলছে, একদিন বড় কিছু, বেশ বড় কিছুর

সন্ধান পাওয়া যাবে এই ল্যাবরেটরির চার দেওয়ালের মধ্যে। তখন পৃথিবীর হিসেবী লোকরা বুঝবে, কেন জীমূতবাহন সেন অর্থ এবং প্রতিপত্তির লোভ টেম্‌স ও হাডসন নদীর জলে বিসর্জন দিয়ে এই স্বেচ্ছানির্বাসনে এসেছিলেন।

অমিতাভর পিঠে হাত দিয়ে জীমূতবাহন বললেন, "একবার টাইফয়েডে ঘায়েল হয়ে বেশ কিছুদিন বিলেতের হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল। সেই সময় প্লিনির লেখা রোমের ন্যাচারাল হিস্ট্রি পড়েছিলাম। মাত্র ১৯০০ বছর আগেকার কথা। কিন্তু তখনও রোমানদের কী ধারণা ছিল জান? ভারতবর্ষের উত্তর প্রান্তে এক রকমের পিঁপড়ে সোনার টুকরো জোগাড় করে—আর কোথাও সোনা হয় না।

"প্লিনি লিখছেন—এই পিঁপড়ের আকার রাক্ষুসে—এক একটা নিশরীয় নেকড়ে বাঘের মতো। শীতকালে এই পিঁপড়েরা স্বর্ণরেণু সংগ্রহ করে। গ্রীষ্মকালে ভারতবর্ষের দুর্দান্ত গরম থেকে বাঁচবার জন্যে পিঁপড়েগুলো যখন গর্তের মধ্যে আশ্রয় নেয়, তখন ইণ্ডিয়ানরা এই সোনার গুঁড়ো নিয়ে পালিয়ে আসে এবং দেশ-বিদেশে বিক্রি করে।"

জীমূতবাহন বললেন, "তখনকার লোকদের ধারণা ছিল, পোকাদের দেহে রক্ত থাকে না এবং জমানো শিশিরকণা থেকে প্রজাপতির জন্ম হয়!"

কথা বলে জীমূতবাহন যে বিশেষ আনন্দ পাচ্ছেন, তা অনুভব করতে অমিতাভর দেরি হয় না। অমিতাভ বুঝতে পারে, সন্তানের স্নেহই তার ওপর বর্ষণ করছেন জীমূতবাহন। একটা লোকের দরকার ছিল তাঁর যার সঙ্গে আলোচনা করতে পারেন, প্রশ্ন করতে পারেন, তর্ক করতে পারেন, রসিকতা করতে পারেন, আবার প্রয়োজন হলে ঝগড়াও করতে পারেন জীমূতবাহন।

জীমূতবাহন বললেন, "আমি যার সন্ধানে রয়েছি, অনেকে তা শুনলে পাগল বলবে আমাকে। বাইরে বলতে সাহস করি না। যখন কোথাও যাই, লোকে জিজ্ঞাসা করে কিসের গবেষণা করছেন, তখন বলি পতঙ্গদের জীবন, বিশেষ করে যেসব পতঙ্গ কৃষির ক্ষতি করে তাদের সম্বন্ধে ভালভাবে জানবার চেষ্টা করছি। এ-কাজ ভারতবর্ষের কোথাও যে হচ্ছে না, এমন নয়। প্রতি প্রদেশে কৃষি বিভাগের সঙ্গে এনটমোলজিস্ট বা পতঙ্গ-বিদ্‌রা রয়েছেন। পুসা ইনস্টিটিউটেও অনেক মূল্যবান কাজ হচ্ছে।"

একটু থেমে, জীমূতবাহন ছোট ছেলের মতো পরম উৎসাহে প্রিয় সহকারীকে বললেন, "তোমাকেই শুধু বলছি, আমার ধারণা, কোনো একদিন আমরা হয়তো এমন কোনো বর্ণসংকর প্যারাসাইট পতঙ্গের সৃষ্টি করতে পারবো যা যে-কোনো শত্রুপোকার উপর ডিম পেড়ে দিতে আপত্তি করবে না। এখন যে প্যারাসাইটে আমরা সব সময় তেমন কাজ পাই না, তার প্রধান কারণ, এক একটা পতঙ্গের জন্যে এক একটা প্যারাসাইট। গরীব চাষীর পক্ষে সে-সবের খবর রাখা সম্ভব নয়। আর কবে কোন্ পতঙ্গ আসবে, তার জন্যে পঁচিশ-ত্রিশ হাজার রকমের প্যারাসাইট ল্যাবরেটরিতে সবসময় প্রস্তুত রাখাও সম্ভব নয়।"

অমিতাভ মাস্টারমশাইয়ের মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। মাস্টারমশাই বললেন, "লোকে হয়তো এখনই আমাকে রাঁচী পাঠাতে চাইবে। কিন্তু যদি কোনোদিন সর্বত্র-প্রসবিনী প্যারাসাইট সৃষ্টি করতে পারি, তখন লোকে স্পেশাল ট্রেনে রাঁচী গিয়ে আমাকে মালা দেবে। এমনও তো হতে পারে, আমাদের তৈরি ডিমগুলো শূককীট অবস্থায় শুধু পোষকের জীবননাশ করবে তাই নয়; বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে পতঙ্গ খেয়েই বেঁচে থাকবে।

"তাছাড়া হাইপার-প্যারাসাইটের সমস্যা আছে। ভাল করতে গিয়ে মন্দ হয়ে যায়—কারণ প্যারাসাইটের গায়ে ডিম পেড়ে দেয়, এমন প্যারাসাইটও আছে। তারা হয়তো চাষের ক্ষতি করে। প্যারাসাইটের-প্যারাসাইটের-প্যারাসাইটও রয়েছে কতো! বিলেতে আমরা একটা ছড়া মুখস্থ করেছিলাম:

Big fleas have little fleas,
Upon their backs to bite them.
The little fleas have lesser fleas,
And so ad infinitum."

অমিতাভ বুঝতে পারে, জীমূতবাহনের সমস্ত দেহ দিয়ে বিদ্যুতের সঞ্চার হচ্ছে।

অমিতাভ যেন জীমূতবাহনের সহপাঠী বন্ধু। তার হাত দুটো ধরে

ঝাঁকানি দিয়ে জীমূতবাহন বললেন, "প্যারাসাইটদের অসুবিধা, একটা শূককীট একটার বেশী পতঙ্গের বিনাশ করতে পারে না। এবং তাও সময় লাগে। কোটি কোটি গর্ভিণী প্যারাসাইট সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। অথচ পতঙ্গভুক পতঙ্গরা অর্থাৎ প্রিডেটরগুলো ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্যে অসংখ্য পতঙ্গ খেয়ে ফেলতে পারে। এরা বাঁচেও অনেকদিন।"

একটু থামলেন জীমূতবাহন। আবার শুরু করলেন, "অর্থাৎ কিনা পতঙ্গভুক এবং পরজীবী পতঙ্গের মধ্যে ঘটকালি করে যদি প্যারাসিটিক প্রিডেটর বংশধর সৃষ্টি করতে পারি—তাহলে পৃথিবীর কৃষিবিজ্ঞানে এক নবযুগের সূচনা হবে।"

জীমূতবাহনের মুখ উৎসাহে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। কী ভেবে আবার স্তিমিত হয়ে গেলেন। ধীরে ধীরে বললেন, "আমাদের সামনে অনেক বাধা। বেশীর ভাগ লোকের কাছে এটা একটা বৈজ্ঞানিক গাঁজাখুরি। কিন্তু পৃথিবীতে অনেক গাঁজাখোর বৈজ্ঞানিক শেষ পর্যন্ত সিদ্ধিলাভ করেছে।"

অবাক হয়ে গিয়েছিল অমিতাভ! জীমূতবাহন যেন কোনো মন্ত্রশক্তিতে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে উঠেছেন! অমিতাভ বললে, "আপনি বিশ্ব খাদ্য এবং কৃষিসংস্থার ডিরেক্টর জেনারেল বি আর সেন মশাইকে একথা জানাননি?"

"না, কাউকে জানাইনি। পৃথিবীর লোকরা এখন হাসতে পারে। কিন্তু তাদের হাসতে দাও। এর আগেও তারা অনেকবার হেসেছে, কিন্তু গ্যালিলিও ও কোপার্নিকাসের তাতে কিছু এসে যায়নি।"

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে জীমূতবাহন বললেন, "ওহো আমাকে একবার মাঠে যেতে হবে। উইটিপিতে কিছু কাজ আছে।"

উইটিপিটা দূর থেকে দেখলে একটা ছোট্ট পাহাড় মনে হবে। "উইটিপিটা করেছেন কেন?" অমিতাভ জিগ্যেস করে।

"খেয়াল বলতে পারো। উইপোকার জীবন আমাকে মুগ্ধ করে। তেমন সুবিধে পেলে ওরাই একদিন পৃথিবী শাসন করবে। উত্তর অস্ট্রেলিয়ায় একবার একটা উইটিপি দেখেছিলাম, দুশো ফুটেরও বেশী উঁচু। আর আমাদের মহাভারতে আছে এক ঋষির কথা—মহর্ষি চ্যবন বোধ হয়। তপস্যা করতে করতে যাঁর ওপর উইটিপি জন্মে গিয়েছিল। তাছাড়া বাল্মীকি

মুনির কথা তো জানই। মহাভারতে কত যে বল্মীকের উল্লেখ পেয়েছি।"

"আপনি মহাভারত পড়েন?"

"যখন আমার আর কিছুই ভাল লাগে না, তখন মহাভারত পড়ি। আমার মায়ের স্মৃতি কয়েকখণ্ড কালী সিংহের মহাভারত আছে।" জীমূত-বাহন বলতে যাচ্ছিলেন, আমার বাড়িতে এসো তোমাকে মহাভারত দেখাবো। কিন্তু শেষ মুহূর্তে ব্রেক কষলেন। না, তিনি মোটেই চান না ঈশিতার সঙ্গে অমিতাভর দেখা হয়। যত কম সাক্ষাৎ হয়, ততই মঙ্গল।

"ভাল কথা, গতকাল তোমাকে খুব কষ্ট দিয়েছি। স্টেশন পর্যন্ত ড্রাইভ করা—" জীমূতবাহন বললেন।

"কী যে বলেন! মিসেস সেনের সঙ্গে আলাপ করে খুব খুশী হলাম। চমৎকার মহিলা।"

"তোমরা আলাপ করে নিয়েছো তাহলে।"

"উনি জগদানন্দ বোসের মেয়ে, এটাও জানা ছিল না," অমিতাভ উত্তর দেয়।

"জগদানন্দ বোসের নাম শুনেছো?"

"ওঁর নাম শোনেনি এমন লোক বাংলা দেশে কে আছে?"

মনে মনে একটু বিরক্ত হলেন জীমূতবাহন। যে কোনো লোকের সঙ্গে পরিচয় হলে প্রথম সুযোগেই ঈশিতা তার পিতৃপরিচয় জানিয়ে দেয়। জগদানন্দ বোস বড় ছিলেন নিশ্চয়, কিন্তু তাঁর মেয়েরাই তাঁকে সর্বত্র ছোট করে বেড়াচ্ছে। জগদানন্দ বোস আর সব পেরেছিলেন, কিন্তু মেয়েদের মানুষ করতে পারেননি!

নিজের চিন্তায় নিজেই চমকে উঠলেন জীমূতবাহন। এ-কথা যদি ঘুণাক্ষরে জানতে পারে ঈশিতা! কাউকেই মুখে বলেননি—কিন্তু জীমূত-বাহনের মুহূর্তের জন্যে মনে হলো তাঁর গোপন অভিমতটা ফাঁস হয়ে গিয়েছে।

শুধু জগদানন্দ বোস কেন, পৃথিবীর অনেকেই তাঁদের মেয়েদের মানুষ করতে পারেননি। তিনি নিজে? জীমূতবাহন সেনও এই বিষয়ে একশোর মধ্যে শূন্য পাবেন। হোপলেস্‌লি খারাপ করেছেন পিতৃত্বের এই পরীক্ষায়। কিন্তু বড় বেশীক্ষণ নীরব হয়ে রয়েছেন জীমূতবাহন। অমিতাভকে প্রশ্ন

করলেন, "তুমি এখন কী করবে?"

"আপনি যা বলেছিলেন, ল্যাবরেটরিতে কিছু তুলো গাছের পোকা স্পটেড বোলওয়ার্ম তৈরির চেষ্টা করবো।"

"বেশ বেশ, তাই করো। পোকালাগা তুলোর ফল এসেছে?"

"হ্যাঁ, মিস দেশাই পাঠিয়ে দিয়েছেন একটা লোকের হাতে।"

"ল্যাবরেটরিতে ওদের বংশবৃদ্ধি করানো বেশ কঠিন কাজ," জীমূতবাহন বললেন।

অমিতাভ ল্যাবরেটরির একটা ছোট্ট কুঠুরির মধ্যে ঢুকে গেল। জীমূতবাহন তা দেখে বেশ ভরসা পেলেন।

কিন্তু জীমূতবাহনের মাথাটা হঠাৎ একটু ঘুরে উঠলো। হঠাৎ মনে হলো সুপ্রিয়, তাঁর এককালের প্রিয় সহকারী সুপ্রিয় চৌধুরীই যেন কেবিনে ঢুকে গেল। না না, এসব কী ভাবছেন জীমূতবাহন? হয়তো সুপ্রিয়র হাঁটার সঙ্গে অমিতাভর হাঁটার একটা সাদৃশ্য আছে এই পর্যন্ত। কিন্তু মাথাটা ঘোরা এখনও বন্ধ হয়নি বোধ হয়। আরও অতীতে তাঁর দৃষ্টি ফিরে যাচ্ছে—সুপ্রিয় নয়, দেবকুমার বোধ হয়। দেবকুমার সরকার—তাঁর প্রিয় ছাত্র ও সহকারী। না না, দেবকুমার নয়, সুপ্রিয়ও নয়, ঠিক যেন অজয় বসু।

প্রয়োজনীয় কাজকর্ম ফেলে দিয়ে এখন কি আবার অজয় বসুর কথাও জীমূতবাহনকে ভাবতে হবে—কেমন করে একটা আদর্শের তিলে তিলে মৃত্যু হয়েছিল? না, তিলে তিলে মৃত্যু নয়—বৃহদারণ্য বনস্পতি বজ্রাঘাতে মুহূর্তে মৃত হয়েছিল। জীমূত মানে তো মেঘ। জীমূতবাহন ইন্দ্রই তো বজ্রের দেবতা। তবে তিনিই কি এদের সর্বনাশের কারণ হয়েছিলেন? তাই বা হয় কী করে! মিথ্যা। সাক্ষ্যপ্রমাণ দিয়ে জীমূতবাহন বুঝিয়ে দিতে পারেন তাঁর কোনো দোষ ছিল না।

কিন্তু এসব কী ভাবছেন জীমূতবাহন? ল্যাবরেটরি থেকে বেরিয়ে জীমূতবাহন ক্ষেতের মধ্য দিয়ে টার্মিটরিয়ামের দিকে হাঁটতে শুরু করেছেন। আকাশের দিকে তাকালেন জীমূতবাহন। কই, একফোঁটা মেঘ নেই কোথাও। তবে শুধু শুধু ভয় পেয়ে গেলেন কেন তিনি? বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হয় কি?

না চাইলে পৃথিবীতে কিছু পাওয়া যায় কি ?

দাবি না করলে কেউ কিছু ছাড়তে চায় না। জগদানন্দ বোসের মত মানুষ দিয়ে সংসারটা তৈরি নয়। তিনি না চাইতে দিতেন। সাতটি সন্তানের সবরকম সম্ভাব্য প্রয়োজনের দিকে তাঁর কী সজাগ দৃষ্টি ছিল। বাবার কথা ভাবতে ভাবতে ঈশিতার চোখ দুটো ছলছল করে উঠলো। কতদিন আগে বাবা মারা গিয়েছেন ; কিন্তু এখনও তাঁর স্নেহের কথা মনে পড়লে ঈশিতার ডুকরে কাঁদতে ইচ্ছে করে।

জীমূতবাহনের বাংলোয় বসে স্মৃতি রোমন্থন করলেও ঈশিতার হাত দুটো বেকার বসে ছিল না। দুটো উলের কাঁটা দ্রুতবেগে টানাপোড়েন করতে করতে সোয়েটার বুনে চলেছিল। বড় নাতনী ঐন্দ্রিলার জন্মদিন দ্রুত এগিয়ে আসছে, আর সময় নষ্ট করলে চলবে না।

ঐন্দ্রিলাকে সামান্য একটা সোয়েটার দিচ্ছেন তার দিদিমা। আর তার মা'র জন্মদিনে জগদানন্দ কী না করতেন। এতো কাজের মধ্যেও প্রিয়ংবদার জন্মতারিখটা তিনি ঠিক মনে রেখে দিতেন। ড্রাইভারকে ডেকে চুপি-চুপি নাতনীর হাত ধরে বেরিয়ে পড়তেন। হোয়াইটওয়ে লেডলো, আর্মি নেভি স্টোর কিংবা হল অ্যাণ্ডারসন উজাড় করে বাড়ি ফিরতেন।

ঈশিতা নিজেই বাবাকে বকেছেন। কিন্তু বাবা শোনেননি। হেসে বলতেন, "ওরা যখন বড় হবে, তখন তো আর বেঁচে থাকবো না। ছোটবেলার উপহারের একটু-আধটু স্মৃতি আবছা ভেসে উঠে ওদের দাদুর কথা মনে করিয়ে দেবে।"

অতবড় ব্যারিস্টার ছিলেন, সবার মনের কথা কত সহজে বুঝতে পারতেন। সত্যি, প্রিয়ংবদা দাদুর উপহারের কথা মনে রেখেছে। আর প্রিয়ংবদার মেয়ে তার দাদু সম্বন্ধে কী মনে রাখবে ? নিজের মেয়েরই খবরা-খবর রাখেন না জীমূতবাহন, তায় নাতনী !

রিস্টওয়াচের দিকে তাকিয়ে ঈশিতা ডাক দিলেন, "বেয়ারা।"

হরিমোহন বেয়ারা কথাটা মোটেই পছন্দ করে না। সবাই জানে ল্যাবরেটরিতেই সে কাজ করে। ওইভাবে ডাকলে একটু দুঃখ হয়। কিন্তু মেমসায়েবকে সে একটু ভয়ও পায়, কিছু বলতে সাহস করে না।

মেমসায়েবের সামনে এসে হরিমোহন সেলাম করলে। "সেন সায়েবকে খবর দিয়েছো?" ঈশিতা জিগ্যেস করেন। এই এক কাজ হয়েছে তাঁর। কোথাও কোনো ডিসিপ্লিন নেই, প্রতিবার খাবার সময় ডেকে পাঠাতে হবে।

প্রায় আধঘন্টা আগে বিকেলের চায়ের নোটিশ পাঠিয়েছেন ঈশিতা। কিন্তু কোথায় জীমূতবাহন?

বিরক্ত ঈশিতা বললেন, "ঠিকভাবে বলেছো তো?"

"হ্যাঁ, মেমসায়েব।"

উল বোনা বন্ধ রেখে ঈশিতা বাঁ হাতের মণিবন্ধটা একটু চুলকে নিলেন। তারপর গম্ভীরভাবে বললেন, "চায়ের জল চাপানো হয়েছে তো?"

হরিমোহন জানালে, "উনুনে এখন অন্য জিনিস রয়েছে।"

"খাবার কিছু চাপিয়েছ বুঝি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ মেমসায়েব, স্পেশাল খাবার।"

"স্পেশাল খাবার! আমাকে না জিগ্যেস করেই ··"

"আপনাকে কী জিগ্যেস করবো? সায়েব নিজে হুকুম দিয়েছেন, তাড়াতাড়ি করতে।"

অপমানে ফেটে পড়বার ইচ্ছে হলো ঈশিতার। কলকাতার বাড়ি হলে এতোক্ষণে দূর করে তাড়িয়ে দিতেন হতচ্ছাড়া চাকরটাকে। সমস্ত রাগটা গিয়ে পড়লো জীমূতবাহনের ওপর। ইচ্ছে করেই লোকটা তাঁকে সারা-জীবন ধরে বার বার অপমান করে চলেছে।

"শোনো হরিমোহন, ওই স্পেশাল খাবার তুমি তোমার সায়েবকেই শুধু খাইয়ে আসবে। আমাকে শুধু চা দেবে।"

হরিমোহন ভ্যাবাচাকা খেয়ে বললে, "সে কি মেমসায়েব! সায়েবকে খাওয়াবো কি?"

চিৎকার করে উঠলেন ঈশিতা, "চাকর-বাকরকে একবারের বেশী হুকুম দিই না আমি। আমাকে শুধু চা দেবে।"

জীমূতবাহন সেই সময়ে হাজির হয়ে ব্যাপারটা আরও সঙ্গীন করে তুললেন। "তোমার না গ্যাসট্রিকের গোলমাল রয়েছে। শুধু চা খাবে কি?" জীমূতবাহন চেয়ারে বসতে বসতে বললেন।

হরিমোহনকে ওখান থেকে চলে যেতে বললেন ঈশিতা। তারপর উলের কাঁটা দুটো সরিয়ে দিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করলেন। "তুমি আমাকে এইভাবে চাকর-বাকরের কাছেও অপমান করছো কেন?"

বিস্ময়ে স্তম্ভিত জীমূতবাহন কী করবেন কিছুই বুঝে উঠতে পারছেন না। "কী বলছো ঈশিতা? তোমাকে আমি অপমান করবো?"

"হরিমোহন স্পেশাল খাবারের হুকুম ল্যাবরেটরি থেকে নিয়ে আসবে, অথচ আমি বাড়িতে বসে আছি।"

জীমূতবাহন এবার হেসে ফেললেন। হরিমোহনকে হাঁক দিয়ে ডাকলেন। হরিমোহন আসতেই বললেন, "কী স্পেশাল খাবার তৈরি করছো?"

"সাবু চিংড়ি।" হরিমোহন উত্তর দিলে।

"শুকনো চিংড়িমাছের সঙ্গে সাবু সেদ্ধ করা।"

ঈশিতা শিউরে উঠে বললেন, "এ্যাঁ এখানে এসবও খাচ্ছ তুমি?"

"আমি নয়। কয়েকটা পোকার জন্যে স্পেশাল তৈরি করতে বলেছিলাম হরিমোহনকে।"

শান্তভাবে বললেও, ঈশিতার আচরণে গভীর দুঃখ পেলেন জীমূতবাহন। কিন্তু ঈশিতা নিজের ভুল বুঝতে পারলেও দোষ স্বীকার করলেন না।

কেন করবেন? জীবনে কোনোদিন ঈশিতা নিজের ভুল স্বীকার করেননি।

বিকেলের একফালি পড়ন্ত রোদ ঈশিতার ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছে। ঈশিতা গম্ভীরভাবে স্বামীর কাপে চা ঢেলে দিয়ে আবার উলের কাঁটা নিয়ে বসলেন। কাঁটা দিয়ে মনের মধ্যে জীমূতবাহনও লক্ষ্যহীনভাবে বুনতে আরম্ভ করলেন। দ্রুতবেগে বুনেই চলেছেন, কিন্তু কোনো প্যাটার্ন নেই। কিংবা থাকলেও খুবই সাধারণ—একটা সোজা, একটা উল্টো। একবার উল্টো

পথে অতীতে ফিরে চলেছেন, পরমুহূর্তেই ফিরে আসছেন বর্তমানে।

আজও ঈশিতা উল বুনছেন, আর বিয়ের পরই স্বামীকে তিনি যে সোয়েটারটা বুনে দিয়েছিলেন, সেটার কথা মনে পড়ছে জীমূতবাহনের। বাড়ির কাউকে না বলে নিজেই দোকান থেকে পশম কিনে এনেছিলেন ঈশিতা। আর সুতো দিয়ে কতবার যে স্বামীর বুকের, গলার এবং হাতের মাপ নিয়েছিলেন। আধা তৈরি সোয়েটারটা লুকিয়ে লুকিয়ে প্রায়ই স্বামীর বুকের কাছে ধরে ঈশিতা যখন মাপ নিতেন, তখন কপট বিরক্তি প্রকাশ করতেন জীমূতবাহন। কিন্তু কি সুন্দরই যে লাগতো!

বিজ্ঞানের নেশায় পাগল জীমূতবাহন এতোদিন পরেও দাম্পত্যজীবনের সেই ছোট ছোট মধুর ছবিগুলো বিস্মৃত হননি।

ঈশিতাকে আজও কত টাটকা মনে হয়। এতোদিনের সংসারযাত্রা তাঁর দেহের ওপর তেমন ছায়া ফেলতে পারলো না—অথচ কত সহজে বুড়িয়ে গেলেন জীমূতবাহন।

কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীরা আরও কাছে চলে আসে, না দূরে সরে যায়? জীমূতবাহন বুঝতে পারছেন, তাঁদের কক্ষপথের দূরত্ব ক্রমশই যেন বেড়ে চলেছে। নিজের কর্মজীবন ছাড়া আর সব বিষয়েই তো ঈশিতার আধিপত্য তিনি স্বীকার করে নিয়েছিলেন। কিন্তু তবু ঈশিতার হৃদয় জয় করতে পারলেন না তিনি। নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরির পাগলামোতে মত্ত হয়ে যে লোক সন্তানদের কষ্টে ফেলে, তার প্রতি ঈশিতার যে কোনো দুর্বলতা নেই, একথা তিনি প্রায়ই বুঝিয়ে দেন।

বিয়ের রজত-জয়ন্তীর পরও দাম্পত্য জীবনের এই সব সন্দেহ ও দুশ্চিন্তা সত্যি হাস্যকর। এসব নিয়ে অযথা সময় ব্যয় করার কোনো মানে হয় না। মনকে এবার একটা প্রচণ্ড বকুনি লাগালেন জীমূতবাহন। ঈশিতার জন্যে কম ভালবাসা তাঁর হৃদয়ে জড়ো হয়ে নেই। এই এতোদিন ধরে বেচারা ঈশিতা স্বামীর জন্যে কম কষ্ট স্বীকার করেননি। জগদানন্দ বোসের মেয়ে নিজেকে অনেকটা নামিয়ে এনেছেন, এর থেকে বেশী পরিবর্তন করা বোধ হয় সম্ভবও নয়।

রোদের সোনালী রেখাটা এবার ঘাড় থেকে সরে গিয়ে ঈশিতার গালের

ওপর এসে পড়েছে। যেন নতুন স্টাইলে সোনালী লিপস্টিক লাগাবার সরঞ্জাম করছেন ঈশিতা।

জীমূতবাহন বললেন, "ঈশিতা, এখানে একলা একলা তোমার বোধ হয় খুব খারাপ লাগছে।"

উলের মধ্য থেকে চোখ না তুলেই ঈশিতা বললেন, "বোধ হয় উল একটু কম পড়বে। ভগবানের আশীর্বাদে ঐন্দ্রিলার স্বাস্থ্য ভাল, আর প্রিয়ংবদা লিখেছে, চড় চড় করে বড় হয়ে যাচ্ছে।"

সত্যি আশ্চর্য লাগে ঈশিতার। এই তো সেদিন যেন তাঁর বিয়ে হলো। মাথায় টোপর দিয়ে ড্যাব ড্যাব করে তাকাতে তাকাতে জীমূতবাহন বিয়ে করতে এলেন। তখনও ঈশিতা আশা করেছেন, জীবনটা কত সহজভাবে কেটে যাবে। আসলে জীবনসংগ্রাম জিনিসটা যে কী, তা বাবার জন্যে কোনোদিন জানতেই হয়নি। কত স্বপ্ন ছিল ঈশিতার। কবিগুরু হাসতে হাসতে জগদানন্দ বোসকে বলতেন, "তোমার ছোটমেয়ের মধ্যে সখী-ভাবটাই প্রবল।"

সবাই তাই ভাবতো। সখী ঈশিতা নিজেও, কিন্তু কি জানি কোথায় কী হলো, বিধাতা কোথাকার কোন্ গুপ্ত সুইচ টিপে দিলেন, সব পাল্টে গেল। প্রিয়ংবদার জন্ম থেকেই সখীটা কোথায় হারিয়ে গেল। 'তুমি মা, তুমি মা—মা হওয়া অত সহজ নয়'—এই কথাগুলো কে যেন ঈশিতার কানের কাছে নিরন্তর বলে চলেছে।

এই তো সেদিন ঈশিতা কোলে করে প্রিয়ংবদাকে দুধ খাওয়াতেন, পেরমবুলেটর ঠেলে মেয়েকে নিয়ে বেড়াতে বেরোতেন। আর সেই প্রিয়ংবদারই মেয়ের জন্যে সোয়েটার বুনছেন তিনি এখন।

যাকে সবাই ভেবেছিল পাল্টাতে পারবে না, সে কেমন সহজে খুকী থেকে মা হয়ে গেল, আর যাকে সবাই প্রাপ্তবয়স্ক ভেবেছিল, সে তার দায়িত্ব নিতে পারলে না।

জীমূতবাহন এবার কথা বললেন। "এখানে কি এসব উল পাবে?"

"তাহলে মদালসাকে আর একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দাও—উলটাও যেন ডাকে পাঠিয়ে দেয়।"

"ডাকে পাঠাবে কেন? পরীক্ষা যখন হয়ে গিয়েছে তখন···"

ঈশিতা বেশ অবাক হয়েই জীমূতবাহনের মুখের দিকে তাকালেন। জীমূতবাহন নিজে থেকে মেয়েদের কথা ভাবছেন!

উলের কাঁটা নাড়তে নাড়তে ঈশিতা বললেন, "সামনের শনিবার টেবিল টেনিস খেলতে মদালসা বোম্বাই আসছে। ওদের কলেজটীমের ক্যাপ্টেন হয়েছে। ভাবছি বোম্বাইতে গিয়ে খুকুমণির খেলাটাও দেখে আসি, আর তারপর ওকে এখানে নিয়ে চলে আসবো।"

জীমূতবাহন বললেন, "বেশ ভাল কথা। ওখানে তোমার থাকবারও অসুবিধে হবে না। ইন্দুমতীদের বাড়ি রয়েছে, আমি লিখে দিতে পারি।"

"দরকার হবে না," গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন ঈশিতা। "আমার নিজের বোনপোই রয়েছে অল্টামাউন্ট রোডে। হিন্দুস্থান লিভারে খুব টপ পজিশন পেয়েছে। স্যার নগেন সরকারের একমাত্র মেয়ে তিলোত্তমার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে।"

কোনো প্রতিবাদ করলেন না জীমূতবাহন। ছোট মেয়ের সঙ্গে অনেক-দিন পরে দেখা হবে ভেবে একটু খুশীই হলেন। মদালসা ছোটবেলায় মোটেই মায়ের কাছে থাকতে চাইতো না। বাবার সঙ্গেই ছিল তার যত ভাব। বাড়িতে যতটুকু সময় থাকতেন জীমূতবাহনের ছোট মেয়ে এসে ঘুর ঘুর করতো।

জীমূতবাহন ঘড়ির দিকে তাকাতেই ঈশিতা বললেন, "আবার বেরোবে নাকি?"

"বেরোতেই হবে। অমিতাভ অপেক্ষা করছে।"

এত সময় ধরে জীমূতবাহন ল্যাবরেটরিতে কী যে করেন, ঈশিতার মাথায় আসে না। এবং এত করেও কোনো ফলের আভাস দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না কেন, তাও বুঝতে পারেন না।

ঈশিতা গম্ভীরভাবে বললেন, "সব কাজই কি তোমাকে করতে হয়? তাহলে এতগুলো লোককে মাইনে দিয়ে পুষছো কেন?"

জীমূতবাহন গম্ভীরভাবে বললেন, "আমার এখানে লোকরা যা পরিশ্রম করে, তা আশ্চর্যই বলতে পারো।"

ঈশিতা বললেন, "তোমার না হয় কোনো সাধ-আহ্লাদ নেই, কিন্তু ওই ছেলেটাকে দিনরাত বদ্ধ ঘরে রেখে দিচ্ছ কেন?"

"কার কথা বলছো? অমিতাভর?" জীমূতবাহন সগর্বে বললেন, "ওর কাজের উৎসাহ আমার থেকেও বেশী। দু'জনে সমান পাল্লা দিয়ে যাবো — দেখি কে কাকে হারাতে পারে।"

"ওর খাওয়া-দাওয়ার অসুবিধে হচ্ছে বোধ হয়। একটু রোগা হয়ে গেছে মনে হলো। রঙটাও পুড়ে যাচ্ছে।"

এবার উঠে পড়লেন জীমূতবাহন। ঈশিতার কথাগুলো মোটেই ভাল লাগল না তাঁর। অমিতাভর দিকে তাঁর নিজের যথেষ্ট নজর আছে, আর কারুর সেখানে নাক গলানোর কোনো প্রয়োজন নেই।

আলোটা কাছে এনে একটা কাঁচের ওপর ঝুঁকে পড়ে অমিতাভ কিছু একটা লক্ষ্য করছিল।

পিছনে এসে পরম স্নেহে পিঠে হাত দিলেন জীমূতবাহন। "কী দেখছো অমিতাভ?"

ঘাড় ফিরিয়ে অমিতাভ বললে, "আপনি এত তাড়াতাড়ি এসে গেলেন স্যর?"

জীমূতবাহন হাসতে হাসতে বললেন, "আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বলতেন, বুড়ো হলেই যে স্লো হতে হবে এমন কোনো আইন নেই।"

জীমূতবাহনের হাসিতে অমিতাভও যোগ দিল। আচার্যদেবের কথা বলতে গেলে জীমূতবাহনের আর জ্ঞান থাকে না। জীমূতবাহন বললেন, "মাস্টারমশাই দিব্যজ্ঞানী ছিলেন বোধ হয়। না হলে কোথায় তখন আমার রিসার্চের পরিকল্পনা, কোথায় তখন ল্যাবরেটরি। কিন্তু উনি প্রায়ই বলতেন, যদি কোনোদিন গবেষণাগার করিস, নিবেদিতার নাম রাখিস। মনের মধ্যে একটা পবিত্রভাব আসবে। নিষ্ঠার ভাব না এলে বিজ্ঞানের সাধক হওয়া যায় না।"

জীমূতবাহন বললেন, "ভাল কথা অমিতাভ, সারাক্ষণ এই ল্যাবরেটরিতে

বসে থাকা তোমার ভাল নয়। একটু বেড়িয়ে-টেড়িয়ে আসবে।"

"বেড়ানো যথেষ্টই হচ্ছে মাস্টারমশাই। কতবার তো ক্ষেতে যাচ্ছি।" অমিতাভ কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকতে চাইছে।

জীমূতবাহন অগত্যা কাঁচের বাক্সটার দিকে সরে এলেন। "মিরিয়া-পোডটা নিয়ে এখনো পড়ে রয়েছো?"

"তেঁতুলে বিছেও যে সুন্দর, প্রকৃতির কী অদ্ভুত কারুকার্য যে এর পিছনে রয়েছে, তা আজ প্রথম বুঝতে পারলাম স্যর।"

"এই রকমই হয়," জীমূতবাহন উত্তর দিলেন। "অসুন্দরের মধ্যে অকস্মাৎ সুন্দরকে আবিষ্কার করে কতবার নিজেই অবাক হয়ে গিয়েছি—আজি এ প্রভাতে ভানুর কর, কেমনে পশিল প্রাণের 'পর।"

অমিতাভ বললে, "সহস্রপদীর সামনের চারটে আর পিছনের চারটে পা বেঁধে দিয়েছি। তাতে মুভমেণ্ট বেশ অ্যাফেকটেড্ হয়েছে।"

"খাওয়া-দাওয়া করছে?" জীমূতবাহন জিগ্যেস করলেন।

"ভালই করছে।"

জীমূতবাহন বললেন, "এতগুলো পা নিয়ে কেন্নো এবং বিছেদের হাঁটাটা একটা ছোটখাট বিস্ময় বৈকি। একটা মজার ছড়া মুখস্থ করেছিলাম আমরা:

A centipede was happy quite,
Until a toad in fun
Said, "Pray, which leg moves after which?"
Which raised her doubts to such a pitch,
She fell exhausted in the ditch,
Not knowing how to run.

অমিতাভ বললে, "মাস্টারমশাই, আপনার পেপারটা কিন্তু আজকে শেষ করতে হবে। আমেরিকান সোসাইটি অফ এগ্রিকালচার থেকে আবার চিঠি এসে পড়বে।"

জীমূতবাহন বললেন, "বাড়িতে যদি সময় পাই, আজকেই রেডি করে ফেলবো। তবে পেপারটা আমাদের দু'জনের নামে যাবে। কারণ

ল্যাবরেটরিতে তৈরি এবং লালিত-পালিত যে পোকাগুলোর কথা লিখছি, সেগুলো তোমারই পরিচর্যায় ছিল।"

অমিতাভ বললে, "মাস্টারমশাই, আমার নাম দেবার কোনো প্রয়োজন নেই। আমি শুধু আপনার কথামতো কাজ করে গিয়েছি।"

মাস্টারমশাই বললেন, "সবকথাই যখন মেনে চলেছো তখন এটাও মানবে।"

"শুনুন।"

"শুনছি।" মাথা নিচু করে নবজাত স্পটেড বোলওয়ার্মের নার্সিং করছিল অমিতাভ। তারের জালের মধ্যে রাখা ছিল বোলওয়ার্মগুলো। শূককীট জন্মাবার পরে তলায় বালির বিছানা পেতে দিয়েছিল অমিতাভ। কীটদের গা থেকে জলীয় পদার্থ বেরোয়, শুকনো বালি সেগুলো শুষে নেয়। গভীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থেকেছে অমিতাভ কয়েকদিন। অপেক্ষা সার্থক করে অবশেষে মথ বেরিয়ে এসেছে। মথকেও প্রজাপতি বলে ছেলেরা। কেমন ডানা গুটিয়ে বসে আছে। একটা চার ইঞ্চি ফাঁদের এবং আট ইঞ্চি উঁচু জারের মধ্যে সাবালক মথদের তুলে রাখছিল অমিতাভ এবং রাখতে রাখতেই উত্তর দিয়েছিল, "শুনছি।"

"ক্ষমা করবেন"—আবার মহিলা-কণ্ঠ শোনা গেল।

ব্যস্ত অমিতাভ ততক্ষণে ঝুঁকে পড়ে একটা পাতলা ফর্সা কাপড়ের টুকরো জারের মধ্যে রাখছিল। সেই অবস্থায় অমিতাভ বললে, "ক্ষমা করছি।"

প্রশ্নকারিণী যে রীতিমত বিরক্ত হয়েছেন, তা পরবর্তী প্রশ্নেই বোঝা গেল। "আমার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে।"

"আমারও বিশেষ প্রয়োজন।" অমিতাভ ঝুঁকে পড়েই উত্তর দেয়। সত্যিই তার প্রয়োজন রয়েছে।

কিন্তু ততক্ষণে মহিলা আগন্তুক বেশ রাগতস্বরে বললেন, "কী বললেন?"

বিরক্ত হয়ে পিছনে তাকালো অমিতাভ। এবং জলজ্যান্ত এক যুবতীকে দেখে আরও চমকে উঠলো। লজ্জিত অমিতাভ ক্ষমা ভিক্ষা করলো, "আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আমি ঠিক খেয়াল করে উঠতে পারিনি। তবে সত্যিই

আমার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। আমার একটুখানি চিনি দরকার।"

"চায়ের জন্যে?" বিস্মিত আগন্তুকের প্রশ্ন।

"না না, এই মথদের জন্যে। চিনির জল খাওয়াতে হবে এখনই। সলতেও চাই। আমার কাছে পাতলা কাপড় রয়েছে, এখনই সলতে পাকিয়ে নিচ্ছি।"

"আমি কে বোধহয় বুঝতে পেরেছেন। আমি মদালসা সেন। জীমূত-বাহন সেন আমার বাবা। গতরাত্রে আমি এখানে এসেছি।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, শুনেছি আপনি আসছেন। আপনার মা নিজেই তো বোম্বাই গিয়েছিলেন আপনাকে আনতে। আপনি যদি কিছু মনে না করেন, একটু চিনি নিয়ে আসবেন মিসেস সেনের কাছ থেকে? বড় বিপদে পড়ে গিয়েছি। মথগুলোর খুব খিদে পেয়েছে," অমিতাভ বললে।

মদালসার মাথার চুলগুলো তপস্বিনীর মতো উঁচু করে বাঁধা। এই ধরনের কেশবিন্যাসের কী একটা নামও আছে যেন, অমিতাভ কাগজে পড়েছে। মেয়েটির স্বাস্থ্য ভাল। সমৃদ্ধ কুমারীতনু আঁটসাট জামার তীক্ষ্ণ শাসনে রয়েছে। রঙটা একটু চাপা—ঈশিতা সেনের মতই। তবে বয়সের মসৃণতা আছে। চোখ দুটো অমনই টানাটানা, না বিলিতি পেনসিল দিয়ে ভ্রূ আঁকা হয়েছে, তা বোঝা গেল না।

প্রতিবাদ করবার সুযোগই পায়নি মদালসা। এমনভাবে মুখের ওপর চিনি আনবার হুকুম করেছিল অমিতাভ যে, আঁচলটা ব্লাউজের গলায় গুঁজে সোজা হুকুম তামিল করতে ছুটতে হলো তাকে।

চিনি নিয়ে মদালসা যখন ফিরে এল তখন অমিতাভ সলতে পাকাচ্ছে।

"এই নিন আপনার চিনি।"

"আমি অত্যন্ত লজ্জিত মিস্ সেন। ঠিক ওইভাবে আপনাকে চিনি আনতে বলাটা উচিত হয়নি আমার।"

অপমানটা হজম করেই গেল মদালসা। কিন্তু বেশ বিরক্ত হয়ে উঠেছে সে। "আপনার কাছে একটা খবর নিতে এসেছিলাম, আমার বাবা কোথায় বলতে পারেন? বাপি এখনও স্নান করেননি।"

"স্নান করতে ওঁর দেরি হবে। অন্যদের স্নান করাচ্ছেন এখন,"

তোয়ালেতে হাত মুছতে মুছতে অমিতাভ উত্তর দিলে।

"মানে, আমার বাবা কি চাকর যে অন্য লোককে স্নান করিয়ে দেবেন?" যৌবনবতী মদালসা বেশ অভিমানের সঙ্গে বললেন।

"লোক নয়, পোকাদের স্নান করাচ্ছেন। বিশ্বাস না হয় দেখবেন আসুন।" এই বলে অমিতাভ একটা চেম্বারের দিকে এগোতে লাগল।

ওরা দু'জনেই যখন ঘরে ঢুকে পড়েছে তখন জীমূতবাহন একটা কাঁচের টেবিলে কয়েকটা পোকা নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন।

আলুগাছের জাব পোকা যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা এই পোকাদের চিনতে পারবেন। ওই এক জাতের—তুলোর অ্যাফিড। তুলো ছাড়াও বেগুন, ঢেঁড়স এবং লঙ্কাগাছের শত্রু। বেগুনের কয়েকটা পাতায় শূককীট ছিল, সকালে ছিঁড়ে নিয়ে এসেছে অমিতাভ। একটা ট্রেতে গোটা-কুড়ি পোকাকে রেখে ওপর থেকে স্নানের ঝাঁঝরি খুলে দিলেন জীমূতবাহন। স্নান সেরেই ফ্যানের তলায় শুকোতে দিলেন পোকাগুলোকে।

"আপনাকে বাড়ি থেকে ডাকতে এসেছে স্নানের জন্যে", অমিতাভ এবার জীমূতবাহনকে জানাল।

"এখানকার স্নানযাত্রার এই তো সবে শুরু। এখনও শ' তিনেক পোকা আছে—বিভিন্ন কেমিক্যালে স্নান করিয়ে ফলাফল দেখতে হবে। অমিতাভ, তুমি এবার পোকাগুলোকে বেগুনপাতা খেতে দাও—দেখো খেতে পারে কিনা, বেগুনে বোধহয় অরুচি হয়ে গিয়েছে এতক্ষণে।"

"কীসের বাথ দিলেন?"

"ফোস্‌ড্রেন।" জীমূতবাহন উত্তর দিলেন।

অমিতাভ বললে, "আপনি স্যর বাড়ি গিয়ে স্নান সেরে খেয়ে নিন, আমি এই কাজটা চালিয়ে যাচ্ছি।"

"না না, নিজের খাওয়াটাই কি আগে হলো?" জীমূতবাহন প্রতিবাদ করেন।

কোনো কথা শুনলে না অমিতাভ, জোর করে ওঁকে বাড়ি পাঠিয়ে দিল।

জীমূতবাহন বললেন, "তাহলে ডিটেলগুলো লিখে নাও। হেট্রোজিনিটি

—$X^2(3)=1\cdot631$। রিগ্রেসন, ফিডিউসিয়াল লিমিট এবং রিলেটিভ টক্সিসিটিও লিখে নাও।"

জীমূতবাহন যখন হাত ধুতে গিয়েছেন, তখন মদালসা সেন জিগ্যেস করলে, "স্নান করিয়ে কী লাভ হচ্ছে আপনাদের?"

গম্ভীরভাবে অমিতাভ উত্তর দিলে, "সাবান দিয়ে এদের রঙ ফর্সা করবার চেষ্টা হচ্ছে।"

অমিতাভর উত্তরে মদালসা বেশ বিরক্ত হলো। "সোজা করে আপনারা কিছু বলতে শেখেন না?"

অমিতাভ হেসে বললে, "কীটনাশক কেমিক্যালের শক্তি দেখছি আমরা। এর পরে প্যারাসাইটরা কতটা কী করতে পারে দেখা হবে। আমাদের পদ্ধতিতে সময় একটু বেশী লাগে। ধৈর্য চাই। অনেকে বলেন খরচও বেশী। এখন হয়তো তাই—কিন্তু ঠিকমতো কাজ হলে খরচ অনেক কমই হবে।"

হাত ধুয়ে বেরিয়ে এসে জীমূতবাহন মদালসাকে এগোতে বললেন। "তুমি যাও মা, আমি যাচ্ছি।"

মদালসা যেমনি হল থেকে বেরিয়ে গেল, জীমূতবাহন বেশ গম্ভীর হয়ে গেলেন। "ল্যাবরেটরির মধ্যে বাইরের কারুর ঢুকে পড়া ভাল নয়। তুমি কী বলো?" অমিতাভর মতামত জানতে চাইছেন জীমূতবাহন।

কিছুই বললো না অমিতাভ, কিন্তু মদালসা ভিতরে চলে আসায় জীমূতবাহনের বিরক্তির কী কারণ হতে পারে তা বুঝতে পারলো না।

যেতে যেতে জীমূতবাহন একটা তারের খাঁচার দিকে তাকালেন—একটা গর্ভিনী প্যারাসাইট উড়ে উড়ে হোস্টকে বাগাবার চেষ্টা করছে। জীমূতবাহন দেখলেন হোস্ট এখনও বিপদের ইঙ্গিত পায়নি—কিন্তু তার অসাবধানতার সুযোগ নিয়ে এক মহাসর্বনাশ হতে চলেছে।

গতকাল রাত্রে মেয়ের সঙ্গে তেমন গল্প হয়নি। ট্রেন জার্নির ক্লান্তিতে বেচারা ঘুমিয়ে পড়েছিল। আজও লাঞ্চ টেবিলে গল্প হবে না। ল্যাবরেটরিতে তাড়াতাড়ি ফিরে গেলে তবে অমিতাভ খাবার সময় পাবে।

লাঞ্চটা গোগ্রাসেই গিলছিলেন জীমূতবাহন। ঈশিতা যে ক'দিন বোম্বাইতে ছিলেন, সে ক'দিন তো বাড়িতেই ফিরতেন না। ল্যাবরেটরিতে হরিমোহন কয়েকটা স্যাণ্ডউইচ দিয়ে আসতো। দুপুরবেলায় বেশী খেলে বিকেলের কাজকর্মে ঢিলে পড়ে যায়।

"তুমি সবসময় এতো গোমড়া মুখ করে থাকো কেন?" ঈশিতা বেশ গম্ভীর ভাবেই অভিযোগ করলেন।

ঈশিতা চেষ্টা করে জীমূতবাহনের ভুল খুঁজে বেড়াচ্ছেন। মোটেই গম্ভীর হয়ে নেই জীমূতবাহন, বরং অনেকদিন পরে আদরের ছোটমেয়েকে দেখে বেশ খুশী হয়েছেন। ঈশিতাকে আড়ালে ডেকে একসময় বলে দিতে হবে, ঝগড়াঝাঁটিটা মেয়ের সামনে না করলেই ভাল। মেয়ের বয়স হয়েছে, সে এখন সব বুঝতে পারবে।

মেয়ের সামনে প্রতিবাদ করতে পারলেন না জীমূতবাহন। রসিকতা করে বললেন, "কোথায় গম্ভীর? প্রচুর হাসি পেটের মধ্যে জমা হয়ে রয়েছে।"

মেয়ে বললে, "তোমরা দু'জনেই খুব হাসবে কিন্তু। না হলে আমি রেগে যাবো।"

জীমূতবাহন খেলার খোঁজ নিলেন। "তারপর মা, তোমাদের কম্পিটিশনে কী হলো?"

ঈশিতা বললেন, "খুকুর কোনো দোষ নেই। মিক্সড ডাবলসে ওর পার্টনার এমন ডোবাল যে হেরে গেল। খুকু, ওই রকম বাজে পার্টনার আর নিও না।"

জীমূতবাহন বললেন, "পার্টনারের উপর অনেক কিছু নির্ভর করে—একা কিছুই করা যায় না।"

"বাপি, তোমাদের এখানকার ক্রকারি দেখছি খুব খারাপ। কিছুদিন আগে, বৃষ্টির সময় শেয়ালদার কাছে একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকে পড়েছিলাম। সেখানে ঠিক এই রকম বিশ্রী ডিশ প্লেট," মদালসা দাঁত দিয়ে ভাত কাটতে কাটতে বললে।

মনে বেশ আঘাত পেলেন জীমূতবাহন। মেয়েকে কী শিক্ষা দিচ্ছে

ঈশিতা ? ভাত খেতে খেতে বললেন, "আমরা জঙ্গলের মধ্যে পড়ে আছি মা, কোথায় ভাল জিনিস পাবো।"

"বাপি, তুমি হাত দিয়ে ভাত খাও কী করে? চামচ দিয়ে খেতে পারো না আমাদের মতো ?"

মুখ না তুলেই জীমূতবাহন বললেন, "ছোটবেলা থেকে এই রকম অভ্যাস হয়ে গিয়েছে, মা।"

"তুমি না কি বৈজ্ঞানিক ? বাপি, হাতে কত ময়লা থাকে জানো ?"

"জানি মা—সেই জন্যেই তো হাত ধুয়ে খেতে হয়।"

মেয়ের পক্ষে এবার মা বললেন, "তোর বাবার এই বিশ্রী অভ্যেস কিছুতে ছাড়াতে পারলাম না—বিয়ের পর কত চেষ্টা করেছি। আমার বাবা অবশ্য বলতেন, যার যেভাবে খেতে ভাল লাগে তাকে সেইভাবে খেতে দেওয়া উচিত।"

দাদুর কথাতেই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো মদালসা। "জানো বাপি, সামনের বছরে দাদুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হবে। সেইজন্যে শতবার্ষিকী কমিটি হচ্ছে। মাকে তো কমিটিতে নিয়েছে, কাগজে নাম বেরিয়েছে মা'র।"

"সাধারণ কমিটিতে নয়, উপদেষ্টা কমিটিতে," ঈশিতা সগর্বে সংশোধন করে দেন। "তোমার কাছেও চাঁদার চিঠি আসবে।"

"দিয়ে দিও," জীমূতবাহন উত্তর দেন।

"এমনভাবে বলছো যেন সরস্বতীপূজার চাঁদা চাওয়া হচ্ছে তোমার কাছ থেকে। তিন বছর তিনি তোমাকে বিলেতে রেখে পড়াশোনা করিয়েছিলেন," মুখঝামটা দিলেন ঈশিতা।

অসহায় জীমূতবাহন কিছুই বললেন না। মদালসাও বিপদ বুঝে অন্য কথা তুললো, "বাপি, এই জায়গাটা যদি কলকাতার কাছে হতো, ফাইন হতো।"

"ওসব কথা বোলো না, তোমার বাবা রেগে যান। কলকাতা থেকে যত দূরে থাকতে পারেন ততই তোমার বাবার আনন্দ," ঈশিতা এমন সুযোগটা ছাড়তে পারলেন না।

"কলকাতার কাছে এতোখানি জমি মাত্র একশ টাকায় একশ বছরের লিজে কে আমাকে দিত, ঈশিতা?" জীমূতবাহন বেশ দুঃখের সঙ্গে জিগ্যেস করলেন।

"চেষ্টা করে দেখেছিলে? জগদানন্দ বোসের জামাই জমির জন্যে আবেদন করছে জানলে অনেকেই এগিয়ে আসতো।" সরকারী মহলে তাঁর বাবার ভক্ত সংখ্যা এখনও যে কম নয়, তা ঈশিতা জানিয়ে দিতে ভুললেন না।

জীমূতবাহন গম্ভীরভাবে বললেন, "কম বয়সে অনেকবার বাধ্য হয়ে হাত পেতেছি, কিন্তু এই বয়সে আর ছোট হতে ইচ্ছে করে না। অম্বালাল দেশাই নিজে থেকে জমিটার ব্যবস্থা করে দিলেন তাই।"

অম্বালালই তোমার শনি, ঈশিতা মনে মনে বললেন। এই অম্বালাল লোকটাকে মোটেই দেখতে পারেন না ঈশিতা। জীমূতবাহন যা বলবেন তাতেই হ্যাঁ বলে তাঁকে ক্ষেপিয়ে দেয়। জীমূতবাহন সেন ছাড়া ইণ্ডিয়াতে যেন বৈজ্ঞানিক নেই। যত 'মায়ে খেদানো বাপে তাড়ানো বৈজ্ঞানিক প্রবলেমকে লালন-পালনের জন্যেই যেন জীমূতবাহন বেঁচে রয়েছেন। তাঁর ঘর নেই, সংসার নেই, ছেলেপুলের চিন্তা নেই, শুধু বনের মোষ তাড়িয়ে বেড়ালেই তাঁর চলবে। অথচ অম্বালালের কথা জীমূতবাহন শোনেন। জীমূতবাহনকে বায়োলজিক্যাল কণ্ট্রোলের পাগলামিতে যেতে বারণ করবার জন্যে অম্বালালকে নিজে অনুরোধ করেছিলেন ঈশিতা। অম্বালাল সোজা না বলে দিয়েছিলেন: "ওঁর মতো একজন বৈজ্ঞানিকের স্বাধীনতায় আমি হাত দেবার কে?"

মেয়ের প্লেটে খাবার দিতে দিতে ঈশিতা স্বামীকে বললেন, "তুমি ভালভাবেই জানো, তোমার স্ত্রীর, তোমার মেয়েদের স্বাস্থ্য এখানে কোনোদিন ভাল থাকে না। কিন্তু তার জন্যে কণামাত্র আগ্রহ তুমি দেখাওনি"

স্বাস্থ্য খারাপ হয়, না মন টেকে না? জীমূতবাহনের জানতে ইচ্ছে করে। জীমূতবাহনের আর একবার মনে হলো, ঝিঁঝিপোকারা ভাগ্যবান —তাদের বউরা শব্দ করতে পারে না।

কলকাতার কাছে হলে কী সুবিধে হতো মদালসা এবার বলেই ফেললো। "বান্ধবীদের নিয়ে মাঝে মাঝে পিকনিকে আসা যেতো।"

জীমূতবাহনের ইচ্ছে হলো মেয়েকে মনে করিয়ে দেন, এই জায়গাটা তার বাবার সাধনার স্থান। মন্দিরের ভিতর কেউ পিকনিক করে না। কিন্তু সামনে ঈশিতা বাঘিনীর মতো মেয়েকে যেভাবে আগলে বসে রয়েছেন, তাতে কিছুই বলা গেল না। গম্ভীরভাবে জীমূতবাহন মেয়েকে বললেন, "পিকনিকের মতো একটুকরো খালি জায়গাও নেই। প্রতিটি ইঞ্চি জমিতে আমার কিছু না কিছু কাজ করছি।"

কিন্তু এতেও নিষ্কৃতি পেলেন না জীমূতবাহন। তাঁরই প্লেটে আরও এক চামচ ভাত ঢালতে গিয়ে ঠক করে আওয়াজ করে ফেললেন ঈশিতা। তাঁর হাতের চুড়িগুলো কিন কিন করে বেজে উঠলো। সেই সুরেই ঈশিতা বললেন, "শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনেও অনেক গাছ-গাছড়া আছে, তবুও লোকে পিকনিক করে। ভয় নেই, খুকুমণির কোনো বন্ধুই এখানে পিকনিক করতে আসছে না।"

জীমূতবাহন তাঁর মোটা কাচের চশমার মধ্য দিয়ে ঈশিতার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

মেয়ে এবার বললে, "মা, বাবাকে ওই ব্যাপারটা বলো।"

ঈশিতা বললেন, "হ্যাঁ জরুরী কথা, বিকেলে খুকুমণিকে শহরে কোনো হেয়ারড্রেসারের কাছে নিয়ে যেও তো।"

পায়ের স্লিপার নাচাতে নাচাতে মদালসা বললে, "হ্যাঁ বাবা, স্নান করবার সময় হেডক্যাপটা পরতে ভুলে গিয়েছিলাম, কী অবস্থা হয়েছে দেখো না।"

বেশ খুঁটিয়েই মেয়ের চুলগুলো দেখলেন জীমূতবাহন। কিন্তু চুলের অবস্থা এমন কিছু বিপর্যস্ত হয়েছে বলে তিনি বুঝতে পারলেন না। নিশ্চয়ই হয়েছে, তাঁদের মোটা দৃষ্টিতে ওসব সূক্ষ্ম দোষ ধরা পড়ে না। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে তাঁকে জানাতে হলো এখানকার শহরে মেয়েদের কোনো হেয়ার-ড্রেসার নেই।

"তা হলে কী হবে মা-মণি?" উদ্বেগে মদালসার মুখ কাঁদো-কাঁদো হয়ে উঠলো।

মেয়ের চিন্তা যে মাকেও স্পর্শ করেছে তা বোঝা গেল। তিনি বললেন, "দেখি আমি নিজে তোমাকে কিছু হেল্‌প করতে পারি কিনা। তেমন হলে কলকাতায় ফিরে যাবে, উপায় কী?"

ঈশিতা সেন স্বামীকে নীরবে বুঝিয়ে দিলেন, তোমার লজ্জা হওয়া উচিত। কিন্তু কিছুতেই লজ্জা হচ্ছে না জীমূতবাহনের। কী করেন তিনি?

লজ্জা জিনিসটা কী? কেন লজ্জা হয়? লজ্জা না হলে কী করা উচিত? এইসব অসংলগ্ন চিন্তা জীমূতবাহনের মনের মধ্যে কৈ মাছের মতো ছটফট করতে আরম্ভ করেছিল। ল্যাবরেটরিতে নিজের ঘরে বসেও এলোমেলো চিন্তার হাত থেকে মুক্তি পাচ্ছেন না।

ল্যাবরেটরিতে ঢুকে পড়লে কিছুদিন আগেও জীমূতবাহন বাইরের সব চিন্তা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে পারতেন। এতো কাজ থাকতো, এতো দিকে নজর দেবার প্রয়োজন হতো যে, অন্য চিন্তাগুলো পালাবার পথ পেতো না। কিন্তু অমিতাভ এসে অনেক দায়িত্ব নিজের মাথায় তুলে নিয়েছে। প্রতিদিনের অনেক দুশ্চিন্তার হাত থেকে তাঁকে মুক্তি দিয়েছে অমিতাভ।

শুধু ভার লাঘব নয়, জীমূতবাহন এখন অমিতাভর মধ্য দিয়ে যৌবনের সেই প্রাণময় উদ্দীপনা আবার অনুভব করেন। জীমূতবাহন ভুলে যান, জীবনের উইকেটে সেই ভোরবেলা থেকে তাঁর ব্যাটিং চলেছে—লাঞ্চ তো দূরের কথা, চা-পানের বিরতিও শেষ হয়ে গিয়েছে। যৌবনের ছোঁয়াচে রোগটা অমিতাভ তাঁর মনে আবার ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা করছে।

যৌবন কাউকেই তোয়াক্কা করে না। জীমূতবাহনও করবেন কেন? সংসারের তুচ্ছ ঘটনাগুলোকে মাইক্রোসকোপে বড় করে দেখে নিজে সময় নষ্ট করবেন কেন?

"মাস্টারমশাই!"

অমিতাভর কণ্ঠস্বর না? জীমূতবাহন বললেন, "ইয়েস মাই ডিয়ার বয়।"

"আপনি এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন কেন? একটু বিশ্রাম নিলে পারতেন।"

"তুমি খেয়ে এস অমিতাভ। বিশ্রাম এ-জীবনে অনেক নিয়েছি। বিশ্রামের দোহাই দিয়ে জীবনের কত অমূল্য সময় অযথা নষ্ট করেছি, ভাবলে এখন দুঃখ হয়। কিন্তু বড় দেরি হয়ে গিয়েছে।"

মোটা কাচের মধ্য দিয়ে জীমূতবাহনের চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। জীমূতবাহন হাসছেন। মাস্টারমশাইয়ের এই হাসিটা ভারি ভাল লাগে অমিতাভর।

এই হাসি শুধু ভালই লাগে না, কেমন এক আকর্ষণী শক্তি আছে এই সহজ নিষ্পাপ হাসিতে। জীমূতবাহনের দেহে অকস্মাৎ যেন বিদ্যুৎপ্রবাহ চালিত হয়—একটা বিচিত্র চুম্বকে পরিণত হন জীমূতবাহন সেন, যা অমিতাভকে আকর্ষণ করে। শুধু অমিতাভ মিত্র কেন—ইন্দুমতী দেশাই, অম্বালাল দেশাই, প্রফেসর ব্ল্যাকার, অধ্যাপক মিচিকানা আরও কতজন তাতে আকৃষ্ট হন।

চেয়ার থেকে উঠে পড়ে জীমূতবাহন বললেন, "আমাকে এখন কী কী করতে হবে বলো।"

"রুটিন কাজ কিছুই করতে হবে না। সব হয়ে গিয়েছে। কেমিক্যাল বাথ-এর সমস্ত ডিটেল নোট করে নিয়েছি। পিঁয়াজের পোকা ওনিয়ন ম্যাগটগুলো ভালই আছে। র‍্যাবডিপাইসিন কিয়েটারগুলো মেপেছি, আর বড় হবে বলে মনে হয় না।"

"কত বড় হয়েছে মাদিগুলো?"

"২·৬০ মিলিমিটার। চোখের রঙ ব্রাউনিস ব্ল্যাক। সুতরাং আপনার চিন্তার কিছু নেই।"

অমিতাভর পিঠে হাত রেখে জীমূতবাহন বললেন, "আমার জন্যে কোনো কাজই রাখনি তাহলে।"

অমিতাভ হেসে বললে, "কাজ আছে—আপনার পেপারটা শেষ করা। আর চিঠি-পত্তরের উত্তর দেওয়া, অনেক চিঠি জমে রয়েছে।"

চিঠি লিখতে বসলেন জীমূতবাহন। দু'একটা ছোটখাট চিঠি শেষও করলেন। কিন্তু ঈশিতার বিরক্ত মুখটা আবার চোখের সামনে ভেসে উঠছে। ঈশিতা কী চায়, বুঝতে পারেন না জীমূতবাহন। তাঁর ব্যক্তিগত যা

রোজগার সবই তো ঈশিতার হাতে তুলে দেন। পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে তার —কোনোদিন কোনো বিষয়েই প্রশ্ন করেন না তিনি। শুধু একটু শান্তি চান জীমূতবাহন, যে শান্তিটুকু না হলে দিনের পর দিন বছরের পর বছর ল্যাবরেটরিতে মত্ত থাকা যায় না। কিন্তু ওরা সন্তুষ্ট নয় কেন? তাঁর মেয়েরা, যাদের তিনি সত্যিই ভালবাসেন, তারাও সব মায়ের দলে। কেন? কী ভুল করেছেন তিনি?

"বাবা!" মদালসা নিঃশব্দে কখন ল্যাবরেটরিতে ঢুকে পড়েছে।

"আয় মা।"

"বাবা, তোমার ঘুম পাচ্ছে বুঝি?"

"না মা, চোখ বুজে বসে আছি।" জীমূতবাহন চোখ দুটো খুলে কাচের চশমার মধ্য দিয়ে মেয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ভারি মিষ্টি দেখতে হয়েছে তাঁর মেয়ে মদালসা। প্রথম যৌবনে ঈশিতা হুবহু এমনই দেখতে ছিল। শুধু ঈশিতা এতো টাইট জামা পরতো না। ঈশিতার চুলও ছিল অনেক, কিন্তু সেগুলো খোঁপা বেঁধে জড়িয়ে রাখতো ঈশ্রিতা।

বাবার খুব কাছে এসে বসলো মদালসা। "চোখ বুজে তুমি ভাবো, তাই না বাবা? কী এতো ভাবো তুমি?"

জীমূতবাহন হাসলেন। এই মেয়েটি সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ দুর্বলতা আছে! দূরত্বের বাধা সরিয়ে দিয়ে ছোটবেলায় সে-ই তাঁর কাছে চলে আসতো। জীমূতবাহন বললেন, "ভাবার কী আর শেষ আছে মা? কত কি রয়েছে— কত রহস্য, কত সমস্যা, কত মিথ্যার আবরণ।"

"আচ্ছা বাবামণি, পৃথিবীতে এতো লোক রয়েছে, সবাই একটু একটু করে ভাবলে পারে। তুমি একা কেন সবার জন্যে ভেবে ভেবে কষ্ট পাবে?"

মেয়েটা সত্যি এখনও বোকা—না হলে এমন প্রশ্ন কেউ করে? জীমূত-বাহন সস্নেহে বললেন, "আমি একা কেন মা, পৃথিবীর আরও কত লোক সারাজীবন ধরে এমনি ভেবেই চলেছে। তবেই তো পৃথিবী চলছে।"

"আচ্ছা বাবা, তুমি নিজেদের সম্বন্ধে ভাব না কেন?"

মেয়ের প্রশ্নে জীমূতবাহন চমকে উঠলেন। "কে বলেছে মা?" জীমূত-

বাহন সোজা হয়ে বসলেন। "না মা, সে অত সহজ নয়—নিজের সম্বন্ধে ভুলে গিয়ে শুধু সত্যের জন্যে ভাবা খুব শক্ত কথা।"

"বাবা, তোমাকে হেয়ারড্রেসারের খোঁজ করতে হবে না। এখনকার মতো মা-ই ঠিক করে দিয়েছে।"

বাবা বললেন, "হ্যাঁ, বেশ ভালই দেখাচ্ছে।"

মদালসা বললে, "জানো বাবা, আমাদের কলেজের একটা মেয়ে তার বাবার সঙ্গে বিলেতে গিয়েছিল। প্যারি থেকে যা হেয়ার-ডু করিয়ে এনেছে, এখানে স্বপ্নেও ভাবা যায় না।"

বাবা বললেন, "তাই বুঝি?"

"আচ্ছা বাবা, আমরাও তো ইউ কে-তে ছিলাম, তাই না?"

"তোর জন্ম ওখানে, ওখানেই ছোটবেলা কেটেছে।"

"শুধু শুধু বোকার মতো চলে এলাম কেন আমরা?" মদালসা প্রশ্ন করে। "তুমি খুব বড় চাকরি করতে, তাই না? অনেক টাকা মাইনে পেতে। মা'র একটা আলাদা গাড়ি ছিল। জান বাপি, ন'মাসিমার মেয়ের বিয়েতে আমরা ট্যাক্সি করে গেলাম। কী লজ্জা করছিল মা'র!"

নিরুত্তর জীমূতবাহন মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

"আমি চাকরি ছেড়ে না দিলে তোদের খুব মজা হতো তাই না?" জীমূতবাহন জিগ্যেস করলেন।

"প্যারিতে প্রতি সপ্তাহে হেয়ার-ডু করানো যেতো। জান বাবা, ফ্রেঞ্চ পারফিউমের কী দাম এখানে! চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা শিশি চায়। দিশি সেন্ট গায়ে দিলে পচা গন্ধ বেরোয়।"

জীমূতবাহন স্তব্ধ হয়ে মেয়ের দিকে তাকিয়ে আছেন। হাতের পুতুলের মতো মেয়েকে তৈরি করছে ঈশিতা। মদালসা বললে, "শুভ্রা বিলেত থেকে ইলাস্টিক কাপড় এনেছে—টাইট ফিটিং শালোয়ার কামিজ যা হয়েছে না, তোমাকে কী বলবো।"

জীমূতবাহন বললেন, "তোর মা যখন বিলেতে ছিলেন, তখন কলকাতা থেকে শাড়ি পাঠাতেন তোর দাদু।"

মদালসা বললে, "বিলেতের অফিস কেন ছাড়লে বাবা? তোমার সঙ্গে

সায়েবের ঝগড়া হয়েছিল বুঝি ?"

জীমূতবাহন আমতা আমতা করতে লাগলেন। "না মা, আমার ভাল লাগল না। মনে হলো আমার জন্যে দেশে আরও অনেক বড় কাজ অপেক্ষা করছে।"

উত্তরটা মেয়ের যে পছন্দ হলো না, তা তার মুখের দিকে তাকিয়েই জীমূতবাহন বুঝতে পারলেন।

টেবিলের দিকে ঝুঁকে পড়ে জীমূতবাহন বললেন, "তুই একটু বোস, আমার কাজগুলো সেরে ফেলি।"

"তুমি এখানে এতো কাজ করো অথচ মাইনে পাও না!" মদালসা বিস্ময় প্রকাশ করলে।

"কে এখানে মাইনে দেবে আমাকে ? গ্র্যান্টের টাকায় কোনো রকমে এতগুলো লোকের চলে যায়।"

"না বাবা, এ ভাল নয়। তুমি আবার বিলেতে ফিরে চলো, খুব মজা হবে।"

জীমূতবাহন মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। মেয়ে বললে, "তুমি তাহলে কাজ করো, আমি মা'র কাছে যাই। মা একলা বসে আছে।"

মদালসা চলে যাবার পর জীমূতবাহনও চেয়ারে বসে থাকতে পারলেন না। অসহনীয় অন্তর্দাহে ছটফট করতে লাগলেন।

খাওয়া শেষ করে অমিতাভ নিজের ঘরে এসে বসেছে। সেখানে গিয়ে একটা চেয়ার টেনে বসলেন জীমূতবাহন। বললেন, "লিখতে ইচ্ছে করছে না। আমি বরং প্রবন্ধটা মুখে মুখে বলে যাই, তুমি লিখে নাও।"

এইভাবেই চলছিল। জীবনের এক বিচিত্র নকশা এইভাবেই নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরির দেড়শ বিঘার আঙিনাতে আঁকা হচ্ছিল। সেদিন নির্জন দুপুরে ল্যাবরেটরির ঘরে বসে একমনে টাইপ করছিল অমিতাভ। নিস্তব্ধ অপরাহ্ণ অমিতাভকে মধ্যে মধ্যে বিষণ্ণ করে তোলে। মনে হয় পৃথিবীর গতি স্তব্ধ হতে চলেছে। দুষ্টুমি শেষ করে ক্ষুধার্ত পতঙ্গের দলও বিশ্রাম নিচ্ছে, মাঠের চাষীরাও মাঠ ছেড়ে হয়তো কোনো গাছের তলায় একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছে। বাতাসও ছুটি নিয়েছে, তাই পাতা নড়ে না! শহরে এমন হয় না; কারখানার ঘড়ি কাউকে ছুটি দেয় না, শিল্পের মানুষদের জীবনবীণার তারগুলো বোধহয় অন্যভাবে বাঁধা। অমিতাভ ভাবছিল।

এই বিষণ্ণ মুহূর্তে মনে হয় মানুষের যাত্রাপথ অন্তহীন। জীবনের রেলগাড়ি লক্ষ্যহীনভাবে এমন এক অঞ্চলের মধ্য দিয়ে ছুটে চলেছে, যেখানে রেলের ইঞ্জিনীয়াররা স্টেশন তৈরি করতে ভুলে গিয়েছে। এইসব মুহূর্তে জটিল কোনো কাজ করতে ইচ্ছে করে না—গায়ে একটা পাতলা চাদর জড়িয়ে বিছানায় আধশোয়া হয়ে মাথার জানালাটা দিয়ে ফিকে নীল আকাশটার দিকে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। গগনের কোনো গৃহবধূ যেন ছুটির দিনে সাবান কাচতে বসেছেন। শাদা মেঘের ফেনাগুলো সেখান থেকেই অলস গতিতে ভেসে আসছে। এমনিভাবে তাকিয়ে থাকলে ঘুম এসে যায়—কিন্তু দুপুরে ঘুমনোটা ভাল অভ্যেস নয়। তাই টাইপ-রাইটারটা নিয়ে বসে পড়েছে অমিতাভ।

কিন্তু মাঝে মাঝে টাইপরাইটারে হাত দিয়ে চুপচাপ বসে থাকে অমিতাভ। ভাবে, ভাগ্যের কোন্ লিখনে জীমূতবাহনের সঙ্গে তার জীবনের

গাঁটছড়া বাঁধা হলো। কোথায় ছিলেন জীমূতবাহন, কোথায় ছিল অমিতাভ, দু'জনে কেমনভাবে দেখা হয়ে গেল। বিজ্ঞানকে জীবনের বৈষয়িক উন্নতির মাধ্যম বলে ভাবতে শিখেছিল অমিতাভ। বড় বৈজ্ঞানিক হয়ে অন্য অনেকের মতো লক্ষ্মীর স্নেহধন্য হবে এই ছিল কল্পনা। বড় চাকরি করবে, তার সঙ্গে খ্যাতি ও স্বাচ্ছন্দ্য, এই ছিল লক্ষ্য। কিন্তু জীমূতবাহনকে না দেখলে জীবনের এক বৃহৎ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হতো অমিতাভ।

জ্ঞানের দীপটি সযত্নে ধারণ করে সংসারের বিচিত্র ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়ে নিরাসক্ত নির্ভীক জীমূতবাহন যেভাবে আপন উদ্দেশ্যের দিকে আপন মনে এগিয়ে চলেছেন, তাতে শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে।

না, টাকাই সব নয়। বৈজ্ঞানিক অমিতাভ মিত্র ধনবান ঐশ্বর্যশালী অমিতাভ মিত্রের কাছে নিজেকে বন্ধক রাখতে চায় না। জীবনের অপরাহ্ণ বেলায় সংসারী জীমূতবাহন নিজের ভুল বুঝতে পেরে আবার যদি সত্যের সাধনা শুরু করতে পারেন, তবে একলা অমিতাভ এখনই তা পারবে না কেন? ডারহামের সেই সান্ধ্যভোজের আসরে জীমূতবাহনের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছিল বলে অমিতাভ নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দেয়।

চিন্তার রেশ ছিন্ন করে অমিতাভ আবার টাইপরাইটারের চাবি টিপতে শুরু করলে।

একাদিক্রমে টাইপের খটাখট চলেছিল। এমন সময় গুরুকন্যা যে ঘরে ঢুকতে পারে, তার জন্য অমিতাভ প্রস্তুত ছিল না।

একটা সিল্কের শাড়ির ওপর টকটকে লাল রঙের কার্ডিগান চাপিয়েছে মদালসা। হাতঘড়িটা আকারে বৃহৎ, অন্য হাতে স্টেনলেস স্টিলের চুড়ি পরেছে সে। কানের দুল দুটো যে বেশ মূল্যবান পাথরে তৈরি, তা বুঝতে দেরি হয় না।

একটা জয়পুরী নাগরা পরেছে মদালসা, আর হাতের ছুঁচলো নখগুলো করেছে লাল।

ঘরে ঢুকে সহজভাবেই জিগ্যেস করলো মদালসা, "কী ঠকঠক করে টাইপ করছেন?"

"একটা প্রবন্ধ," টাইপরাইটারটা সরাতে সরাতে অমিতাভ বলে।

"আসুন। বসুন এখানে।"

"এত কী প্রবন্ধ লেখেন আপনারা?" মদালসা প্রশ্ন করে।

"বিজ্ঞানের জগতে পেপার তৈরি করা এবং সেগুলো জার্নালে প্রকাশ করাটা খুব প্রয়োজনীয় কাজ। এইসব জার্নাল পড়েই তো বিদেশের বৈজ্ঞানিকরা জানতে পারবেন, আমরা এখানে কী কাজ করছি; এবং আমরা জানতে পারবো বিদেশে কী কাজ হচ্ছে?"

"বাবাও বোধহয় আজ এই ধরনের কী একটা পেপার পড়তে শহরে গিয়েছেন," মদালসা জানায়।

"এখানকার বিজ্ঞান কলেজে এগ্রিকালচারাল অফিসারদের এক সম্মেলন হচ্ছে। সেখানে বক্তৃতা করবেন আপনারা বাবা।"

মদালসা বললে, "শুনুন, যে জন্যে আসা। মা বলে দিয়েছেন, একটু পরেই আপনি আমাদের বাড়িতে যাবেন।"

"কেন বলুন তো।" অমিতাভ প্রশ্ন করলে।

"কোন কেন নেই, মানুষ মানুষের বাড়িতে যায় না?"

"আমি তো বলতে গেলে একরকম আপনাদের বাড়িতেই আছি," অমিতাভ হেসে উত্তর দেয়।

"মা বলেছেন, আপনার যদি আপত্তি না থাকে, বিকেলের চা-টা আমাদের ওখানেই খাবেন।"

অমিতাভ বললে, "বেশ, যাবো।"

কিন্তু মদালসা জিগ্যেস করলে, "আপনিও কী বাপির মতো ভুলো নাকি?"

"আপনার বাবাকে ভুলো বলছেন? হাজার দশেক পোকামাকড়ের নাম এখনই মুখস্থ বলে যেতে পারেন। কাগজে-কলমে আপনার বাবা এখানে যে কাজ করছেন, হলাণ্ডের প্রফেসর কুনিন ঠিক সেই একই কাজের জন্যে কমপিউটর ব্যবহার করছেন।"

হাতের চাবির রিঙটা ঘোরাতে ঘোরাতে মদালসা বললে, "ওই পর্যন্ত। বাবার ভুলো স্বভাবের জন্যে আমাদের যে কত ভুগতে হয়েছে।"

"পৃথিবীতে যাঁরা বড় কাজে ব্যস্ত থাকেন, ছোট ছোট জিনিস অনেক

সময় তাঁদের ভুলে থাকতে হয়," অমিতাভ উত্তর দেয়।

"আপনি যে সুপ্রিয়দার মতো হয়ে উঠলেন। মেজদির সঙ্গে তখনও বিয়ে হয়নি সুপ্রিয়দার। বাবার ল্যাবরেটরিতে আপনারই মতো পাগল হয়ে কাজ করতেন সুপ্রিয়দা, আর বাবার বিরুদ্ধে কোনো কথা সহ্য করতে পারতেন না।"

"তাই বুঝি? ঠিকই করেছিলেন সুপ্রিয়বাবু। গুরুনিন্দা সহ্য করবেন কেন তিনি?"

অমিতাভ বোধ হয় এবার মদালসার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়েছিল। কিন্তু মদালসা ভাবলো, তার অবিন্যস্ত চুলগুলোর দিকে অমিতাভর নজর পড়ে গিয়েছে। অনেক 'অ্যাপলজি' ভিক্ষা করলো সে এবং বললে, "কী করবো বলুন—এখানে একটাও হেয়ার-ড্রেসার নেই।"

অমিতাভ উত্তর দিলে, "আমি অন্য কথা ভাবছিলাম। যদি রাগ না করেন তো বলি।"

"রাগ করবো না, কথা দিচ্ছি।"

"এই রকম মাথায় মৌমাছিরা হঠাৎ চাক শুরু করে না দেয়।"

"এ্যাঁ, কী বলছেন আপনি! এখানে মৌমাছি আছে বুঝি?" মদালসা বেশ ভয় পেয়েই জিগ্যেস করে।

"পোকা-মাকড়ের আড়ত এটা, বুঝতেই পারছেন। ওরা একবার আকৃষ্ট হলে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে আসতে আরম্ভ করবে।" অমিতাভ গম্ভীর ভাবে জানাল।

"সর্বনাশ! তাহলে কী হবে?" মদালসা কাঁদ-কাঁদ কণ্ঠে জিগ্যেস করে।

"ডি-ডি-টি ছড়ালে চলে যেতে পারে। কিন্তু এখানে আমরা আবার ডি-ডি-টি ছড়াই না। আপনার বাবার কাছ থেকে কোনো প্যারাসাইটের নাম জেনে মৌমাছিদের পিছনে লেলিয়ে দিতে হবে!"

এবার রসিকতা বুঝতে পেরেছে মদালসা। চোখ দুটো বড় বড় করে আহত কণ্ঠে জিগ্যেস করলে, "আপনার বুঝি এই রকম হেয়ার স্টাইল পছন্দ হয় না?"

"কে বলেছে?" অমিতাভ ক্ষমা চায়। হাজার হোক গুরুকন্যা—

প্রথম নিভৃত আলাপেই এতটা রসিকতা করা ঠিক হচ্ছে না।

আর একটুখানি টাইপ করবার অনুমতি চেয়ে নেয় অমিতাভ। কিন্তু কাজে মন বসানো শক্ত বোধ হয়। মদালসা হাঁ করেই মেশিনের দিকে তাকিয়ে বসে আছে।

"আপনার খুব খারাপ লাগছে নিশ্চয়!" অমিতাভ জানতে চায়।

"এই তো ক'দিন হলো এসেছি, এর মধ্যেই হাঁপিয়ে উঠেছি। এখানে কোনো সোসাইটি নেই, ক্লাব নেই, ভাল সিনেমা হল নেই।" মদালসা নিজের ছোট্ট ছোট্ট ফুলো ফুলো আঙুলগুলো নাচাতে নাচাতে অমিতাভকে বলে।

"কেন? এখানকার কিছু পছন্দ হচ্ছে না আপনার?" অমিতাভ টাইপ করতে করতেই জানতে চায়।

"সে-সব পরে বলবো। এখন চলুন—মা হয়তো তৈরি হয়ে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন।"

"এসো বাবা।" সাদর আহ্বান জানালেন ঈশিতা সেন।

"ক'দিন থেকেই আমি আর খুকুমণি ফন্দি আঁটছি, তোমার সঙ্গে একটু ভাবটাব করবো।"

মদালসা রেগে গিয়ে বললে, "মা-মণি, তুমি আমার ডাকনাম ফাঁস করে দিলে কেন? বিশ্রী নাম একটা। ধাড়ি হয়ে মরতে চললাম, এখনও খুকুমণি।"

"ধাড়ি ধাড়ি করবি না। একুশ বছর বয়সে আজকাল কেউ ধাড়ি হয় না। তাই না বাবা অমিতাভ, তুমি কী বলো?" মিষ্টি হেসে অমিতাভর মতামত জানতে চাইলেন ঈশিতা সেন।

"সে তো বটেই," অমিতাভ সায় দেয়।

"তা বাবা, তোমারও তো বয়স কম। সাতাশ-আটাশের বেশী কিছুতেই নয়!" ঈশিতা প্রশ্ন নিক্ষেপ করেন।

"প্রায় তিরিশ হতে চললাম। অমিতাভ উত্তর দিলে।

সযত্নে প্রসাধন করেছেন ঈশিতা। একটা শাদা খোলের টাঙাইল শাড়ি

পরেছেন তিনি। সঙ্গে হাতা কাটা ব্লাউজ। এই বয়সেও মেদাধিক্য নেই কোথাও, থোড়ের মতো সুডৌল হাত দুটি নেমে এসেছে।

সেই হাত বাড়িয়েই অমিতাভর কাপে চা ঢেলে দিলেন ঈশিতা। দিতে দিতে জিগ্যেস করলেন, "কোথায় দেশ তোমাদের?"

"কলকাতাই বলতে পারেন।" অমিতাভ উত্তর দেয়।

"তাই নাকি? আমাদেরও তাই।" মেপে মেপে মিষ্টিভাবে উত্তর দিচ্ছেন ঈশিতা।

মদালসা বললে, "কই, খাচ্ছেন না তো কিছু?"

অমিতাভ বললে, "আমি বেশ তো খাচ্ছি। আপনিই বরং…"

"ওর কথা বোলো না বাবা, সব হিসেব করে খাওয়া। এক ফোঁটা এদিক ওদিক হলে নাকি ওজন বেড়ে যাবে। আমরাও তো বাপু একদিন ওদের বয়সী ছিলাম। কিন্তু যা পেতুম খেতুম।"

পায়ের সোনালী নাগরা জুতোটা নাচাতে নাচাতে মদালসা বললে, "ও সব বাজে কথা বোলো না মা-মণি। তুমি এখনও একবেলা কিছুই খাও না বলতে গেলে।"

মা-মণি বললেন, "তোদের বয়েস আর আমাদের বয়েস? আমাদের এখন বেশী খেলেই বাতে ধরবে।"

অমিতাভর ডিশে আর একটা মিষ্টি তুলে দিয়ে ঈশিতা বললেন, "ওর বাবা তোমাকে খুব ভালবাসেন। তোমার মতো ভাল ছাত্র নাকি উনি দেখেননি।"

"ভালবাসেন বলেই মাস্টারমশাই একটু বাড়িয়ে বলেন," অমিতাভ চায়ে চুমুক দিয়ে বলে।

"আমার এই মেয়েটিও বড় গুণের মেয়ে। আমার সব মেয়েই অ্যাকমপ্লিসড্—বড় প্রিয়ংবদা ভাল আঁকতে পারে। বাবা বেঁচে ছিলেন তখন, আমরাও বিলেতে ছিলাম, জোর করে প্যারিতে পাঠিয়ে দিলেন। মেজ মেয়ে সুস্মিতা ইংরিজীতে এম-এ। সেজ মেয়ে চিত্রাও আর্ট কলেজ থেকে ডিপ্লোমা নিয়েছে। আর আমার এই মেয়ে লোরেটো থেকে ইংলিশ অনার্স পেয়েছে। কিন্তু সেটা কিছুই নয়। ওর অন্য যেসব গুণ আছে—"

"আঃ মা, মেয়ের গুণকীর্তন আরম্ভ করলে এবার।" মদালসা সলজ্জ মৃদু প্রতিবাদ জানায়।

আদর করে মেয়ের কপাল থেকে একটা চুল সরিয়ে দিতে দিতে ঈশিতা বললেন, "গুণকীর্তন কেন, যা সত্যি তাই বলছি। আর অমিতাভ তো আমাদের ঘরের ছেলে, মাস্টারমশাইয়ের মেয়ে সম্বন্ধে ওর জানতে ইচ্ছে করে না? ইংরিজী বাজনায় খুব ঝোঁক মেয়ের—ক্যালকাটা স্কুল অফ মিউজিকে প্রাইজও পেয়েছে। তুমি যখন কলতাতায় আসবে, চেম্বার কনসার্টের ব্যবস্থা করবো। শুধু বাজনা নয়, টেবিল টেনিস খেলে খুব ভাল। সাঁতারেও এক্সপার্ট। ওর মাথাটা এমন, যা ধরে তাতেই ভাল করে।"

"মাস্টারমশাইয়ের লাইনে এলেন না কেন?" অমিতাভ এবার মদালসার চঞ্চল চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলে।

"পোকামাকড়? রক্ষে করুন! আরশোলা দেখলে আমার যা অবস্থা হয়।" মদালসা বলে।

"তোমার মাস্টারমশাইয়ের লাইন? রক্ষে করো বাবা। আমি তো সারাজীবন দেখছি," ঈশিতা গম্ভীরভাবে বলেন। "বরং ও যদি ব্যারিস্টার হতে চায়, এখনও চেষ্টা করে দেখতে পারে। জগদানন্দ বোসের নাতনী শুনলে অনেক এটর্নি এখনও ব্রীফ নিয়ে ছুটে আসবে।"

মাস্টারমশাইয়ের কথা উঠতেই ঈশিতা কায়দা করে দু'একটা খবর জানতে চাইলেন। "বিলেতে থাকতে থাকতেই ওঁর মাথায় কী যে আইডিয়া এল।"

"আপনি বায়োলজিক্যাল কণ্ট্রোলের কথা বলছেন?"

"হ্যাঁ বাবা। আমরা মেয়েমানুষ, চালের কণ্ট্রোল, ডালের কণ্ট্রোল, তেলের কণ্ট্রোলের কথাই জানতাম, এখন আবার এই সব নতুন কণ্ট্রোলের কথা শিখছি।"

"এ লাইনে সম্ভাবনা আছে প্রচুর," অমিতাভ গুরুপত্নীকে জানায়।

"কী সম্ভাবনা বাবা? বার বছর তো হতে চললো ওঁর এই কাজে। ঘরসংসারের সব দায়িত্ব আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে বার বছর তো পোকা ঘাঁটছেন। কই কী হলো?"

"কখন কোথা থেকে কী হয়, কেউ বলতে পারে না মিসেস সেন।"

"তা সত্যি। উনি যেভাবে পর পর দুটো ইনসেকটিসাইডের পেটেন্ট পেয়ে গিয়েছিলেন!"

অমিতাভ বললে, "এ লাইনে অবশ্য পেটেন্ট হয় না। উনি তো নতুন পোকার সৃষ্টি করবার চেষ্টা করছেন মাত্র। তার কোনো পেটেন্ট নেবার নিয়ম আছে বলে শুনিনি তো! তা ছাড়া ওঁর পেটেন্ট নেবার ইচ্ছেও নেই।"

"তাই বুঝি?" ঈশিতা দুঃখের সঙ্গে জিগ্যেস করলেন। "প্রথমতঃ আবিষ্কারের আশা নেই বললেও চলে এবং দ্বিতীয়তঃ আবিষ্কার হলেও কোনো লাভ নেই।" ঈশিতা সংবাদের শেষ অংশটুকুতে সম্পূর্ণ হতাশ হয়েছেন।

"পেনিসিলিন যিনি আবিষ্কার করেছিলেন, তিনি পেটেন্ট নেননি। টলস্টয় তাঁর বইয়ের কপিরাইট ছেড়ে দিয়েছিলেন শুনেছি," অমিতাভ বলল।

"হ্যাঁ বাবা, নামের মোহটা সংসারে সবচেয়ে কঠিন মোহ," ঈশিতা গম্ভীরভাবে বললেন। পুরুষ মানুষরা সংসারে সুখ দুঃখটা সবসময়ে মাথায় রাখতে চায় না। যাক বাবা, যা বলছিলাম, খুকুর বাবাকে তো জানোই—উদাসী মানুষ, তোমাকে বাড়িতে আসতে বলার কথাও ওঁর মনে থাকে না। তুমি বাবা এসো, অন্ততঃ আমরা যতদিন আছি প্রায়ই চলে আসবে। এখানে খুকুমণির একমাত্র বন্ধু তুমি। তোমাদের দু'জনের যখন ভাব হয়ে গেল তখন আর সঙ্কোচের কারণ নেই।"

জীমূতবাহন এই সময় উপস্থিত থাকলে মদালসার দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারতেন, এই প্রস্তাবে তাঁর মেয়েরও কোনো আপত্তি নেই। অমিতাভ অবশ্য স্বাভাবিক সঙ্কোচবশতঃ মদালসার দিকে তাকায়নি।

"এখনই উঠছো কেন বাবা, এই তো এলে।" অমিতাভকে উঠতে দেখে ঈশিতা বাধা দিলেন।

"আরও এক কাপ চা খাও। গরম করে দিচ্ছি।"

মেয়েকে ঈশিতা বললেন, "তুই অমিতের সঙ্গে কথা বল, আমি জল নিয়ে আসি।"

অমিতাভ এবার মদালসাকে বললে, "সেদিন আপনাকে যেভাবে হুকুম করেছিলুম, তার জন্যে ক্ষমা চাইছি। খুব রেগে গিয়েছিলেন আপনি।"

"খুব নয়, একটু রেগেছিলুম। পরে যখন দেখলাম আপনার উপায় নেই, তখন রাগ পড়ে গেল।"

চায়ের জল নিয়ে ঈশিতা ঘরে ঢুকলেন। হাসতে হাসতে বললেন, "শুনলাম, পোকার বাচ্চাদের তুমি খুব যত্ন করতে পারো।"

"মাস্টারমশাইয়ের তুলনায় আমি কিছুই পারি না। উনি যেভাবে লার্ভিদের ফিড্ করান, দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়।"

চা ঢালতে ঢালতে ঈশিতা বললেন, "কী জানি বাবা, সংসারে কোনোদিন তো কুটোটি নেড়ে দুটো করেননি। খুকুমণি তখন দু'মাসের বাচ্চা। এমনভাবে ফিডিং বোতল ধরেছিলেন যে, খুকুমণি বিষম খেয়ে যায় আর কী!"

"আপনি চা খাবেন না?" মদালসাকে জিগ্যেস করলে অমিতাভ।

"ওকে এই সময় আর চা দিই না—এক গ্লাস করে হরলিক্স খায়। তাও খাওয়ানো যা কষ্টকর, সারাক্ষণ সামনে বসে থাকতে হবে, বকতে হবে তবে খাবেন।" ঈশিতা নিজের দিকেও এক কাপ চা টেনে নিলেন।

চা মুখে দিয়েই মুখ কুঁচকোলেন ঈশিতা। "এই চা তোমার খুব খারাপ লাগবে। এমন বিশ্রী জায়গা, ভদ্রলোককে দেবার মতো একটু চা-ও মেলে না। এ-জানলে কলকাতা থেকে একটু চা আনতাম।"

"কিছু দরকার নেই," অমিতাভ বললে।

"আমার বাবা খুব চা খেতে ভালবাসতেন। আমার তিনটি জামাইও চায়ের ভক্ত।"

"আর আসল ব্যাপারটা তো বলছো না মা," মদালসা অভিযোগ করলে।

একটু লজ্জিতভাবেই ঈশিতা বললেন, "ও কিছু নয়।"

মদালসা ব্যাপারটা ফাঁস করে দিল, "রবীন্দ্রনাথ মায়ের হাতের তৈরি চা খেতে ভালবাসতেন। দাদুর বাড়িতে এলেই বলতেন, ঈশিতা কই, সে যেন চা তৈরি করে!"

"তাই বুঝি?" অমিতাভ বিস্ময়ের সঙ্গে জিগ্যেস করলে।

"ওই জন্যেই তো মাকে অত ঘন ঘন চিঠি লিখতেন রবীন্দ্রনাথ।

অন্ততঃ দু'শো চিঠি আছে মা'র কাছে।" মদালসা জানায়।

"এগুলো বার করেন না কেন?" অমিতাভ ঈশিতাকে জিগ্যেস করে।

মা'র হয়ে মদালসাই বললে, "ব্যক্তিগত চিঠি কাগজে ছাপানো মা'র ইচ্ছে নয়।"

সলজ্জ হেসে ঈশিতা বললেন, "এখন যত্ন করে রেখে দিয়েছি, মদালসার বিয়ে হয়ে গেলে ওকেই দিয়ে দেবো।"

লজ্জায় মুখ লাল করে খুব রাগের সঙ্গে মদালসা বলেছিল, "তুমি যা অসভ্য, মা।"

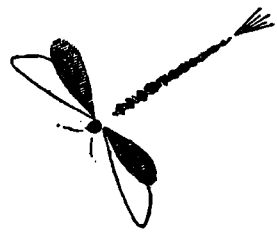

মদালসা। মদালসা। নামটার মধ্যে সত্যিই মাদকতা আছে। এতো মেয়ের কথাই তো শুনেছে অমিতাভ—কিন্তু মদালসা নামটা একবারও কানে আসেনি। শুধু নামে নয়, মদালসার দেহে এবং ব্যবহারেও কি কোনো মাদকতা আছে?

মদ্যপানে অলস যে সে মদালসা। ভাল বাংলা না জেনেও অমিতাভ সেটা বোঝে। কিন্তু মদালসা সম্পূর্ণ অন্য।

মদালসা নিজেই একদিন অমিতাভকে পুরাকালের সেই প্রখ্যাত গন্ধর্ব রাজকন্যা মদালসার কাহিনী বলেছিল। ঋতধ্বজ নামক এক সাহসী রাজকুমারের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল তার। স্বামী মৃত এই মিথ্যা সংবাদ পেয়ে যুবতী মদালসা শোকে অভিভূত হয়ে মৃত্যু বরণ করেছিল। স্বামীর বহু সাধ্যসাধনায় তার পুনর্জীবন হয়েছিল। তারপর মায়াময় এই সংসারের মায়া মদালসাকে আর মোহিত করতে পারেনি। মদালসার একটি সন্তান জন্মাল, মদালসা তাকে এমন শিক্ষা দিল যে, রাজপুত্রের সংসারে প্রবৃত্তি হলো না। আবার সন্তান হলো মদালসার, আবার তাকে সেই শিক্ষা দিল মদালসা—মায়ামুক্তির শিক্ষা। স্বামী ঋতধ্বজ তৃতীয় সন্তানের বেলাতেও কিছু বলেননি। কিন্তু শঙ্কিত অবস্থায় চতুর্থবারে অনুরোধ করলেন, এবার সন্তানটিকে অন্ততঃ সাংসারিক শিক্ষা দাও—না হলে এই রাজত্বের ভার কার ওপর রেখে যাবো?

খুব হেসেছিল এই গল্প শুনে—অমিতাভ ও মদালসা। অমিতাভ লক্ষ্য করছে, মদালসার মধ্যে প্রজাপতির মতো একটা হাল্কা স্বাচ্ছন্দ্য আছে—

আর তার থেকেও বড় কথা, পৃথিবীর সুখ, সৌন্দর্য ও আনন্দ উপভোগের প্রচণ্ড ক্ষুধা আছে। স্বাস্থ্যকর ক্ষুধা এবং সেই ক্ষুধা চেপে রাখবার চেষ্টা করে না মদালসা।

মধ্যিখানে ইন্দুমতী এসেছিল। ইন্দুমতী গম্ভীর গোবেচারি মানুষ। মাস্টারমশাই ছাড়া আর কারুর সঙ্গে তেমন মন খুলে জোর দিয়ে কথা বলে না। ইন্দুমতীও এবার একটু ইন্ধন জুগিয়ে গেল।

ইন্দুমতীকে স্টেশন থেকে আনবার জন্যে জীপ বার করছিল অমিতাভ। সেই সময় মদালসা এসে জিগ্যেস করলো, "কোথায় চললেন?"

"স্টেশনে—মিস্ দেশাইকে আনতে।"

মদালসা বললে, "মা সেদিন বাবাকে বকছিলেন—একটা ড্রাইভারের কতই বা মাইনে। শুধু শুধু আপনার ঘাড়ে বাজে কাজ চাপিয়ে দেওয়া।"

হেসে ফেললে অমিতাভ। "উল্টোদিক দিয়ে দেখুন, মাঝে মাঝে ড্রাইভ না করলে যদি ড্রাইভিং ভুলে যাই।"

"আহা, একদম বাজে কথা—সাঁতার, সাইকেল চালানো, মোটর ড্রাইভিং, বর্ণপরিচয় এগুলো লোকে একবার শিখলে আর ভোলে না।"

অমিতাভ বললে, "ও-সব পণ্ডিতদের কথা—আমি সামান্য ড্রাইভার, ওসব ঝুঁকি নিতে পারবো না।"

মদালসা বললে, "আপনারা কিছুই খবর রাখেন না। ক্যানটনমেণ্টে মিলিটারি অফিসারদের বৌদের জন্যে একটা হেয়ার ড্রেসিং সেলুন খোলা হয়েছে।"

"তাই নাকি?" অমিতাভ লজ্জিতভাবে বলে।

"একবার আপনার গড়িতে যেতে পারলে হতো, অবশ্য যদি না আপনার কোনো আপত্তি থাকে।" মদালসা কথাটা বলে মুখ ফিরিয়ে নিলেও, আড়চোখে অমিতাভর দিকে তাকাতে লাগল।

"আমার কোনো আপত্তিই নেই। স্টেশন ওয়াগনে আপনাকে এবং ইন্দুমতী দেশাইকে বসিয়েও অনেক জায়গা থেকে যাবে।"

মদালসাকে চুলের দোকানে বসিয়ে দিয়ে, অমিতাভ বললে, "ড্রেস হয়ে গেলে আপনি এখানেই অপেক্ষা করবেন। স্টেশন থেকে সোজা চলে

আসবো এখানে।"

কুলি ডাকবার জন্যে গাড়ির জানলা দিয়ে মুখ বার করেই ইন্দুমতী অমিতাভকে দেখতে পেল। "আরে আপনি?"

অমিতাভ জিগ্যেস করলে, "ক'টা কুলি লাগবে?"

ইন্দুমতী বললে, "লটবহর অনেক—তিনটে তো বটেই।"

স্টেশন ওয়াগনে মাল বোঝাই করতে করতে অমিতাভ বললে, "রেল কোম্পানি বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন, যথাসম্ভব কম মালপত্র নিয়ে ভ্রমণ করুন।

ইন্দুমতী বললে, "আমার নিজের একটা ব্যাগ। কিন্তু বাবা এক কাঁড়ি জিনিস ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেন—মাস্টারমশাইয়ের জন্যে গাছগাছড়া, পোকা-মাকড়, ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি জড়ো করেছেন।"

গাড়িতে স্টার্ট দিলে অমিতাভ। ইন্দুমতী জিগ্যেস করলে, "মাস্টারমশাই কেমন আছেন?"

"ভালই। মিসেস সেন এখানে রয়েছেন।"

"হ্যাঁ, ওঁর আসার খবর মাস্টারমশাই লিখেছিলেন—খুব ভাল হয়েছে। আমার বাবা তো এক মুহূর্ত মাকে ছাড়া থাকতে পারেন না।"

"মাস্টারমশাই আপনাকে খুব চিঠি লেখেন বুঝি?" অমিতাভ গাড়ি চালাতে চালাতে জিগ্যেস করলে।

"মাস্টারমশাইয়ের সব চিঠি আমি যত্ন করে রেখে দিই। একদিন এর দাম হবে। তবে আজকালকার চিঠিতে মাস্টারমশাই শুধু আপনার কথা লেখেন।"

"আমার কথা?"

"হ্যাঁ, মাস্টারমশাই তো সোজাসুজি লিখেই দিয়েছেন, আমার জীবনে এমন ছাত্র ও সহকারী কোনোদিন পাইনি।"

"তাই নাকি?"

ইন্দুমতী বললে, "মাস্টারমশাইকে আপনি একেবারে বশ করে ফেলেছেন। নিবেদিতা ল্যাবরেটরিতে আমার নিজের একটা ভবিষ্যৎ ছিল, সেটা গেল।"

ক্যানটনমেণ্টের কাছে গাড়ি এসে গিয়েছে। মার্কেটের সামনে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে অমিতাভ হেয়ারড্রেসারের দোকানে ঢুকে পড়ল। মদালসা তার জন্যেই অপেক্ষা করছিল।

ইন্দুমতীও গাড়ির বাইরে বেরিয়ে এসেছিল।

অমিতাভ বললে, "এঁকে চিনতে পারছেন মিস্ দেশাই? মাস্টার-মশাইয়ের সবচেয়ে ছোট মেয়ে মদালসা।"

হাত জোড় করে নমস্কার করলে ইন্দুমতী। "আপনাকে দেখিনি কোনোদিন। তবে আপনার কথা শুনেছি অনেক। মাস্টারমশাইয়ের প্রিয় মেয়ে আপনি।"

মদালসা গাড়িতে উঠতে উঠতে গম্ভীরভাবে বললে, "বাপি আমাকেই বেশী ভালবাসেন।"

অমিতাভ বললে, "আপনাকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি তো?"

"একবার আলোটা জ্বালুন তো। দেখুন না, চুলটা কেমন করেছে। একেবারে জোচ্চোর দোকান। কিচ্ছু জানে না—আমাকেই দেখিয়ে দিতে হলো। লেটেস্ট স্টাইলগুলোর নামও শোনেনি।"

গাড়িতে স্টার্ট দিতেই মদালসা বললে, "আগে কাঁচগুলো বন্ধ করে দিন —না হলে কালকেই আবার দোকানে আসতে হবে।"

"আসতে হয় আসা যাবে।" অমিতাভ রসিকতা করলে।

"তাতে আপনার অমূল্য সময় নষ্ট হবে। আপনার কাজের ক্ষতি হবে।" মদালসা এক মুহূর্ত দেরি না করেই উত্তর দিল।

ইন্দুমতী এবার মদালসাকে বললে, "আমি যে ক'দিন আছি কোনো চিন্তা নেই। অমিতাভ বাবুর কয়েকঘণ্টার ডিউটি আমি চালিয়ে নিতে পারবো।"

মদালসা গম্ভীরভাবে বললে, "ওঁর দর বাবা যথেষ্টই বাড়িয়ে দিচ্ছেন— আর বাড়াবার দরকার নেই। ওঁকে বাদ দিয়ে—মিস্ দেশাই আর আমি দু'জনে চলে আসতে পারবো।"

ইন্দুমতী এবার বেশীদিন থাকেনি। কিন্তু যে ক'দিন ছিল মাস্টারমশাইকে

যতটা পারে সাহায্য করেছে।

মদালসাকে নিয়েও মজা করতো সে। মদালসা অনেক সময় সাহস করে ল্যাবরেটরির ভিতর যেখানে জীমূতবাহন ও অমিতাভ কাজে ব্যস্ত, সেখানে ঢুকতো না।

ইন্দুমতী তাকে দেখলেই বলতো, "এই যে আসুন মিস্ সেন। এই শাড়িটাতে আপনাকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে।"

মদালসা বলতো, "চটির সঙ্গে ঠিক ম্যাচিং হলো না। এখানে মাত্র পাঁচটা চটি এনেছি আমি। মা'র চটি আছে অনেকগুলো, কিন্তু আমার পায়ে ঢোকে না।"

ইন্দুমতী বলে, "আমি তো বোম্বাই ফিরছি। যদি মাপ দিয়ে দেন, রঙ বলে দেন, এনে দিতে পারি।"

"আপনি শীঘ্র আসবেন?"

"হ্যাঁ, তাড়াতাড়িই আসতে হবে—মাস্টারমশাইয়ের হুকুম—নতুন একটা এক্সপেরিমেণ্ট হবে, যা ভারতে কখনও হয়নি।"

মদালসা বলে, "ডক্টর মিত্র কোথায়?"

ইন্দুমতী বলে, "আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি। দিনরাত কাজের মধ্যে ডুবে রয়েছেন ভদ্রলোক; দেখুন না যদি বার করে নিয়ে একটু টাটকা হাওয়া খাওয়াতে পারেন।"

মাস্টারমশাই, ঈশিতা সেন, মদালসা—এদের সবার কথা সেদিন ল্যাবরেটরিতে বসে বসে ভাবছিল অমিতাভ মিত্র।

কাজ ছাড়া অন্য কোনো ব্যাপারে মাস্টারমশাইয়ের আগ্রহ নেই। বাড়ির মেয়ে এবং স্ত্রী সম্বন্ধে অমিতাভর কাছে কোনো কথাই বলেন না। অবশ্য গম্ভীর মানুষ তিনি, কী বলবেন?

মিসেস সেন কিন্তু অনেক কথা বলেন। তাঁদের প্রথম জীবনের কথা—জীমূতবাহনের 'স্বর্ণযুগ' যাকে বলেন ঈশিতা। তাঁর মেয়েদের কথা, তাদের কৃতী স্বামীদের কথা—কেমন মোটা টাকার চাকরি করছে তারা, তার গল্প।

উলের সোয়েটার বুনতে বুনতে ঈশিতা বলেন, "স্বামীর কাছে মেয়েরা

কী আশা করে জান বাবা ?"

অমিতাভ চুপ করে থাকে। ঈশিতা নিজেই বলেন, "তোমরা হয়তো ভাবছো প্রেম এবং অর্থ। মেয়েদের মনের ভেতরে যখন ঢুকবে, তখন দেখবে এ দুটো দরকারি কথা, কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা নয়। প্রিয় সখী থেকে মেয়েরা যখন মা হয়, তখন তারা স্বামীর কাছ থেকে দায়িত্ববোধ আশা করে।"

অমিতাভর কাপে চা ঢালতে ঢালতে ঈশিতা আবার বললেন, "ভগবানের আশীর্বাদে আমার মেয়েদের স্বামীভাগ্য ভাল। অজয়, সুপ্রিয়, দেবকুমার—এরা চমৎকার ছেলে, এদের দায়িত্ববোধ দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। কিছু মনে কোরো না বাবা, আমি বড় ফ্র্যাংক। আমার বাবা বলতেন, কখনও গুজগুজে ফুসফুসে হবি না। আমার মেয়েদেরও সেই শিক্ষা দিয়েছি। তারা আমার কাছে এসে সব কথা বলে।"

উলের কাঁটাটা আবার তুলে নিয়ে ঈশিতা বললেন, "হ্যাঁ, যা বলছিলাম —সন্তানের ওপর দায়িত্ব শুধু মায়ের একার নয়। বাবারও সমান দায়িত্ব—কিন্তু সংসারে কেউ কেউ সে কথা মনে রাখে না। বাইরের নেশায়—সে টাকারই হোক, নামেরই হোক, বা অন্য মেয়েরই হোক—অনেকে নিজেদের প্রধান দায়িত্ব, যে দায়িত্ব ঈশ্বর তাঁর ওপর দিয়েছেন, তার কথা ভুলে যায়।"

তারপরেই হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে ঈশিতার মুখ। "কী সব বাজে বকছি! আর বল কেন, এই পাণ্ডববর্জিত জায়গায় তোমার মতো বুদ্ধিমান ছেলে পেলে বক বক করতে ইচ্ছে হয়।"

"সে তো বটেই," অমিতাভ বলে।

ঈশিতা হাসতে হাসতে বলেন, "আমি বাপু বয়সে ছোটবড় মানি না। প্রাপ্তবয়স্ক হলে সবাই সমান। আমার মেয়েরা আমার বন্ধু। আমার জামাইরাও আমার কাছে খুব ফ্র্যাংক—আমার বন্ধুরই মতো।"

"তাই তো হওয়া উচিত," অমিতাভ বলে।

ঈশিতা বলেন, "উনি কিন্তু তা পারেন না। সবসময় কোথায় যেন একটু দূরত্ব থেকে যায়!"

আজকাল অমিতাভ সময় পেলে সেন পরিবারের কথা মাঝে মাঝে চিন্তা করে। কাজ যথেষ্ট আছে—কিন্তু রোমন্থন মন্দ লাগে না।

সেদিন কতকগুলো ফড়িং-এর সামনে একটা উঁচু টুলে বসে অমিতাভ নোট লিখছিল। লেখা থামিয়ে মাঝে ঐসব চিন্তাও করছিল। এমন সময়ে মদালসার আবির্ভাব।

পেন্সিলের মতো ছুঁচলো সালোয়ার পড়েছে মদালসা। দেহের বন্ধুরতা উচ্চৈঃস্বরে বিজ্ঞাপিত হয়েছে।

"এই কিম্ভূতকিমাকার ফড়িংগুলো নিয়ে কি করছেন?" মদালসা প্রশ্ন করে।

গম্ভীরভাবে অমিতাভ বললে, "ফড়িং বলতে আমাদের কাছে হাজার রকমের ফড়িং বোঝাতে পারে। যাঁদের দেখছেন এঁদের বৈজ্ঞানিক নাম হিরোগ্লাইফাস নাইগ্রোরেপ্লিটাস। ১৯৩৭ সালে এঁরা নেলোরে আখের ক্ষতি করেন। ১৯৪৫ সালে বেনারস এবং আজমগড়ের চাষীরা এঁদের অত্যাচারে চোখের জল ফেলেছিল। এঁদের পরিবারের সদস্যরা ১৯৪৯ সালে আজমীরে ষাট লক্ষ টাকার জওয়ার খেয়ে ফেলেছিলেন।"

"এখন তো দেখছি আপনিই এদের খেতে বসেছেন," মদালসা হাসতে হাসতে বলে।

"আপনার বাবার কড়া হুকুম—বিশটি ফড়িং দম্পতির প্রেমোপাখ্যান রচনা করতে হবে।"

"মানে?"

"মানে, জন্মের কতদিনের মধ্যে এঁরা সাবালক হন, কীভাবে এঁদের বিয়ে হয়, বিয়ের কতদিনের মধ্যে বাচ্চা হয়, এইসব লক্ষ্য রাখতে হচ্ছে। এক নম্বর শিশিতে যে দম্পতিকে দেখছেন, এঁদের দুজনের বয়েস বারোদিন। পাঁচদিন আগে বিয়ে হয়েছে—আর আজই দুটি ডিমের পুঁটলি উপহার দিয়েছেন।"

"এবারে কলকাতায় ফিরে আমরা একটা ব্যালে করবো—ফড়িং-এর সংসার!" মদালসা বললে।

কাজ পড়ে রয়েছে অনেক। কিন্তু মদালসা প্রায় জোর করেই অমিতাভকে বাইরে টেনে আনল ব্যাডমিন্টন খেলার জন্যে।

মদালসা আব্দার করে বললে, "খেলাধুলো না করে শরীরে জং ধরে

যাচ্ছে আমার। এইভাবে চললে শিগগির আমার ওজন এক টন হয়ে যাবে। গতকাল মাকে খেলতে নামিয়েছিলাম। আজ মা'র শরীরে খুব ব্যথা হয়েছে। পার্টনার পাচ্ছি না—মা বললেন আপনাকে পাকড়াও করতে।"

অগত্যা খেলায় নামতে হলো অমিতাভকে।

কিন্তু জীমূতবাহনও যে ঠিক সেই সময় অমিতের খোঁজ করবেন তা কেমন করে জানা যাবে? ল্যাবরেটরিতে ঢুকে জীমূতবাহন দেখলেন ঘর খালি। অমিতাভর নোটবইটা খোলা পড়ে রয়েছে। একটু অপেক্ষা করলেন তার জন্যে। কিন্তু কোথায় অমিতাভ?

বাড়ি যাবার দরকার ছিল জীমূতবাহনের—বিকেলে স্নান করলে সন্ধ্যা-বেলায় অনেকক্ষণ কঠিন কাজগুলো করা যায়। বিকেলের সোনার রোদ মাঠের মধ্যে সোনালী আলপনা কাটছে। বাড়ি ফেরার পথে ব্যাডমিন্টন খেলার দৃশ্য দেখতে পেলেন জীমূতবাহন।

একটা নেটের দু'দিকে দাঁড়িয়ে তাঁর প্রিয় শিষ্য অমিতাভ এবং তাঁরই মেয়ে মদালসা খেলায় মেতেছে। অমিতাভ উঁচু করে সার্ভ করল, মদালসা সজোরে বলটা ফিরিয়ে দিলে। কিন্তু অমিতাভ সহজভাবেই বলটা আবার তুলে দিল। মদালসা নিপুণভাবে চাপ মারলে, অমিতাভ টুক করে ব্যাটটা সামান্য ঠেকিয়ে দিয়ে মদালসাকে ঠকাবার চেষ্টা করলে, কিন্তু তীরের মতো এগিয়ে এসে বলটা আবার অমিতাভর কোর্টে পাঠিয়ে দিল মদালসা। উত্তেজনায় মদালসা হাঁপাচ্ছে, তার বুকটা দ্রুত ওঠা-নামা করছে, কিন্তু সে কিছুতেই অমিতাভর কাছে হেরে না যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। মদালসা মাঠময় ছোটাছুটি করছে, তার লাল রঙের দোপাট্টা সবুজ ঘাসের ওপর পড়ে রয়েছে।

আর একটা বল মারতে মারতে মদালসা বললে, "আপনাকে হারিয়ে ছাড়বো।"

"দেখা যাক," বলে হাসতে হাসতে আর একটা বল মারলে অমিতাভ।

হঠাৎ চমকে উঠলেন জীমূতবাহন। তাঁর মাথাটা যেন সামান্য ঘুরছে। নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরির সবুজ আঙিনায় এই খেলা আগেও দেখেছেন জীমূতবাহন। কিন্তু সে তো বহুদিন আগে—অনেকদিন এ-খেলা বন্ধ ছিল।

সব মনে পড়ছে জীমূতবাহনের। সুপ্রিয়র সঙ্গে তাঁর সমর্থ মেয়ে চিত্র-

লেখাকে এই মাঠেই তো খেলতে দেখেছেন তিনি। একান্ত প্রিয় সহকারী দেবকুমারকে তাঁর স্পোর্টসম্যান মেয়ে সুস্মিতা এই মাঠেই তো গেম দিয়েছে। তাঁর আর এক ছাত্র অজয়ও এই মাঠেই আর এক মেয়ে প্রিয়ংবদার কাছে হেরে গিয়েছে। ঈশিতা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মেয়েদের খেলা দেখেছেন।

জীমূতবাহনের বেশ মনে পড়ে যাচ্ছে, একবার জোর করে তাঁকেও মাঠে নামিয়ে দিয়েছিল সুস্মিতা। ঈশিতা ভারসাস জীমূতবাহন। অনভ্যস্ত জীমূতবাহন গোহারান হেরে গিয়েছিলেন। র‍্যাকেট হাতে তাঁর ব্যর্থতা দেখে সবাই হেসেছিল সেদিন্।

স্বামীকে নিল-গেম দিয়েছিলেন সেদিন ঈশিতা। তারপরও তো বার বার নিল-গেমই দিয়ে চলেছেন ঈশিতা। বার বার জীমূতবাহন শিষ্য সংগ্রহ করেছেন, নিজের হাতে শিক্ষা দেওয়া শুরু করেছেন, আর ছিনিয়ে নিয়েছেন ঈশিতা। প্রিয়ংবদা, চিত্রলেখা, সুস্মিতা এরা যে তাঁরও মেয়ে, ঈশিতা সে কথা বার বার মনে করিয়ে দিয়েছেন জীমূতবাহনকে।

জীমূতবাহন স্বীকার করছেন এরা তাঁরই মেয়ে। তাঁরই রক্তের ধারা প্রবাহিত হচ্ছে এদের ধমনীতে, কিন্তু এদের শাড়ির দাম যে অনেক। ব্যারিস্টার জগদানন্দ বোসের মেয়ে ঈশিতা যে তাদের সেইভাবে মানুষ করেছেন। ঈশিতা এদের যে-জগতে স্থাপন করেছেন সেখানে বাড়ি হলেই হয় না, গাড়িও দরকার হয়। গাড়ি হলেই চলে না—ঘরে রঙ মেলানো কার্টেন দরকার হয়, দামি ফার্নিচার প্রয়োজন হয়। আয়া, বেয়ারা, কুক, ড্রাইভার, মালী, হেয়ারড্রেসার ইত্যাদি কত কি প্রয়োজন হয় তাদের। অনুগত অজয় বসু, দেবকুমার সরকার, সুপ্রিয় চৌধুরী কেমন স্ত্রীদের হুকুম তামিল করছে, তাদের প্রয়োজন মেটাবার জন্যে মন দিয়ে চাকরি করছে। তাদের এই অধঃপতন দেখে নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরির অর্ধপাগল জীমূত-বাহন সেন ছাড়া আর কারও মনে দুঃখ হয়নি।

দুঃখ! বরং আনন্দ হয়েছে। বিজয়গর্বে ফেটে পড়েছেন ঈশিতা।

বলেছেন, "দেখো, ওদের দিকে তাকিয়ে দেখো—আহা চোখ জুড়িয়ে যায়। একটা নয়, ভগবান চার চারটে মেয়ে দিয়েছেন। তোমার ওপর

নির্ভর করে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে এমন সব সোনার চাঁদ জামাই কোনোদিন হতো না।"

জীমূতবাহন কোনো কথা বলেননি। ঈশিতা শুনিয়ে দিয়েছেন, "আমার মায়েরও সাতটা মেয়ে ছিল, কিন্তু কোনোদিন তাঁকে চিন্তা করতে হয়নি, আমার বাবা সব করেছেন।"

যথাসময়ে চিত্রলেখা, সুস্মিতা, প্রিয়ংবদার কাছ থেকে সন্তান-সম্ভাবনার চিঠি এসেছে—শুভ সংবাদ পেয়েই ঈশিতা কলকাতায় ছুটে গিয়েছেন। তাদের সন্তান হওয়ার সময়ও উপস্থিত থেকেছেন। সেন তনয়াদের প্রয়োজনের তালিকা ক্রমশঃ আরও দীর্ঘ হয়েছে—বেবিফুড, দুধ, টনিক, খেলনা, ফ্রক, শার্ট, বাবা সুট, আয়া, গানের মাস্টার, নাচের মাস্টার, পড়ার মাস্টার, আরও কত কি তালিকায় যোগ হয়েছে। কিন্তু কই, কিছুই তো বলতে পারেননি জীমূতবাহন? একবারও তো মুখ ফুটে প্রতিবাদ করেননি জীমূতবাহন।

মনের এই অবস্থা নিয়ে জীমূতবাহন যখন ঘরে ঢুকলেন, তখন তাঁর চোখদুটো বোধ হয় ঘোলাটে হয়ে উঠেছিল। ঈশিতা জিগ্যেস করলেন, "তোমার শরীর খারাপ নাকি?"

"না, মোটেই না। বেশ ভাল আছি," প্রবল প্রতিবাদ জানালেন জীমূতবাহন।

বেশ হাসি হাসি মুখ যেন ঈশিতার। স্বামীর কাছাকাছি বসে ঈশিতা বললেন, "জানো, অজয় এবার প্রিয়ংবদাকে নিয়ে কোম্পানির খরচে বিলেত যাচ্ছে। যোধপুর পার্কে জমি কিনছে দেবকুমার। আমি লিখে দিয়েছি সুস্মিতার নামে জমি কিনতে।"

জোর করে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সিনথেটিক আনন্দ প্রকাশ করলেন জীমূতবাহন।

ঈশিতার আজ খুব আনন্দ। বুক থেকে আঁচলটা খসে পড়েছে। সেদিকে খেয়ালই নেই। কাঁধের কাছটা একটু চুলকে নিলেন ঈশিতা। তারপর খুব মিষ্টিভাবে আদুরে গলায় স্বামীকে বললেন, "তোমার সঙ্গে

কথা আছে। তোমার সঙ্গে পরামর্শ আছে।"

"আমার সঙ্গে পরামর্শ?" জীবনে কোনো বিষয়ে কোনোদিন পরামর্শ নেয়নি তো ঈশিতা। একদম মিথ্যে। নিশ্চয় অন্য কোনো মতলব এসেছে জগদানন্দ বোসের মেয়ের মাথায়।

খুব কাছে সরে এলেন ঈশিতা। ফিস ফিস করে বললেন, "বেশ ছেলেটি এই অমিতাভ। যেমন সুপুরুষ, তেমনি বিদ্বান। বাড়ির অবস্থাও বেশ ভাল। কেয়াতলায় ওর বাবা নতুন বাড়ি করেছেন।"

জীমূতবাহন মাথায় তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করছেন। মোটা কাচের চশমাটা খুলে টেবিলে রাখলেন তিনি। এতে একটা সুবিধে, ঈশিতা ঝাপসা হয়ে যায়। জীমূতবাহন বললেন, "দেখতে সুপুরুষ নিয়ে আমি কী করবো ঈশিতা। আমার চাই কাজের মানুষ, যে মন প্রাণ দিয়ে আমার সঙ্গে কাজে ডুবে থাকতে পারবে।"

"তোমার কাজের কথা বলছি না। তোমার কী মাথা খারাপ হলো। তোমার ল্যাবরেটরি নিয়ে তুমি যা খুশি করো।" বিরক্ত ভাবেই উত্তর দেন ঈশিতা।

"তবে?"

"আমি ভাবছি পাল্টি ঘর।"

"মানে?" জীমূতবাহনের দেহে কে যেন পেট্রোল ধরিয়ে দিল।

জীমূতবাহন যেন হতভাগ্য হোস্ট। ঈশিতা একটা বিশাল প্যারাসাইটের আকার ধারণ করে তাঁর দেহে ডিম ছেড়ে দিতে এসেছেন। প্রতিবাদ করবার চেষ্টা করছেন জীমূতবাহন, কিন্তু পারছেন না।

"খুকু পাঁচফুট পাঁচ, অমিত পাঁচফুট আট," ঈশিতা ঘোষণা করলেন।

"তাতে কী এসে যায়?"

ঈশিতা কোমর থেকে রুমাল বার করে নাকটা আলতোভাবে মুছতে মুছতে উত্তর দিলেন, "ঠিকই। দু-এক ইঞ্চির এদিক ওদিকে কী এসে যায়?"

"আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না ঈশিতা।" জীমূতবাহন গম্ভীরভাবে সওয়াল শুরু করলেন।

কিন্তু ঈশিতা তার মোহমায়া বিস্তার করে স্বামীকে আদর করে

বললেন, "পোকাদের বেলায় এত বোঝ, আর নিজের মেয়েদের বেলায় বুঝতে পার না ? আমি যদি মরে যেতাম, মেয়েদের মানুষ করতে কী করে ?"

জীমূতবাহনের মনের ভিতর থেকে কে যেন নিঃশব্দে বলল, 'তাহলে মেয়েদের আমি অন্যভাবে মানুষ করতাম।' কিন্তু সংসারে থেকে নিজের স্ত্রীকে সে কথা বলা যায় না। তাই নীরব হয়ে রইলেন জীমূতবাহন।

ঈশিতাও আজ কিছুতে রাগ করে হেরে যাবেন না। স্বামীর আরও কাছে এগিয়ে এসে সোহাগ করে বললেন, "আসল কথা তোমার মেয়ের খুব পছন্দ। সেই যে প্রথম যেদিন চিনি আনতে পাঠিয়েছিল, সেদিন থেকেই খুকুমণি ফাঁদে পড়ে গিয়েছে !"

"একজনে বিয়ে হয় না, ঈশিতা। অন্ততঃ আর একজনের মত লাগে।" নিজেকে যথাসম্ভব শান্ত রেখে জীমূতবাহন উত্তর দিলেন।

ঈশিতা অত বোকা নন। এর আগে তিনটে মেয়েকে তিনি পার করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করলেন, "তা বলে তো হাল ছেড়ে দিয়ে বসে থাকতে পারি না। আমি না থাকলে, অমন হীরের টুকরো জামাই একটাও জোগাড় হতো না—তোমার মেয়েরা কেউ ডানাকাটা পরী নয়।"

পরী না হয়েই তো বিপদ হয়েছে। স্বর্গের অ্যাঞ্জেলদের লগা দিয়ে মাটিতে টেনে নামিয়ে এনেছে তারা। সুপ্রিয়, অজয়, দেবকুমারের মতো প্রতিভাবান বৈজ্ঞানিকদের চিরদিনের মতো হারিয়েছেন জীমূতবাহন সেন। আর একবার তাই হবে নাকি ? জীমূতবাহন অজানা আশঙ্কায় শিউরে উঠলেন।

ঈশিতা বললেন, "যত দায় কী আমার ? তোমার কোনো কর্তব্য নেই ? তুমি অমিতের মনটা জানবার চেষ্টা করো। তোমাকে খুব শ্রদ্ধা করে ও। তাছাড়া মেলামেশার সুযোগ নিক ওরা আরও কিছুদিন।"

"কিন্তু তোমাকে কলকাতায় যেতে হবে না ?" জীমূতবাহন স্ত্রীকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করলেন।

"একটা কিছু ফয়সালা না করে আমি যাচ্ছি না। বিলেতের পি এইচ ডি ছেলে আমি হাতছাড়া করতে পারবো না।" ঈশিতা খোলাখুলি নিজের মনোভাব প্রকাশ করলেন।

মাথায় বেশ কয়েক বালতি জল ঢেলে এসেছেন জীমূতবাহন। কিন্তু কোনো ফল হয়নি—দেহটা জ্বলছে। মনের আগুন কি কয়েক বালতি জলে শান্ত হয়? ল্যাবরেটরিতে বসে জীমূতবাহনের মনে হচ্ছে তিনি হেরে যাচ্ছেন।

সেই ছোটবেলা থেকে সংসারের কত সংগ্রামেই তো জীমূতবাহন অংশ গ্রহণ করলেন। কিন্তু কখনও হেরে যাননি তো। কঠিন সমস্যার সামনে এসেছেন জীমূতবাহন, তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন, কিন্তু কখনও নিজের ওপর বিশ্বাস হারাননি তিনি। কিন্তু আজ কোনো ভরসা পাচ্ছেন না জীমূতবাহন।

টাকা। টাকা আনা পাই-এর কীটগুলো সমগ্র পৃথিবীকে আত্মসাৎ করতে বসেছে। না, টাকার ওপর কোনো রাগ ছিল না জীমূতবাহনের। কিন্তু টাকার কীটগুলো বংশ বৃদ্ধি করে মানুষের মহা অমঙ্গল করতে উদ্যত হয়েছে। পৃথিবীতে কি ব্যক্তির স্বাধীনতা লোপ পাবে? স্বাধীন মানুষের ছবি কি জাদুঘর ছাড়া আর কোথাও দেখা যাবে না? পৃথিবীর সব প্রতিভাই কি টাকার কাছে মাথা বিকিয়ে দিয়ে দাসত্বের দলিলে সই করে দেবে? জীবনের বহ্নিকণা হারিয়ে আমাদের সেরা ছেলেরা নিয়মের এবং অভ্যাসের দৃঢ় আকর্ষণে স্বাচ্ছন্দ্যের খুঁটিতে বাঁধা থাকবে?

তিনবার—তিনবার ভুল করেছেন জীমূতবাহন। অপারগ শান্তনুর মতো স্ত্রীকে তিনি বার বার সন্তান আহুতি দিতে দেখেছেন। আর কেন? পৃথিবীতে অনেক সুপাত্র রয়েছে। বিদ্বান, চরিত্রবান, রূপবান, অর্থবান যুবক দেশে তো অনেক রয়েছে, তাদের যাকে ইচ্ছা মদালসার জন্যে মনোনয়ন করতে পারে ঈশিতা। অমিতাভ মিত্র ছাড়া দেশে কি ছেলে নেই?

"কী ভাবছেন, মাস্টারশাই?"

"কে, ইন্দু?" জীমূতবাহন যেন গভীর চিন্তার অন্ধকার খাদ থেকে উত্তর দিলেন।

ভারি ভাল এই ইন্দু মেয়েটি। এমন মেয়ে জীমূতবাহনের হতে দোষ কী ছিল? জীমূতবাহন নিজের চিন্তায় নিজেই হেসে ফেললেন। একটা শাদা সরু পাড়ওয়ালা মিলের শাড়ি পরেছে ইন্দু। মদালসা এবং মদালসার মা ইন্দুকে দেখে শিখতে পারে না? চকচকে মূল্যবান শাড়ি ও টাইট ব্লাউজ যে সংসারের কত মূল্যহীন শূন্যগর্ভতাকে ঢেকে রেখেছে!

"মাস্টারমশাই, আপনার শরীর ভাল তো?" ইন্দু জিগ্যেস করলে। "আপনার মাথা ধরেছে মনে হচ্ছে, কপালটা একটু টিপে দেবো?"

"না ইন্দু, তুমি কেন টিপে দেবে?" জীমূতবাহন বাধা দিলেন।

"আমি মাথা টিপে দিলে বাবা খুব খুশী হন," ইন্দুমতী হাসতে হাসতে বললে।

"কতদিন মা, তোমরা বাবাদের মাথা টিপবে? মাথা টেপার জন্যে চিরদিন তো তোমরা বাবার ঘরে থাকবে না।"

"বাবা আমাদের পুরো স্বাধীনতা দিয়ে এসেছেন ছোটবেলা থেকে।"

গভীর বেদনার সঙ্গে জীমূতবাহন বললেন, "স্বাধীনতার মূল্য আমরা সব সময় বুঝতে পারি না মা।"

ইন্দুমতী হেসে বললে, "পৃথিবীর সামান্য ক'জন স্বাধীন মানুষ নিজেদের নিঃস্ব করে দিয়ে সত্যকে আবিষ্কার করেন—আর কোটি কোটি লোক যুগযুগান্ত ধরে তার ফলভোগ করে। পৃথিবীতে আবিষ্কারকরা কত দুঃখ, কত কষ্ট, কত অবহেলা, কত অবজ্ঞা পেয়েছেন এবং পাচ্ছেন সে তো আপনি জানেন মাস্টারমশাই।"

সোজা হয়ে উঠে বসলেন জীমূতবাহন। "এবার তোমাকে একটু বকা যাক, ইন্দু। শাদা শাড়ি পরেছো কেন?"

ইন্দু হেসে ফেললে, "এ-সব দিকেও আপনার নজর থাকে?"

"আমার ছাত্রছাত্রীদের সম্পূর্ণ কণ্ট্রোল করতে চাই আমি! তোমার বেণীতে একটা ফুলের গোড়ে থাকতো আগে—সেটাও দেখছি না কেন? মালিকে ডেকে এখনই বলে দিচ্ছি; বাগানের সেরা ফুলগুলো ভোরবেলায়

যেন তোমার ঘরে দিয়ে আসে।"

ইন্দুমতী হাসতে হাসতে বললে, "এতোক্ষণ যে বড় নোংরা জায়গায় কাজ করছিলাম। ভেটারিনারি ডিপার্টমেণ্ট থেকে ঘোড়ার মাংস এসে গিয়েছে।"

"অমিত কোথায়?" জীমূতবাহন জানতে চাইলেন।

"উনিও তো কসাইকে দিয়ে এগুলো কুচো কুচো করে কাটাচ্ছেন।"

জীমূতবাহন জিগ্যেস করলেন, "মুখে একটা মাস্ক পরে নিয়েছে তো? যা অসাবধানী ছেলে। তুমি ওকে বলে দিও তো ইন্দু।"

"এতো মাংসে কী হবে?" ইন্দু জিগ্যেস করে।

"এখন রোজ আরও মাংস আসবে। অমিতাভ কিছু বলেনি তোমায়? আমি চাই তুমি ওকে এ-বিষয়ে যতখানি পারো সাহায্য করো। ভেরি ইণ্টারেস্টিং প্রোগ্রাম। এ-দেশে আগে কখনও হয়নি। এখানকার পশু চিকিৎসা কলেজের প্রিন্সিপ্যাল এসেছিলেন। এখানকার বহু গরু, ঘোড়া, মোষ মারা যাচ্ছে—এক কুৎসিত মাছির আক্রমণে। কয়েক বছর ধরে বেড়েই চলেছে এই আক্রমণ। ঝাঁকে ঝাঁকে মাছি আসতে আরম্ভ করে—স্ক্রু ওয়ার্ম ফ্লাই। মাছিগুলো গরুদের গায়ে বসে। তারপর দগদগে ঘা হয়। সেই ঘা কিছুতেই সারতে চায় না, পোকা কিলবিল করে সেখানে। আমেরিকায় আমার এক বন্ধু সম্প্রতি নতুন পথে খুব ভাল ফল পেয়েছেন। দেখা যাক আমাদের ভাগ্যে কী আছে।"

ব্যাপারটা আরও জানবার আগ্রহ ছিল ইন্দুমতীর। কিন্তু মাস্টার-মশাইয়ের চিন্তায় বাধা দিতে সে সাহস করলে না।

না, এখন আর কোনো ব্যক্তিগত চিন্তাকে মনের মধ্যে ঢুকতে দেবেন না জীমূতবাহন। চিন্তাগুলো স্ক্রু ওয়ার্মের মতোই একটু ক্ষত পেলেই সেখানে ডিম পেড়ে বসে। হাজার হাজার ম্যাগটের জন্ম হয় সেখানে।

"আসতে পারি?" দরজায় টোকা পড়লো।

"এসো অমিত।"

"আপনার শরীর খারাপ নাকি?" অমিত প্রশ্ন করে।

"না, একটু বিশ্রাম নিচ্ছি।"

"আপনি এখন তো বাড়ি যাবেন একবার? তখন মিসেস সেনকে যদি অনুগ্রহ করে একটু বলে দেন, আমি চা খেতে যেতে পারবো না।"

জীমূতবাহনকে না জানিয়েই ঈশিতা তাহলে আবার অমিতকে চা-এ ডেকেছে। নিজের অজ্ঞতা চেপে রেখে জীমূতবাহন বললেন, "কেন, কী হলো?"

"এক্স-রে কোম্পানির লোকরা মেশিনটা প্রায় বসিয়ে ফেলেছে। এখনই আমরা একটু পরীক্ষা করে দেখবো!"

"মাছি আছে তোমার স্টকে?"

"হাজার পাঁচেক স্টকে আছে। কাল এক লক্ষ আশা করছি।"

"ভেরি গুড মাই বয়। কিন্তু মুখ শুকিয়ে গিয়েছে কেন অমিত? রাত জাগছো নাকি? রাত জাগো। ঘড়ি ধরে দশটা-পাঁচটা কাজ করে পৃথিবীতে কোনো বড় আবিষ্কার সম্ভব হয়নি। তবে সঙ্গে সঙ্গে শরীরের যত্ন নেবে। মাই ডিয়ার বয়, মনে রেখো সুস্থ শরীর না থাকলে মশা, মাছি, মানুষ কারুর কাজেই লাগবে না তুমি।"

অমিতাভকে কাজে বসিয়ে রেখে জীমূতবাহন বাড়িতে ফিরে গেলেন।

নাকের ওপর একটা রুমাল বেঁধে বসে আছেন ঈশিতা। "কী তোমার কাণ্ড! ভাগাড়েও এত গন্ধ ছাড়ে না। গরু পচিয়েছ নাকি?"

"গরু না, ঘোড়া," জীমূতবাহন উত্তর দিলে।

"আজই তোমার এই জায়গা ছেড়ে হোটেলে গিয়ে উঠতাম; নেহাত খুকু অমিতকে চা খেতে বলেছে তাই।"

"খুকু কোথায়?" জীমূতবাহন জানতে চান।

"বাথরুমে বমি করছে। কাপড়-চোপড় আবার পাল্টাতে হবে, অথচ অমিতের এসে পড়বার সময় হলো।"

"সে আসতে পারবে না।" খবরটা ঘোষণা করতে জীমূতবাহন বেশ আনন্দ পেলেন।

অমিত আসতে পারবে না শুনে হতাশ হয়ে পড়লেন ঈশিতা। বিরক্ত হয়ে বললেন, "আর আসবেই বা কী করে বেচারা? ভদ্রলোকের ছেলেকে রিসার্চের নামে মুদ্দফরাসের অধম কাজে বসিয়েছ।"

"ও কাজে ব্যস্ত থাকবে।" জীমূতবাহন গম্ভীরভাবে বললেন।

"কেন? তুমি কাজে ব্যস্ত থেকে ওকে পাঠিয়ে দিতে পারলে না? তোমার মেয়ে সাধ করে একজনকে নেমন্তন্ন করেছে, সেটার কোনো মূল্য নেই!"

বিব্রত জীমূতবাহন বললেন, "চা খেয়েই আমি ফেরত যাচ্ছি। দেখি ওকে যদি পাঠাতে পারি।"

"থাক," ঈশিতা বললেন। "বমি করে করে খুকুমণির চোখের কোলে কালি পড়ে গিয়েছে। এখন যা ছিরি হয়েছে তাতে অমিতের না দেখাই ভাল।"

টেবিলে কয়েকটা ছবি পড়ে রয়েছে যেন? তুলে নিয়ে দেখতে লাগলেন জীমূতবাহন। হোসিয়ারির টিশার্ট পরে একটি মেয়ে বাঁ হাতে চুলগুলো ঠিক করে নিচ্ছে—ডান হাতে টেনিস-র‍্যাকেট। খুকুমণির ছবি না? হ্যাঁ, প্রত্যেকটাই খুকুমণির ছবি মনে হচ্ছে! বিভিন্ন ভঙ্গীতে খুকুমণি কোথাও টেবিল টেনিস, কোথাও টেনিকয়েট, কোথাও ভলিবল খেলছে।

"এ-সব কোথা থেকে এলো?" জীমূতবাহন জানতে চান ঈশিতার কাছ থেকে।

"একটা বিলিতী কোম্পানি ছবিগুলো তুলিয়েছে—ওদের নতুন গেঞ্জি, জামা এবং টাওয়েলের বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করবে!"

"আর তুমি তাতে রাজী হয়েছো?" রাগে ফেটে পড়লেন জীমূতবাহন।

"অন্যায় কী হয়েছে? বিনা পয়সায় আমেরিকা ঘুরিয়ে আনবে ওরা। তুমি তো পারলে না। ওদের আমেরিকান অফিস যদি পছন্দ করে, তাহলে একটা গাড়িও দিতে পারে।"

ঈশিতা আবার বললেন, "কী, অমন করে তাকাচ্ছ কেন? মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়নি কিছু। পাবলিসিটির যুগ এটা। আমাদের সময় তো বাঈজী ছাড়া কেউ স্টেজে উঠতো না। কবিগুরুর সঙ্গে আমরা তো সে বাধা ভেঙে ফেললাম। সুস্মিতারা তো কলেজে ছেলেদের সঙ্গে অভিনয় করলে। খুকুমণি তো এন সি সি ক্যাম্প করে এসেছে। ছবি ছাপানোতেই যত দোষ? নিজের চেষ্টায় যদি কেউ একটা মোটর গাড়ি পায় তাতেও বাধা

দিতে হবে? তোমার তো মুরোদ নেই।"

না, কোনো প্রতিবাদ করবেন না জীমূতবাহন। তাঁর মূল্যবোধ তাঁর আধুনিকা স্ত্রী ও কন্যাদের মহলে অচল। কিন্তু নিজের কথা ভাবছেন না তিনি। ভাবছেন অমিতাভর কথা। ঈশিতার সঙ্গে কোনো ব্যাপারেই মিল হয় না তাঁর। ঐ একটি ব্যাপার ছাড়া—অমিতাভ ছেলেটি ভাল।

ল্যাবরেটরিত যেতে ইন্দুমতী বললে, "আপনি এসেছেন ভালই হয়েছে। একবার এক্স-রে চেম্বারে যান। ডক্টর মিত্র মন খারাপ করে বসে আছেন।"

সত্যিই গম্ভীর মুখে বসে আছে অমিতাভ। মুখে হতাশার চিহ্ন! পাশের টেবিলে দুটো ট্রেতে অনেক মাছি নিশ্চল হয়ে পড়ে রয়েছে।

"কী হয়েছে?" জানতে চাইলেন জীমূতবাহন।

"দু'বার রেডিয়েশনেই খারাপ ফল পেলুম স্যর। সমস্ত মাছিগুলো মারা গেল।"

"এতে হতাশ হবার কিছু নেই, মাই বয়। এসো দু'জনে মিলে ব্যাপারটা অনুসন্ধান করে দেখা যাক। আমাদের উদ্দেশ্য কী?" জীমূতবাহন জানতে চাইলেন।

অমিতাভ বললে, "আমরা চাইছি রোনজেন রশ্মির বিকীরণে পুরুষ মাছিদের বন্ধ্যা করে দিতে। পুরুষ মাছিরা আপাতত সুস্থ থাকবে, কিন্তু সন্তান উৎপাদনের কোনো ক্ষমতা থাকবে না তাদের।"

আর এক ট্রে মাছি আনা হলো এবার। চেম্বারের মধ্যে এক্স-রে যন্ত্রের খাপে ট্রেটা বসিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলে অমিতাভ।

মাস্টারমশাই বললেন, "এক্স-রে ডোজটা এবার কমাও।"

"কত করব স্যর!"

"মিনিটে ২৫r দাও।"

মুহূর্তের জন্যে সুইচ টিপে দিলে অমিতাভ। এবার দরজা খুলে দিতে যাচ্ছিল সে। মাস্টারমশাই বাধা দিলেন। "এতো ব্যস্ত হতে নেই। সময় দিতে হয়। রেডিয়েশনের বিপদ অনেক। শিশের জ্যাকেটটা পরা আছে তো? হাতে কী পরেছো?"

ঘড়ির কাঁটা ঘুরে চলেছে। মাছিগুলোর কী হলো তা বুঝতে আরও সময় লাগবে।

সেই অবসরে কতকগুলো আলোচনা সেরে নিতে চাইলেন জীমূতবাহন। ভেটারিনারি কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ডক্টর রাও এসেছেন।

জীমূতবাহন বলছিলেন, "দেখুন ডক্টর রাও, আমরা যে পথে চলেছি তার পরিকল্পনা আমার এই তরুণ বন্ধু ডক্টর মিত্রের। ব্যাপারটা মোটামুটি এই ঃ

ঝাঁকে ঝাঁকে মাছি উড়ে আসে এই সময়। স্ত্রী মাছির সঙ্গে পুরুষ মাছির যৌন মিলন হয় এবং তার বারো থেকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে স্ত্রী মাছিরা ডিম পাড়বার জন্যে অস্থির হয়ে ওঠে। গবাদি পশুর দেহ গর্ভবতী মাছিদের ডিম পাড়ার পরম প্রিয় স্থান। সামান্য একটু ক্ষত পেলেই হলো। সেইখানে ডিমগুলো ফুটে ম্যাগটের উৎপত্তি হবে।"

জীমূতবাহন বলে চললেন, "আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় মার্কিন বৈজ্ঞানিক রানার প্রথম দেখলেন সিগারেট বীট্‌ল নামে একরকম পোকার গায়ে এক্স-রে প্রয়োগ করলে তারা হয় মরে যায়, না হয় তাদের সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা নষ্ট হয়। ১৯১৬ সালে এই কাজ হলেও, ১৯২৭ পর্যন্ত ব্যাপারটা নিয়ে কেউ মাথা ঘামালেন না। আমার বন্ধু মুলার ওই সময় অনেক ড্রোসো-ফিলাকে বন্ধ্যা করলেন। এক্স-রে ছাড়াও বিটা, আলট্রাভায়লেট এবং গামা রশ্মি দিয়েও প্রজনন শক্তি নষ্ট করা যেতে পারে। তবে আলট্রাভায়লেটের শক্তি কম।"

রাও জিগ্যেস করলেন, "তারপর ?"

জীমূতবাহন বললেন, "মনে করুন একশ মাছি উড়ে আসছে। তার মধ্যে পঞ্চাশটা পুরুষ এবং পঞ্চাশটা স্ত্রী। আমরা যদি ইতিমধ্যে পঞ্চাশটা বন্ধ্যা পুরুষ মাছি ছাড়ি—তারা কিছু বীর্যবান পুরুষ মাছিকে তাড়িয়ে স্ত্রী মাছিদের সঙ্গে মিলিত হবে। কিন্তু সে মিলনে কোনো সন্তান হবে না। ফলে ডিম পাড়ার কোনো অবকাশই ঘটবে না। আমাদের গরুগুলো বেঁচে যাবে।"

রাও বললেন, "যে পুরুষ মাছিগুলো বাইরে থেকে এসেছে—তারা কি একেবারেই হটে যাবে ?"

অমিতাভ বললে, "তা নয়—কিছু কিছু স্ত্রী মাছি পুরনো সঙ্গীদের দ্বারা

অন্তঃসত্ত্বা হবেই। কিন্তু পরের জেনারেশনে অনেক মাছির সংখ্যা কমে যাবে। তখন যদি আমরা আরও প্রজনন শক্তিহীন মাছি ছাড়তে পারি, তাহলে পরবর্তী জেনারেশনে মাছির সংখ্যা আরও কমবে।"

জীমূতবাহন বললেন, "আপনি তো জানেন রাও সায়েব—ফোর্মিয়া টেরিনোভার বংশ কী দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এদের সংখ্যা প্রতিবার একশ গুণ বেড়ে যায়।"

অমিতাভ বললে, "বন্ধ্য মাছি আমরা তৈরি করে দেবো। ঠিক জায়গায় ঠিক সময়ে এদের ছাড়ার দায়িত্ব আপনাদের।"

জীমূতবাহন বললেন, "আমাদের ল্যাবরেটরিতে মাছির ওপর এক্স-রে প্রয়োগ আরম্ভ হয়েছে। আমরা এবার স্ত্রী মাছির সঙ্গে পুরুষ মাছিদের কয়েকদিন রেখে দেখবো এরা সত্যিই প্রজননশক্তি হারিয়েছে কিনা।"

অমিতাভ বললে, "আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমেরিকা থেকেও ভাল ফল পাব আমরা, সমস্ত দেশে চাঞ্চল্য পড়ে যাবে।"

এরপরের কয়েকটা সপ্তাহ যেন স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে কেটে গিয়েছিল। নিজে অসুরের মতো পরিশ্রম করেছিলেন জীমূতবাহন। কিন্তু তিনিও অবাক হয়েছিলেন অমিতাভর নিষ্ঠায়। এই ক'সপ্তাহে সে একবারও চোখ বুজেছিল কিনা সন্দেহ।

মাংসের টুকরোর মধ্যে মাছিদের বংশ বৃদ্ধি করতে উৎসাহ দিতে হয়েছিল। এক একটা ভ্যাটের মধ্যে হাজার হাজার নবজাত মাছিকে রাখতে হতো। এক-আধটা নয়, ত্রিশ লক্ষ মাছির জন্ম দিতে হয়েছে ল্যাবরেটরিতে।

তারপর শুরু হতো রোনজেন রশ্মি প্রয়োগের কাজ। রশ্মি প্রয়োগের পর মিহি তারের জালের খাঁচায় পুরে মাছিদের পাঠিয়ে দেওয়া হতো ভেটারিনারি কলেজে—সেখান থেকে তারা চলে যেতো বিভিন্ন জায়গায়।

অমিতাভর ওপর বিশ্বাস বেড়ে গিয়েছে জীমূতবাহনের। সত্যি যোগ্য সহকারীর সন্ধান পেয়েছেন তিনি। অমিতাভরও কাজ ভাল লাগছে বোধ হয়। নতুন নতুন বিষয়ে কাজ করবার অসীম আগ্রহ তার। ভেটারিনারি কলেজের ছাত্ররা গ্রামে গ্রামে গিয়ে যে খবর নিয়ে এসেছে, তাতে গরুর দেহে ম্যাগটের আক্রমণ এবার অনেক কম।

"আরও কম হতো যদি আরও কিছু মাছি ছাড়া যেতো," অমিতাভ বলে।

"তা সত্যি। কারণ আমরা যত মাছি ছেড়েছি তার সব তো পুরুষ নয় —অন্ততঃ অর্ধেক স্ত্রী," জীমূতবাহন বলেছিলেন।

অমিতাভ বললে, "যদি এমন কোনো সহজ উপায় থাকতো যাতে পুরুষ মাছির অনুপাত ল্যাবরেটরিতে বাড়িয়ে দেওয়া যায়, তা হলে মন্দ হতো না।"

জীমূতবাহন বললেন, "আশা ছাড়িনি অমিত। একদিন আমাদের এই ল্যাবরেটরি আরও অনেক বড় হবে। ভারতের সেরা ছেলেদের এখানে এসে গবেষণায় আত্মনিয়োগ করতে উৎসাহ দেবো আমরা। তখন প্রজনন

রহস্যের ওপরেও কাজ হবে।"

জীমূতবাহন পরম উৎসাহে বলে চললেন, "ফিজিক্স, বায়োফিজিক্স এবং মাইক্রোমিটিরিয়োলজির সমন্বয়েও আমি কিছু অনুসন্ধান চালাতে চাই। যেমন আমি জানতে চাই, আবহাওয়ার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পোকা-মাকড়দের মেজাজের এবং স্বভাবের কী পরিবর্তন হয়। যেসব পাখী পোকা খায়, তাদের সম্বন্ধেও অনেক কিছু জানতে চাই আমি। লীডেন বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার এক বন্ধু যন্ত্র বসিয়ে গুণে দেখেছেন, টিটমিস পাখী বাচ্চা হবার ঠিক দু'সপ্তাহ পরে পেটুক সন্তানদের খাওয়াবার জন্যে দিনে অন্ততঃ এক হাজার বার পোকা ধরতে বেরোয়। আমাদেরও অনেক কিছু জানবার আছে।"

কিন্তু একি স্বপ্ন, না সত্যিই একদিন সম্ভব হবে!

বড় কষ্ট হয় জীমূতবাহনের। যে দেশ একদিন পৃথিবীর শস্যভাণ্ডার ছিল, সেখানে আজ চাষীর পেট ভরাবার মতো ফসলও হয় না। ভাল বীজ নিয়ে জমিতে সার দিয়ে এবং জল ঢেলে চাষ করলেই তো হলো না—চারাদের মোটা অংশ নষ্ট হচ্ছে পোকাদের অত্যাচারে। যা চাষ এখন হয় সেইটুকু রক্ষা করতে পারলেই বিদেশে ভারতের ভিক্ষাবৃত্তির অবসান ঘটানো যেতো।

আর শুধু ভারতবর্ষ কেন? জীমূতবাহন পৃথিবীর সমস্ত মানুষের কথা ভাবেন। কী বিশাল সমস্যা! তার তুলনায় জীমূতবাহনের মতো সামান্য মানুষের সামর্থ্য কতটুকু? কিন্তু জীমূতবাহন হতাশ হতে রাজী নন। ছোট ছোট মানুষরাই তো পৃথিবীর অনেক বৃহৎ বৃহৎ সমস্যার সমাধান করেছে।

এর জন্যে পরিশ্রম করতে হবে। তাঁর এবং অমিতাভ মিত্রর এখন নষ্ট করবার মতো এক ফোঁটা সময়ও নেই। নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরির আলো বহু রাত এখন জ্বালা থাকবে।

ইন্দুমতীও অনেক সাহায্য করছে তাঁদের। বড় শান্ত মেয়েটি। চোখ দুটো দেখলেই হৃদয়ের গভীরতা বোঝা যায়। কথা বলে না বেশী। নিজের মনেই কাজ করে যায়। রিসার্চের থিসিস জমা দিয়ে এসেছে মেয়েটা, এবার কী করবে কে জানে। ইন্দুমতীকে খুব ভালবাসেন জীমূতবাহন—ইন্দুমতী

দেশাই-এর মতো মেয়ে লাখে একটা হয় না। কিন্তু বড় শান্ত। অত শান্ত হলে তো কাজ চলে না পৃথিবীতে।

ইন্দুর খোঁজ করলেন জীমূতবাহন। "কেমন আছ ইন্দু? ক'সপ্তাহ যেভাবে কাটলো তাতে কিছু খোঁজই নিতে পারিনি। তোমার খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট হচ্ছে নিশ্চয়। ওরা তোমাদের কী খেতে দেয় দেখাও হয় না আমার।"

মাস্টারমশাইয়ের এই দিকটার সঙ্গে পরিচয় আছে ইন্দুর। লোকটা যে কতখানি স্নেহপ্রবণ তাও জানে ইন্দুমতী দেশাই। তাই তো এত শ্রদ্ধা করে তাঁকে।

ইন্দু হেসে বললে, "আমি কি আর সেই ছোট্ট মেয়েটি আছি মাস্টারমশাই? অসুবিধে হলে ঠিক বলতাম আপনাকে।"

"উঁহুঁ, অত সহজে ছাড়ছি না। আজ সকালে কী খেয়েছ বলো।"

ইন্দুমতীর হাসিতে এক অপরূপ স্নিগ্ধতা আবিষ্কার করলেন জীমূতবাহন। তাঁর মেয়ে মদালসার হাসিও তো লক্ষ্য করেছেন জীমূতবাহন। কিন্তু সে হাসিতে বড় বেশী জ্বালা দেবার চেষ্টা আছে।

ইন্দুমতী বললে, "সকালে খেয়েছি টোস্ট, মাখন আর কলা।"

ইন্দুমতী যে আবার মাছ মাংস ডিম খায় না। জীমূতবাহন ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। "না, এ খাওয়া চলবে না। সকালে একটু দুধ অন্ততঃ চাই, আমি হরিমোহনকে বলে দেবো।"

"না মাস্টারমশাই, এইসব ছোটখাট ব্যাপারে আপনার সময় ব্যয় করবার মানে হয় না," ইন্দুমতী বলে।

"ছোটখাট? দুধের ব্যাপারটা মোটেই ছোটখাট নয়," জীমূতবাহন হুঙ্কার দিলেন। মনে মনে দুঃখও হলো—ঈশিতা রয়েছে, সে একটু দেখতে পারে না? আগেকার দিনে গুরুগৃহে ছেলেরা যখন শিক্ষা গ্রহণ করতো তখন গুরুপত্নীরাই তো এসবের তদারক করতেন।

ইন্দুমতী বললে, "মাস্টারমশাই, আপনি একেবারে ব্যস্ত হবেন না। খাওয়ার জন্যে কেউ আপনার এখানে আসে না!"

"তবে কিসের জন্যে আসে ?" জীমূতবাহন সস্নেহে প্রশ্ন করেন।

"কাজ করতে। কাজ শিখতে।" ইন্দুমতীর উত্তরটা বেশ ভাল লাগল জীমূতবাহনের। বেশ তো কথা বলতে পারে মেয়েটা ; কিন্তু তাহলে অন্যের সামনে অমন চুপ করে থাকে কেন ?

ইন্দুমতী হঠাৎ মাস্টারমশাইকে নমস্কার করলে। "আপনি না ডাকলেও আপনার কাছে আসছিলাম মাস্টারমশাই। সুখবর আছে। বাবার টেলিগ্রাম পেলাম এই মাত্র—আমি ডক্টরেট পেয়েছি।"

"তাই নাকি!" প্রচণ্ড আনন্দে ইন্দুমতীর পিঠে কিল মারলেন জীমূতবাহন। তাহলে তুমি আজ ভাল করে পায়ের ধুলো নাও, আমি আপত্তি করবো না।"

ইন্দুমতী বাধ্য মেয়ের মতো আবার পায়ের ধুলো নিল। মাস্টারমশাই আনন্দে কী করবেন ঠিক করে উঠতে পারছেন না। বললেন, "শুধু নমস্কারে তো হবে না ডক্টর ইন্দুমতী দেশাই! গুরুদক্ষিণা চাই।"

"নিশ্চয়ই, গুরুদক্ষিণা না দিলে গুরুঋণ শোধ হয় না। কীভাবে শোধ করবো বলুন মাস্টারমশাই ?"

জীমূতবাহন হাসতে হাসতে বললেন, "আজকালকার ছাত্র-ছাত্রীরা দক্ষিণা দিতে চায় না। বড় জোর একবাক্স মিষ্টি! এই ডামাডোলের যুগে যখন একটি অনুগতা ছাত্রী পাওয়া গিয়েছে, তখন ভেবেচিন্তে চাইতে হবে। জান তো আগেকার দিনে গুরুঋণ শোধ করতে গিয়ে কত জন কত বিপদে পড়েছে।"

"আপনি এখনই বলুন মাস্টারমশাই," জেদ করতে লাগলো ইন্দুমতী।

মাস্টারমশাই বললেন, "সময় দাও ভাবতে।"

"আপনি কথা দিচ্ছেন, ভেবে দক্ষিণা চাইবেন।"

"দিচ্ছি। দক্ষিণা আদায় না করে কিছুতেই ছাড়ছি না তোমায়।"

জীমূতবাহন আর একটা স্নেহের কিল মারলেন ইন্দুমতীর পিঠে। তারপর জিগ্যেস করলেন, "এবার কী কাজ করবে ?"

ইন্দুমতী সমস্যাটা মাস্টারমশাইয়ের উপর ছেড়ে দিলে। "বলুন, কীসের ওপর কাজ করবো ?"

"যার ওপর কিছু কাজ করেছো তুমি সেটাই চালিয়ে যাও। কেমিক্যাল অ্যাট্রাকটান্ট। কৃত্রিম গন্ধে কেমন করে পোকাদের ছলনা করা যায়। এ বিষয়ে বলতে গেলে কোনো কাজই হয়নি।"

ইন্দুমতী বললে, "জানেন মাস্টারমশাই, আমাদের হরিমোহনটা কী করে? খাঁচার মধ্যে একটা স্ত্রী ফড়িং রেখে দেয়। তারই গন্ধে গন্ধে বিকেলে অনেক ফড়িং দূর থেকে আসতে আরম্ভ করে। আর হরিমোহনের হাঁসগুলো তখন পরম সুখে ফড়িং খেতে আরম্ভ করে।"

"তাই বুঝি?" জীমূতবাহন বললেন, "হরিমোহনটাও দেখছি পতঙ্গবিদ্ হয়ে উঠছে।"

জীমূতবাহনের মনে পড়লো, গন্ধে পাগল একটা জিপসি মথ প্রেয়সীর সন্ধানে দু' মাইল উড়ে এসেছিল। কুমারী পতঙ্গ বয়ঃপ্রাপ্ত হলেই দেহ থেকে গন্ধ ছড়াতে থাকে—পুরুষের অ্যানটেনায় গন্ধ প্রবেশ করলেই সে লক্ষ্যের দিকে ছুটতে থাকে। প্রেমের ফাঁদ ভুবনে ভুবনে সত্যিই পাতা রয়েছে, কে কোথায় ধরা পড়বে কে জানে।

"ইন্দু, পোকাদের কী কী লোভ দেখানো যায়?" জীমূতবাহন প্রশ্ন করলেন।

ইন্দু বললে, "তিন রকমের লোভ—ফুড, সেক্স অ্যাণ্ড ওভিপোজিসন।"

জীমূতবাহন বললেন, "খাবারের লোভ আদিমতম। আমাদেরও আছে—পেটের দায়ে কত মানুষ পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে চলে আসে। যৌন লোভের ফাঁদ পাততে তো আমাদের হরিমোহনও শিখে গিয়েছে। গর্ভবতী পতঙ্গরা একটা ভাল জায়গায় ডিমপাড়ার জন্যে উদ্বিগ্ন থাকে। এ বিষয়ে বিদেশে এখনও তেমন কাজ হয়নি! তুমি এই ওভিপোজিসন লিওর সম্বন্ধে কাজ করতে পারো।"

ইন্দুমতী রাজী। মাস্টারমশইয়ের ওপর অগাধ বিশ্বাস তার—আর উৎসাহেরও অভাব নেই।

জীমূতবাহন বললেন, "অমিতাভ কোথায়? তার সঙ্গে এ-বিষয়ে একটু পরামর্শ করা যাক না!"

কিন্তু কোথায় অমিতাভ?

"উনি এখন নেই," ইন্দুমতী জানায়।

"সে কী! একটু আগেই তো তোমরা দু'জনে এক্স-রে চেম্বারে কাজ করছিলে।"

"মদালসা এসেছিল। মিসেস সেন, মদালসা এবং অমিতবাবুর সিনেমায় যাবার কথা আছে।"

জীমূতবাহন বোকার মতো প্রশ্ন করলেন, "তিনজনে যখন গেল, তুমিও গেলে না কেন?"

ইন্দুমতী বুদ্ধিমতীর মতো বললে, "ওঁদের টিকিট কাটা ছিল। তাছাড়া বললেও যাওয়া যেতো না—আমার অনেক কাজ রয়েছে।"

চেয়ার থেকে উঠে বাড়ি যাবার পথে জীমূতবাহন আবার বোকার মতো বললেন, "কাজ কাজ আর কাজ। সারাজীবন তো মা তোমাকে কাজ করতে হবে। আমার মতো কাঠখোট্টা হয়ে কষ্ট পাবে মা। বিশ বছর সিনেমা দেখা হয়নি। মাঝে মাঝে হৈচৈ করবে।"

ইন্দুমতী কিছু বললে না, দুষ্টু মেয়ের হাসিতে তার মুখটা ভরে গেল।

আর পথে যেতে যেতে জীমূতবাহনের খেয়াল হলো, ইন্দুমতীকে যাওয়ার কথাটা বলা তার ঠিক হয়নি। তাঁর, স্ত্রী, তাঁর মেয়েকে তিনি তো জানেন—ওকে সঙ্গে নেবার ভদ্রতাটুকুও হয়নি তাদের। জীমূতবাহন ছাড়বেন না, ফিরে এলেই আজ প্রশ্ন করবেন, ঝগড়া করবেন প্রয়োজন হলে।

বাড়ি ফিরেই আশ্চর্য হলেন জীমূতবাহন। চেয়ারে বসে বড় জামাই-এর চিঠি পড়ছেন ঈশিতা।

"এ কি তোমরা যাওনি সিনেমায়?" উৎকণ্ঠিত জীমূতবাহন প্রশ্ন করেন।

"আমি যাইনি, ওরা গিয়েছে," ঈশিতা উত্তর দিলেন।

"কেন, তোমার কি অসুখবিসুখ করলো নাকি?"

"অমিতকে তাই বললাম—গা বমি বমি করছে," ঈশিতা উত্তর দিলেন।

"আমাকে খবর দাওনি কেন, ডাক্তারকে টেলিফোন করে দিতাম।"

ঈশিতা ঠোঁট বেঁকিয়ে বললেন, "তোমার কী বুদ্ধিসুদ্ধি কোনো দিন হবে

না! আমি ইচ্ছে করেই শেষ মুহূর্তে ড্রপ করেছি।"

"ও!" জীমূতবাহনের হঠাৎ মনে পড়লো গত বারোবছরে এমন ঘটনা আরও হয়েছে। চিত্রলেখা আর সুপ্রিয়কে নিয়ে সিনেমায় যাবার সময় ঈশিতার এই রকম শরীর খারাপ হয়ে পড়েছিল। সুস্মিতা-দেবকুমার, প্রিয়ংবদা-অজয়ের বেলাতেও একই ঘটনা ঘটেছিল।

ঈশিতা বললেন, "একটা টিকিট নষ্ট হয় বটে, কিন্তু লাভ হয় অনেক। ওদেরও সঙ্কোচের কোনো কারণ থাকে না।"

এসব মোটেই ভাল লাগছে না জীমূতবাহনের। মদালসার জন্যে পৃথিবীতে অমিতাভ ছাড়া অনেক ছেলে আছে, এ-কথাটা ঈশিতাকে মনে করিয়ে দিতেই হবে। আর নয়, অনেক সহ্য করেছেন তিনি।

দেবকুমার, সুপ্রিয়, অজয় এরা সবাই ঈশিতাকে লম্বা লম্বা চিঠি দেয়। ঘর-সংসারের প্রতিটি কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লেখে, ঈশিতার উপদেশ চায়।

জীমূতবাহনের কাছে ভুলেও চিঠি লেখে না তারা। অথচ বিয়ের আগে একদিন কত পত্রালাপ হতো তাঁর সঙ্গে। যখনই ট্যুরে যেতেন লম্বা লম্বা চিঠি পেতেন জীমূতবাহন, ফাইল ঘাঁটলে সেসব এখনও পাওয়া যাবে।

সে যাক, দেবকুমার, সুপ্রিয়, অজয় যাকে খুশি চিঠি লিখুক তাঁর কোনো আপত্তি নেই। তারা সুখে থাকুক। কিন্তু অমিতাভকে আবার সিনেমায় পাঠানো কেন? এ অন্যায়, খুব অন্যায়।

জামাকাপড় ছেড়ে ড্রইংরুমে এসে বসলেন জীমূতবাহন। ড্রইংরুমটা ঢেলে সাজিয়ে ফেলেছেন ঈশিতা। নিজের বাবার ছবি টাঙিয়েছেন দেওয়ালে। পাশে বোর্ন-সেফার্ডের তোলা নিজেদের বিয়ের ছবিটাও ঝুলিয়েছেন। আর এদিকে মেয়ে-জামাইদের ছবি। প্রিয়ংবদার পাশে অজয়, সুস্মিতার পাশে দেবকুমার, চিত্রলেখার পাশে সুপ্রিয়। মদালসার ছবিও টাঙিয়ে ফেলেছেন ঈশিতা। তার পাশে আর একখানা ছবি টাঙানোর খালি জায়গা রয়েছে। আর সেই খালি জায়গাটার দিকেই যেন লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন ঈশিতা।

চা এগিয়ে দিয়ে ঈশিতা বললেন, "মেয়ে তো তোমার ডগমগ।"

জীমূতবাহন ফ্যাল ফ্যাল করে ঈশিতার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

ঈশিতা বললেন, "আমার গর্ব, মেয়েদের এমনভাবে শিক্ষা দিয়েছি যে মায়ের কাছে তারা কোনো কিছু ঢাকে না। মনের কথা নিঃসঙ্কোচে বলতে তারা মোটেই ভয় পায় না।"

জীমূতবাহন চায়ে চুমুক দিলেন। ঈশিতা বললেন, "তুমি কিন্তু কুটোটি ভেঙে দুটো করছো না। জামাই তো আমার একার হবে না। তোমাকে যে বললাম, অমিতের সঙ্গে কথা বল।"

"কথা তো রোজই বলি।"

"ওর মনটা জানতে হবে না? আজকালকার ভদ্রছেলে, পেটে খিদে থাকলেও মুখে প্রকাশ করে না।"

"পেটের খবর বার করা বেশ শক্ত কাজ, ঈশিতা," জীমূতবাহন গম্ভীরভাবে বলেন।

"মোটেই শক্ত নয়। তাছাড়া মাঝে মাঝে চারা গাছের গোড়ায় জল দিতে হয়। অজয়ের বেলাতেও তো তোমার সন্দেহ ছিল। তারপর একদিন ওদের দুজনকে ঘরে পুরে শিকল দিয়ে দিলাম। শিক্ষিত ছেলে, শিক্ষিত মেয়ে—নিজেদের মধ্যে ফয়সালা করে নিল।"

ঈশিতার উৎসাহের অন্ত নেই। শুনিয়ে দিলেন, "অমিতের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। খুকুমণিকে দেখলেই ওর চোখ দুটো কেমন খুশী খুশী হয়ে ওঠে। খুকুমণি তো ক'দিন ওর কোয়ার্টারে গিয়েছে—গল্প করে এসেছে। খুব ফিট্‌ফাট্ ছেলে কিন্তু। ঘরদোর এমনভাবে রেখেছে যে মেয়েরা লজ্জা পেয়ে যাবে। ভালই হবে, খুকুমণি একটু আগোছাল আছে। জিনিসপত্তর ঠিক করে রাখতে পারে না। কতগুলো যে ব্লাউজ হারাল।"

জীমূতবাহন চুপ করে থাকলেও ঈশিতা আজ ছাড়বেন না। "তুমি একটু কথা বোলো। অন্ততঃ মদালসার গুণের কথাগুলো গুছিয়ে বলো—হাজার হোক তোমাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করে, সহজে বিশ্বাস করবে।"

জীমূতবাহনের শঙ্কা বাড়ছে। ঈশিতা বললেন, "খুকুমণি তো অমিতদা বলতে অজ্ঞান। বেঁটে কালো ছেলে ও দেখতে পারে না। ভালই হয়েছে। লম্বা, ফর্সা, ধারাল গড়ন অথচ ভাল ছেলে পাওয়া বেশ শক্ত। চিত্রাকে ও নিজেই কিছু লিখেছে বোধহয়। কারণ, এই দেখো-না চিত্রা লিখেছে—

'অমিতাভ ছেলেটি কে? বাবার ল্যাবরেটরিতে কবে জয়েন করলো? সম্ভব হলে একটা ছবি পাঠিও।' অমিতের একটি ছবি আমাকে দিও তো।"

"আমার কাছে ছবি নেই," জীমূতবাহন এক মুহূর্ত দেরি না করেই উত্তর দিলেন।

রেগে গিয়ে ঈশিতা বললেন, "দরকার নেই। ছবি সেদিন খুকুমণি নিজের ক্যামেরায় তুলেছে। খুকুমণির ছবিটা অমিত শাটার টিপে দিয়েছে। আজ সিনেমা থেকে ফেরবার পথে দোকান থেকে প্রিন্ট আনতে বলেছি।

সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। মাঠে যাবার জন্যে উঠেছিলেন জীমূতবাহন। পাঁচ নম্বর প্লটে ধানের স্টেম বোরার ছাড়া আছে, তাদের দেখতে হবে। বাংলা-দেশে বলে মাজরা পোকা, ধানের ডাঁটা ফুটো করে ভেতরে ঢোকে, ডাঁটার কচি অংশ খেয়ে ফেলে। ফুল আসার পর গাছগুলো আক্রান্ত হয়েছে—এতে ধানের শীষ বেরোবে না, আর বার হলেও চিট হয়ে যাবে। ছ' নম্বরে আছে রাইস বাগ্ বা গান্ধী পোকা। বসিরহাট থেকে তিড়িং পোকাও আনিয়েছেন কিছু, অন্য জায়গায় পাটচাষীরা যাকে বলে ঘোড়া পোকা। আর এসেছে লাল মাকড়সা ও আঁকি পোকা—জুট উইভিল। এদেরও তদারক করা প্রয়োজন।

উঠতে যাচ্ছিলেন জীমূতবাহন। কিন্তু ঈশিতা ছাড়লেন না। বললেন, "ওরা এখনই এসে পড়বে। অমিতাভকে খেতে বলেছি এখানে।"

বাংলোর বাইরে একটা চেয়ার নিয়ে এসে বসলেন জীমূতবাহন। রাতের অন্ধকারে ঝাঁকে ঝাঁকে পুরুষ জোনাকি প্রিয়াদের উদ্দেশে আলোর সঙ্কেত প্রেরণ করছে। ওদিকে একটা বাদামী রঙের ধামসা পোকা ফড়িং ধরেছে। ধামসা পোকার শক্ত দুটো ডানার ওপর ফোঁটা ফোঁটা দাগ—যেমন গোল গোল দাগ থাকে বাঘের গায়ে। ফড়িংটা এখনও প্রতিরোধ করছে। কিন্তু পারবে কি ছাড়াতে? ধামসা পোকাকে সাপের মাসী-পিসীও বলে। মাসী-পিসী! মেসো খুড়ো নয় কেন, জীমূতবাহনের জানতে ইচ্ছে করে। মেসো খুড়োরা বোধহয় অতটা নির্মম হতে পারে না! না, ফড়িংটার ভাগ্য ভাল—ধামসা পোকার একমুহূর্তের অনবধানতায় সে

পালিয়েছে। রাগে গরগর করতে করতে সাপের মাসী-পিসী দেওয়ালে মাথা ঠুকছে।

জোনাকিরা আবার জীমূতবাহনের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। দলবদ্ধ মদমত্ত পুরুষ জোনাকিরা রাত্রের এই অন্ধকারে তাদের নারীদের সন্ধানে বেরিয়েছে। গাছের ডালে ডালে আলোর টর্চ ফেলে হতাশ পুরুষ জোনাকি এবার মাটির কাছাকাছি উড়ে বেড়াচ্ছে। সোঁ করে নিচে নামবার সময় তীব্র আলো জ্বালিয়ে আবার উপরে উঠতে উঠতে আলো নিভিয়ে দিচ্ছে। প্রতি পাঁচ সেকেণ্ড অন্তর পুরুষ জোনাকি তার কামনার বার্তা প্রেরণ করছে দিকে দিকে। জীমূতবাহন দেখলেন ফুলগাছের পাতা থেকে আলোর সঙ্কেতে প্রত্যুত্তর এল ঠিক দু'সেকেণ্ড পরে। পুলকিত পুরুষ জোনাকি ওদিকে লক্ষ্য করে আবার আলো জ্বালাল—ঠিক দু'সেকেণ্ড পরে এদিক থেকে আবার আলোর সম্মতি গেল। দশ পনেরো বার আলোক বিনিময়ের পর পুরুষ জোনাকি ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গিয়ে তীরবেগে যেভাবে পাতার বাসর-শয্যায় নেমে এল, তা বিশ্বের আধুনিকতম বিমানের পক্ষে সম্ভব নয়।

দূরদূরান্তে ঝিঁঝিরাও ডাক শুরু করেছে। ওদের ডাকের অর্থ বুঝতে পারেন জীমূতবাহন। পুরুষ ঝিঁঝিরা যা চাইছে, ঘাসের মধ্যে ওই লজ্জাহীনা জোনাকি মহিলাটিও তাই চান। ল্যামপিসিস নক্‌টিলুকা। পাখা নেই ওর, তাই ঘাসের ডগায় নিজের আলোটি জ্বালিয়ে কলকাতার হাড়কাটা গলির রূপোপজীবিনীর মতো অপেক্ষা করছে। বিগতযৌবনা রূপসী ক্লান্ত হয়ে পড়ছে বোধ হয় এবার, তাই নিভিয়ে দিল নিজের প্রদীপ।

প্রকৃতির রাজ্যে দুর্দমনীয় কামনার বন্যা এসেছে যেন। আকাশে, বাতাসে, গাছের পাতায়, ঝোপের আড়ালে, ঘাসের মাথায় পতঙ্গদের অভিসার শুরু হয়েছে। মাটির তলাতেও। উইঢিপির তলায় যে কুৎসিত মধ্যবয়সিনী উইরানী রয়েছে, সেও এই মুহূর্তে নিশ্চয় সহস্র সন্তানের জন্ম দিতে ব্যস্ত। জীমূতবাহন যে বৈজ্ঞানিক তা ভুলেই গেলেন কিছুক্ষণের জন্য। ঘৃণায় হঠাৎ গা রি রি করে উঠলো।

কিন্তু পরমুহূর্তে কে যেন চাবুক মারল জীমূতবাহনকে। তাঁর দিকে

তাকিয়েই যেন লক্ষ লক্ষ পতঙ্গ মিট মিট করে হাসছে। জীমূতবাহন নিজেকে আবিষ্কার করছেন। কামনার শৃঙ্খলে ঈশিতার বন্দীশালায় তিনিও তো অনেকদিন আবদ্ধ ছিলেন। এই এতোদিন ধরে ঈশিতার অব্যক্ত আকর্ষণ থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করতে পারেননি।

অনেকদিন আগে প্রিয়ংবদার গতি করবার জন্যে যখন অজয়কে চেয়েছিলেন ঈশিতা, তখনই তো সব বুঝেছিলেন জীমূতবাহন। বিজ্ঞানের ক্ষতি হবে জেনেও তিনি তো না বলতে পারেননি। ঈশিতার সেই মোহিনী চাহনির সামনে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন জীমূতবাহন। জ্ঞানবান হৃদয়বান নিষ্ঠাবান জীমূতবাহন সেন আত্মগ্লানিতে জর্জরিত হয়েছিলেন অজয়ের আদর্শচ্যুতিতে—তবু দেবকুমারকেও সুস্মিতা সেনের হাতে সমর্পণ করতে বাধলো না জীমূতবাহন সেনের। সুস্মিতা সেনের মা—তাঁর শয্যাসঙ্গিনী ঈশিতা, তাঁর চোখগুলোকে সেবার আরও মোহময় করে তুলেছিলেন। সম্মোহিত জীমূতবাহন সেই একইভাবে নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরির আর এক ভবিষ্যৎকে চিত্রলেখা সেনের পোষকে রূপান্তরিত করেছিলেন। জীমূতবাহন যদি মনে করেন তাঁর কোনো দোষ ছিল না, তবে অন্যায় হবে।

গাড়ির আওয়াজে হঠাৎ জীমূতবাহনের চিন্তার জাল ছিন্ন হলো। দূরে হেডলাইটের আলো দেখা যাচ্ছে। অমিত ও মদালসা ফিরছে। ওদের অভ্যর্থনার জন্যে ঘর থেকে দ্রুত বেরিয়ে এলেন ঈশিতা।

"এসো অমিত, এসো। কেমন সিনেমা দেখলে," ঈশিতার কণ্ঠে যেন মধু ঝরে পড়ছে।

"ভাল। আপনার শরীর এখন কেমন?" অমিত জিগ্যেস করলে।

"এখন বেশ ভালই আছি বাবা," ঈশিতা উত্তর দিলেন। জীমূতবাহনের মনে হলো অভিনয়ের জন্য ঈশিতাকে গোল্ড মেডেল দেওয়া উচিত।

"আপনি সঙ্গে গেলে বেশ হতো," অমিতাভ খেতে খেতে বললে।

ঈশিতা খাবার এগিয়ে দিতে দিতে বললেন, "আর একদিন যাবো তোমাদের সঙ্গে।"

স্বামীর দিকে মুখ ফিরিয়ে ঈশিতা বললেন, "তুমি চুপচাপ রয়েছ কেন? কিছু বলো?"

জীমূতবাহন নিজের নার্ভগুলো শক্ত করে বললেন, "ব্যাড্ নিউজ অমিত, কাটুই পোকাগুলো সব মারা গেল।"

"কখন?" অমিতাভ জিগ্যেস করে।

"তুমি যাবার একটু পরেই।"

ঈশিতা স্বামীকে এবার প্রচণ্ড বকুনি লাগালেন, "তোমার কী আর কোনো কথা নেই? বেচারা খেটে খেটে রোগা হয়ে গেল। একটুখানি রিল্যাক্স করছে, সেই সময় আবার মৃত্যুসংবাদ।"

খাওয়ার পরও খানিকটা হৈ হুল্লোড় করবার চেষ্টা করলেন ঈশিতা। অমিতের সঙ্গে অনর্গল কথা বলতে লাগলেন। মদালসার গুণাবলীর সুদীর্ঘ বিবরণ দিলেন। তারপর শুভরাত্রি জানিয়ে অমিতাভ যখন বিদায় নিল, তখন মেয়েকে শোয়ার ঘরে নিয়ে ফিস ফিস করে কথা বলতে লাগলেন ঈশিতা। মদালসাকে নিয়ে তিনি একটা ঘরে শোন। জীমূতবাহন একা পাশের ছোট ঘরটায় রাত্রি কাটান।

নিশীথশয়নে একলা জেগে রয়েছেন জীমূতবাহন সেন। অমিতাভকে একটা কথা বলা উচিত ছিল। তারই অবহেলায় পোকাগুলো মারা গিয়েছে। তাড়াতাড়িতে হিটিং চেম্বারের হিট রেগুলেট করেনি। জীমূতবাহনের নজর সেদিকে যখন পড়লো, তখন চেম্বারটা উনুনের মতো গরম হয়ে গিয়েছে। খাওয়ার টেবিলে সকলের সামনেই অমিতাভকে খবরটা দেওয়া উচিত ছিল। মদালসার মুখের দিকে তাকিয়েই তা পারেননি তিনি।

পাশ ফিরে ঘুমোবার কথা ভাবছিলেন জীমূতবাহন। বুকে একটা উষ্ণ হাত এসে পড়লো। ফিস ফিস করে ঈশিতা বললেন, "একটু সরে যাও।"

সিঙ্গল বেডের এক কোণে সরে গিয়ে ঈশিতার জন্য জায়গা করে দিতে হলো। স্বামীর বালিশের এক কোণে মাথা রেখে ঈশিতা পায়ের গোড়ার চাদরটা বুক পর্যন্ত টেনে আনলেন।

জীমূতবাহন বিব্রতভাবে বললেন, "মধ্যিখানের দরজাটা কিন্তু খোলা রয়েছে।"

ঈশিতা কানের কাছে মুখ এনে বললেন, "খুকুমণিকে ঘুম পাড়িয়ে এসেছি।"

জীমূতবাহন তবু অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। ঈশিতা এবার ফিস ফিস করে বললেন, "শোন, এবার তুমি একটু চেষ্টা করলেই ফলাফলটা বোঝা যায়। তুমি অমিতের সঙ্গে কালকেই কথা বলবে। ওর মনটা বুঝে নিতেই হবে। এমনিতে গম্ভীর হয়ে থাকে, কথা বলে না। কিন্তু খুকুমণিকে আজ জিগ্যেস করেছে রবীন্দ্র-সঙ্গীত জানে কিনা।"

"আচ্ছা, দেখি," জীমূতবাহন বললেন। কিন্তু গলাটা যেন একটু কেঁপে উঠলো জীমূতবাহনের।

এইতো কেমন মিথ্যে কথা বললেন জীমূতবাহন। জীমূতবাহন ভাবলেন, কই কোনো অসুবিধে হলো না তো তাঁর।

"উঠছো?" ঈশিতা প্রশ্ন করলেন।

"একবার ল্যাবরেটরিতে যাবো। ওখানে অনেক কাজ আছে যা রাত্রি ছাড়া করা যায় না।"

ঈশিতা বললেন, "আর একটু বিশ্রাম করে যাও। আমিও খুকুমণির কাছে ফিরে যাই। ওর যা পাতলা ঘুম।"

বাড়ি থেকে বেরিয়ে একটা প্রবল উত্তেজনা বোধ করছেন জীমূতবাহন। হাতের টর্চটা জ্বালাতেই কয়েকটা পোকা ঘাস থেকে উড়ে গেল। ঝিঁঝিদের কামনার নিবৃত্তি হয়নি এখনও—সমানে শব্দের আহ্বান পাঠিয়ে চলেছে তারা।

জীমূতবাহনের কপালে ঘাম জমতে শুরু করেছে। বুকের ভিতরের যন্ত্রগুলো যেন বুঝতে পেরেছে, ভয়ংকর কিছু একটা হতে চলেছে। তারা কি জীমূতবাহনকে বাধা দিচ্ছে, না কেবল জীমূতবাহনের সঙ্গে তারাও উত্তেজিত বোধ করছে? অনেক ভেবেছেন জীমূতবাহন। তাঁর সমগ্র জীবনের সাধনার ভবিষ্যৎ জড়িয়ে রয়েছে এর সঙ্গে। কোনো উপায় নেই। তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেছেন।

মাঠের মধ্য দিয়ে দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছেন জীমূতবাহন। যেন কোনো কিছু চুরি করে গৃহস্থের বাড়ি থেকে পালিয়ে যাচ্ছেন জীমূতবাহন। কিন্তু উপায় নেই। দাঁতে দাঁত দিয়ে জোর করে মাড়িটা চেপে ধরেছেন জীমূতবাহন। এতে মনোবল পান তিনি। জীমূতবাহন দেখেছেন চরম বিপদের সময় কোথা থেকে হঠাৎ মনোবল এসে যায়।

পাঁচ নম্বর প্লটের মাজরা পোকাগুলো ধানগাছের হাড় ফুটো ফুটো করে দিচ্ছে। স্টেম বোরারগুলো যেন জীমূতবাহনের মনের মধ্যেও ঢুকে পড়েছে। তাঁর স্বপ্নের সর্বনাশ হতে চলেছে। ইন্দুমতীকে তাঁর প্রয়োজন।

রাত অনেক। কিন্তু ইন্দুমতীর ঘরে আলো জ্বলছে। ইন্দুমতী এখনও পড়ছে। কিংবা হয়তো বাবাকে চিঠি লিখছে।

জীমূতবাহনের মনে হচ্ছে প্রচুর মদ খেয়েছেন তিনি। তাঁর পা দুটো টলমল করছে। নিজের হাতটার ওপরও কর্তৃত্ব নেই তেমন।

ইন্দুমতীর দরজায় টোকা পড়ল। পায়ে একটা চটি জড়িয়ে সঙ্গে সঙ্গে উঠে এসেছিল সে।

অবাক হয়ে গিয়েছে ইন্দুমতী। "মাস্টারমশাই! এত রাত্রে!"

মাস্টারমশাই প্রথমে কোনো উত্তরই দিতে পারলেন না। ইন্দুমতীর মুখের দিকে তিনি ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন।

ইন্দুমতী তার বড় বড় চোখ দুটো জীমূতবাহনের মুখের ওপর নিবদ্ধ করে আবার বললে, "মাস্টারমশাই!"

অবশেষে মাস্টারমশাইয়ের ঠোঁট দুটো নড়ে উঠলো। আমতা আমতা করে বললেন, "ইন্দু, আর দেরি করতে পারলাম না।"

"মাস্টারমশাই, আপনি ভিতরে আসুন," ইন্দুমতী বললে।

কিন্তু মাস্টারমশাই যেন ভিতরে ঢোকবার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেছেন। জোর করেই তাঁকে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে আনলেন ইন্দুমতী। হাত ধরে বিছানার ওপর বসিয়ে দিল তাঁকে। "আপনার শরীর এমনভাবে কাঁপছে কেন?" ইন্দুমতী চিন্তিত হয়ে প্রশ্ন করলো।

ইন্দুমতীর দিকে করুণভাবে তাকিয়ে আছেন জীমূতবাহন। "ইন্দু, মা

আমার, বড় বিপদে পড়ে এসেছি তোমার কাছে। অমিতাভ সম্বন্ধে তোমার মত কী?"

"কেন মাস্টারমশাই? অমিতাভবাবুকে আপনি এতো ভালবাসেন। আপনার মনে কোনো আঘাত দিয়েছেন নাকি তিনি? ওঁর ব্যবহার তো খুবই ভদ্র বলে জানি।" ইন্দুমতী যে বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে তা তার মুখ দেখেই বুঝতে পারছেন জীমূতবাহন।

জীমূতবাহন বললেন, "ইন্দু, আমি গুরুদক্ষিণা চাইতে এসেছি। তুমি না বলেছিলে, আমি যা চাইব তাই দেবে তুমি।"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়।"

"পারবে তুমি? তুমি ছাড়া আর কেউ তো পারবে না, আমার এই সাধের ল্যাবরেটরিকে বাঁচাতে।"

তারপর আশ্চর্য সেই গুরুদক্ষিণা চেয়েছিলেন জীমূতবাহন। "কঠিন সে কাজ, কিন্তু আমি চাই অমিতাভকে তুমি জয় করো।"

টলতে টলতে বেরিয়ে এসেছিলেন জীমূতবাহন সেন। পৃথিবী এতক্ষণে যেন শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। আকাশে জোনাকিরা নেই। ঝিঁঝিঁ পোকাগুলোও ক্লান্তি আর অবসাদে ঘুমিয়ে পড়েছে। টর্চের আলো না জ্বেলেই এগিয়ে যেতে লাগলেন জীমূতবাহন।

সত্যের জন্যে, সাধনার জন্যে যুগে যুগে মানুষ যা করেছে তার সবটাই কি ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছে? মনে তো হয় না!

জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ আলোয় নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরির লম্বা বাড়িটা পরম আদরে দেখতে লাগলেন জীমূতবাহন। আর ভাবতে লাগলেন, ঠিক করেছেন তিনি। চমকে উঠে ইন্দুমতী তাঁর হাত দুটো জড়িয়ে ধরেছিল। চোখ দুটো বন্ধ করে অস্ফুট কণ্ঠে বলেছিল, "একি বলছেন মাস্টারমশাই!" ইন্দুমতী কি বলতে চায় তা বুঝতে পেরেছিলেন জীমূতবাহন। কিন্তু মদালসা ও ঈশিতার যদি সাধ-আহ্লাদ থাকে, ইন্দুমতীরও থাকবে না কেন? কি অপরাধ করেছে ইন্দুমতী? সেও তো তাঁর মেয়েরই মতো।

ইন্দুমতীর মুখের ভাব থেকেই অমিতাভ সম্বন্ধে তার মনোভাব বুঝে নিতে জীমূতবাহনের কষ্ট হয়নি। মাস্টারমশাইয়ের ঘরের কথা ভেবেই ইন্দুমতী যে এতোদিন তার বাসনাকে বন্দী করে রেখেছিল, একথা জোর করেই বলতে পারেন জীমূতবাহন। পরম স্নেহে ইন্দুর মাথাটা নিজের বুকের কাছে জড়িয়ে ধরে জীমূতবাহন বলেছিলেন, "গুরুদক্ষিণা দিতেই হবে।"

তারপর পৃথিবীতে সূর্য উঠেছে। নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরিকে অন্ধকারে রেখে সূর্য আবার বিদায়ও নিয়েছে। চন্দ্র সূর্যের পালাবদল বার বার হয়েছে, আর নিজের কাজের ফাঁকে ফাঁকে জীমূতবাহন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছেন কবে বিস্ফোরণ হবে। টাইম বোমাটা হঠাৎ কখন ফেটে পড়বে।

অবশেষে সত্যিই একদিন বিস্ফোরণ হলো। সেদিন ভোরবেলাতে বিদ্যুৎ-গতিতেই খবরটা দিকে দিকে প্রচারিত হলো। নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাব-রেটরির বেয়ারা, ঠাকুর, চাকর, দারোয়ান, মালী, অ্যাসিসটেন্ট সবাই জানতে পারলে, ইন্দুমতী দেশাই আর অমিতাভ মিত্রকে পাওয়া যাচ্ছে না।

চুপি চুপি তারা আলোচনা করতে লাগলো—কাউকে না বলেই ওরা আমেদাবাদ পালিয়েছে, সেখানেই বিয়ে করবে ওরা।

কেউ বললে, "এমন যে হবে মনে হয়নি তো।" আবার কেউ বললে, "দেশাই দিদিমনি আগে খুব নিরীহ সাদাসিধে ছিলেন। কিন্তু ইদানীং দেশাই দিদিমনিও রঙচঙে শাড়ি পরছিলেন, চোখে কাজল দিচ্ছিলেন। বেণীতে রজনীগন্ধার মালা জড়িয়ে প্রায়ই ফট ফট করে কথা বলছিলেন মিটার সায়েবের সঙ্গে। মিটার সায়েবের ঘরে অনেক রাত পর্যন্ত দু'জনকে গল্প করতে দেখা গিয়েছে।"

কিন্তু এ কি হলো জীমূতবাহনের? ভেবেছিলেন দূর থেকে তিনি বিস্ফোরণের একজন দর্শকমাত্র হবেন। কিন্তু বোমার একটা টুকরো আচমকা ছুটে এসে তাঁর বুকেই বিদ্ধ হয়েছে। মনে হচ্ছে এখনই তিনি মূর্ছিত

হয়ে পড়বেন।

ওষুধের বোতল থেকে ট্র্যাংকুইলাইজার বার করে খেলেন জীমূতবাহন। ঈশিতার একটা মন্তব্য শুধু শুনতে পেয়েছিলেন জীমূতবাহন—"স্কাউনড্রেল।"

শহরে জরুরী কনফারেন্স ছিল জীমূতবাহনের। ভেটারিনারি কলেজে সব প্রদেশের পশুচিকিৎসকরা এসেছেন জীমূতবাহনের প্রজননশক্তিহীন মাছির বিবরণ শুনতে। জীমূতবাহন ভাবলেন, ভালই হয়েছে। কিছুক্ষণের জন্যে নিবেদিতা ল্যাবরেটরির যক্ষপুরী থেকে পালিয়ে গিয়ে বাঁচবেন তিনি।

সারাদিন মানুষের ভিড়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলবার চেষ্টা করলেন জীমূতবাহন। যন্ত্রণায় মাথার শিরাগুলো যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে। মদালসার মুখটা দেখতে পাচ্ছেন বার বার। একটা নয়, অনেকগুলো মদালসা যেন চোখের সামনে ভেসে উঠছে। আর কানে বাজছে ঈশিতার শেষ কথা—স্কাউনড্রেল।

অনেকগুলো বড়ি খেয়েছেন জীমূতবাহন। কিন্তু মাথাটা যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। ঠিক বুঝতে পারছেন না, ঈশিতা কাকে স্কাউনড্রেল বললে। স্কাউনড্রেল মানে তো দুরাত্মা, বদমায়েস, পামর। কে স্কাউনড্রেল? অমিতাভ? ইন্দুমতী? না জীমূতবাহনকেই স্কাউনড্রেল বলেছেন ঈশিতা!

ডিনারের ব্যবস্থা ওখানেই ছিল। কিন্তু শেষের দিকে জীমূতবাহন আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না। প্রথমে বসে পড়লেন। মনে হলো শুয়ে পড়তে পারলেই ভাল হতো। ডাঃ গোড়বলে ছিলেন কাছাকাছি। পরীক্ষা করে বললেন,নাড়িটা বেশ দ্রুত চলেছে,হয়তো রক্তের চাপ বেড়েছে একটু।

ওরা তাঁকে ল্যাবরেটরির গেট পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়ে গিয়েছিল।

কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছে জীমূতবাহনের। তাঁর নিজের সন্তানের মহা সর্বনাশ করেছেন একথা ভাবতেই অকস্মাৎ বুকের মধ্যে দুঃসহ যন্ত্রণা অনুভব করছেন! একবার মনে হচ্ছে পৃথিবীর ঘৃণ্যতম অপরাধে তাঁর দুটি হাতকে কলুষিত করেছেন তিনি, আবার মনে হচ্ছে তিনি নিমিত্তমাত্র। যা হয়েছে তাছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না।

বৈজ্ঞানিক জীমূতবাহন কি উন্মাদে পরিণত হচ্ছেন? স্বামী-স্ত্রীর

বিরোধের ফয়সালা করতে না পেরে মত্ত জীমূতবাহন তাঁর নিষ্পাপ মেয়ের সর্বনাশ করেছেন।

বেশ রাত হয়েছে। কিন্তু বাড়িতে ঢুকতে সাহস করছেন না জীমূতবাহন। মদালসার মুখটা দেখবার জন্যেই হঠাৎ মনটা ছটফট করতে লাগল জীমূতবাহনের।

ঈশিতা গম্ভীর মুখেই জেগে বসে ছিলেন। এই একদিনেই দশ বছর বয়স বেড়ে গিয়েছে ঈশিতার। চোখ দুটো কোটরে ঢুকে গিয়েছে। কে যেন ঈশিতাকে ব্ল্যাক-আউটের ঠুলি পরিয়ে দিয়েছে।

"খুকুমণি কোথায়?" ক্ষীণকণ্ঠে জিগ্যেস করলেন জীমূতবাহন।

"পাশের ঘরে," কাঠের মতো শুকনো উত্তর দিলেন ঈশিতা।

খুকুমণির সঙ্গে কথা বলবার প্রচণ্ড ইচ্ছে হচ্ছে জীমূতবাহনের। তাঁর নিজের মেয়ে, কিন্তু তার ঘরে ঢোকবার অধিকার হারিয়ে ফেলেছেন জীমূতবাহন। তিনি যেন বাইরের কেউ। তাই ঈশিতার অনুমতি প্রার্থনা করলেন, "ওকে দেখবো একবার?"

"ওকে ইঞ্জেকশনে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে।" আবার কাঠের মতো উত্তর দিলেন ঈশিতা।

"এ্যাঁ! ইঞ্জেকশন কেন?"

"সকালবেলায় নিজের চোখে অমিতাভর ঘরটা দেখে এসেছিল খুকুমণি। তারপর কয়েকবার বমি করলো। ঘুমের ওষুধ দেওয়া হয়েছিল। ট্যাবলেট খেয়েও ঘুম হলো না। গুম্ হয়ে পড়েছিল সারাদিন। তারপর…"

"তারপর?" বিছানায় বসে পড়লেন জীমূতবাহন।

"বিকেলেই ফিট হলো। হাত পায়ে সব খিল ধরেছিল। ঠোঁটটা কামড়ে ফেলেছে। তখন ডাক্তার ইঞ্জেকশন দিয়ে গিয়েছে।"

জীমূতবাহন বুকের মধ্যে আবার প্রচণ্ড উত্তেজনা বোধ করছেন। তাঁরও কি ফিট হবে নাকি? হাত কাঁপছে তাঁর। বড় ভাল মেয়ে খুকুমণি। ছোটবেলায় মেয়েটা কত আদর করতো তাঁকে। গলা জড়িয়ে ধরতো। চুমু খেতো।

"খুকুর কেন এমন হলো!" কাতর আর্তনাদ করে উঠলেন জীমূতবাহন।

"হয়েছে! আর সীন ক্রিয়েট করো না। অনেক কষ্টে খুকুমণি ঘুমিয়েছে," ঈশিতা চাপা গলায় বললেন।

ঈশিতা অমনভাবে তাঁর দিকে তাকাচ্ছে কেন? ঈশিতার চোখ দুটো এমনিই বড়, কিন্তু এখন যেন ক্রমশ আরও বড় হয়ে উঠছে। কাতর কণ্ঠে অপরাধীর মতো জীমূতবাহন বললেন, "ঈশিতা, আমি মেয়ের আরও ভাল বিয়ে দেবো।"

"আচ্ছা!" ঈশিতার কণ্ঠে ব্যঙ্গ ঝরে পড়ছে।

"ঈশিতা, তুমি অমনভাবে তাকাচ্ছ কেন?" জীমূতবাহন কম্পিত কণ্ঠে প্রশ্ন করেন।

অক্টোপাশের পা দিয়ে ঈশিতা তাঁকে বেঁধে ফেলেছেন। "কেন তাকাচ্ছি তুমি সেটা ভালভাবেই জানো।"

কী বলতে চায় ঈশিতা? ঈশিতা কী ব্যাপারটা জানে? "ঈশিতা," আবার কাতরভাবে ডাকলেন জীমূতবাহন।

মুখ ফিরিয়ে ঈশিতা বললেন, "আমি এখন খুকুর কাছে শুতে যাচ্ছি। একটু আস্তে কথা বলে কৃতার্থ করো।"

"ঈশিতা," আবার ডাকলেন জীমূতবাহন।

"সাপেরাই শুনেছি নিজেদের বাচ্চা খায়," এই কথা বলে জীমূতবাহনের মুখের ওপরই ঈশিতা দরজা বন্ধ করে দিলেন।

জীমূতবাহনের খুব ইচ্ছা হয়েছিল ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে ঘুমন্ত মদালসাকে একটু আদর করেন; বলেন, "তোমার খুব ভাল বর এনে দেবো।" কিন্তু দরজা বন্ধ।

এখন রাত অনেক। নিশীথের বিরাম সাগরে শ্রান্ত প্রাণের সমস্ত বেদনা অর্পণ করবার সব রকম চেষ্টা করেও সফল হলেন না জীমূতবাহন।

চটি এবং ফতুয়া পরেই বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন জীমূতবাহন। এইমাত্র কুশ্রী একটা স্বপ্ন দেখেছেন জীমূতবাহন। নিজেদের রিসার্চের জন্যে সন্তানের ক্ষতে ম্যাগট ছেড়ে দিয়েছেন তিনি। রক্তবীজের বংশধররা তাঁর সন্তানের সর্বদেহে ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁর মেয়ে কাঁদতে পারছে না, আওয়াজ করতে

পারছে না, কিন্তু ম্যাগটের দংশনে অব্যক্ত যন্ত্রণায় ছটফট করছে।

বাইরে পালিয়ে এসেছেন জীমূতবাহন। অমিতাভর শূন্য ফ্ল্যাটটা অন্ধকারে একপাটি পরিত্যক্ত জুতোর মতো পড়ে রয়েছে। আর ওধারে ইন্দুমতীর বাড়িখানাও যেন আর এক পাটি স্যাণ্ডেল। কালও এরা সবাই ছিল, এখন কোথায় গেল ?

ল্যাবরেটরির মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন জীমূতবাহন। যেন দানবপুরীর অভিশপ্ত প্রহরী তিনি। কিন্তু কেমন প্রহরী ? তিনিও কি দানব, না মানুষ ? না ঈশিতা যা বললে তাই ?

ওধারে এক কোণে মাকড়সার জালটা নড়ছে। লূতা! ব্ল্যাক উইডো স্পাইডার। কালো বিধবা মাকড়সা! তারের জালের পিছনে জাল বিছিয়েছে লূতা। গতকাল লূতার স্বামীকেও পাশে রেখে দেওয়া হয়েছিল। মাকড়সার স্বামীরা উপহার দিয়ে পত্নীর মনোরঞ্জনের চেষ্টা করে মানুষের মতো। লূতার স্বামীও করছিল। কিন্তু কোথায় গেল সে ? ওইতো, বেচারা স্বামীর মৃতদেহ দেখতে পাচ্ছেন জীমূতবাহন। স্বামীকেই খেয়ে ফেলেছে লূতা। আলোটা যেন হঠাৎ প্রচণ্ড উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। লূতা নয়। ঈশিতাই যেন সেখানে বসে আছে। জীমূতবাহন নিজেকে বার বার বোঝাতে লাগলেন, ঈশিতা নয়, লূতাই বসে আছে সেখানে। কিন্তু মাথা ঠিক থাকছে না।

"ঈশিতা, ঈশিতা!' ডাক দিলেন জীমূতবাহন। ঈশিতা সাড়া দিচ্ছে না কেন? বোধ হয় আলোতে লজ্জা পাচ্ছে ঈশিতা, জীমূতবাহনের মনে হলো।

আলো নিভিয়ে দিলেন জীমূতবাহন। অন্ধকারেই ঈশিতার আলিঙ্গনে ধরা দেবেন তিনি। কিন্তু তাই বা কি করে হয়? সাপের নঙ্গে তো মাকড়সার বিয়ে হয় না। হয় কি? কেউটে সাপের সঙ্গে ব্ল্যাক উইডো স্পাইডারের শুভবিবাহ!

কে জানে! প্রকৃতির রাজ্যে কি হয়, আর কি না হয় বলা কঠিন।

এগিয়ে যাচ্ছেন জীমূতবাহন। মাকড়সার সঙ্গে সাপের বিয়ে হয় কিনা! এই প্রশ্ন কাকে করবেন? অমিতাভ থাকলে তাকে করা যেতো। মস্ত বড় বৈজ্ঞানিক সে। আরও বড় হবে। এই গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক প্রশ্নের উত্তর

দিতে পারতো সে।

এদের জিগ্যেস করলে কেমন হয়? জীমূতবাহন আর একটা মস্ত খাঁচার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। এরা সাপও নয়, মাকড়সাও নয়। এরা কাঁকড়া বিছে। অনেক যত্ন করে ল্যাবরেটরিতে এদের জন্ম দেওয়া হয়েছে। ব্ল্যাক স্করপিয়ন। সংখ্যায় অনেক আছে এরা—রোনজেন্ রশ্মিতে এদেরও প্রজনন শক্তি নষ্ট করে দেওয়ার কথা আছে। এদেরই প্রশ্ন করা যাক। জীমূতবাহন নিজের হাতে খাঁচার দরজাটা খুলে দিলেন।

পরের দিন ভোরবেলায় নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরির সিমেণ্ট করা মেঝের ওপর জীমূতবাহনের প্রাণহীন দেহ পাওয়া গিয়েছিল। প্রেস ট্রাস্ট অব ইণ্ডিয়ার স্থানীয় প্রতিনিধি প্রেরিত সংবাদটা টেলিপ্রিণ্টারের মাধ্যমে দিকে দিকে পরিবেশিতও হয়েছিল: 'প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডক্টর জীমূতবাহন সেন গতকাল গভীর রাত্রে নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরিতে একাকী গবেষণা-কালে এক মর্মন্তুদ দুর্ঘটনায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। ল্যাবরেটরিতে প্রতি-পালিত শতাধিক বৃশ্চিকের দংশনই এই প্রখ্যাত জীববিজ্ঞানীর মৃত্যুর কারণ বলিয়া অনুমিত হয়। পরলোকগত আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রিয় ছাত্রগণের অন্যতম জীমূতবাহন খ্যাতনামা আইনজীবী ও দেশসেবক জগদানন্দ বসুর সপ্তম কন্যা ঈশিতাকে বিবাহ করেন…'

উপসংহার

আরও পরের কথা। নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরি এখন অনেক বড় হয়েছে। সেখানকার এক অনুষ্ঠানে গবেষণাগারের কর্ণধার ডক্টর অমিতাভ মিত্র ও তাঁর সহধর্মিণী ডঃ ইন্দুমতী মিত্রের সঙ্গে আমাদের এক সাংবাদিক বন্ধুর পরিচয় হয়।

গভীর দুঃখের সঙ্গে অমিতাভ বলেছিল, "আমাদের ভুল হয়েছিল। ল্যাবরেটরি ছেড়ে ঐভাবে হঠাৎ চলে যাওয়াটা আমাদের ঠিক হয়নি।"

ইন্দুমতী অবশ্য একমত হতে পারেনি। সে বলেছিল, "আমি কোনোদিন মাস্টারমশাইয়ের অবাধ্য হইনি। তাঁর বিনা আদেশে আমি কিছুই করিনি।"

অমিতাভ বলেছিল, "পরাশ্রিত পরজীবী প্যারাসাইটদের এই পৃথিবীতে আমাদের মাস্টারমশাই ছিলেন এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম।" বলবার সময় অমিতাভ ও ইন্দুমতী দু'জনের চোখই নাকি সজল হয়ে উঠেছিল।

ইন্দুমতী বলেছিল, "মাস্টারমশাইয়ের স্বপ্নের সেই পরমবন্ধু প্যারাসাইট পতঙ্গের সৃষ্টি যদি আমরা কোনোদিন করতে পারি, তবে তার নাম দেবো জীমূতবাহন।"